সাহিত্য-পরিষৎ পত্রিকা

(ত্রৈমাসিক)

একাদশ ভাগ

সম্পাদক

শ্রীনগেন্দ্রনাথ বসু

১৩৭।১ কর্ণওয়ালিস্ ষ্ট্রীট

বঙ্গীয় সাহিত্য-পরিষৎ কার্য্যালয় হইতে প্রকাশিত

কলিকাতা

৫ নং রামধন মিত্রের লেন, শ্যামপুকুর,

"বিশ্বকোষ-প্রেসে"

শ্রীপূর্ণচন্দ্র দাসদ্বারা মুদ্রিত ;

১৩১১

একাদশ ভাগ

বর্ণানুক্রমিক বিষয়সূচী

সাহিত্য-পরিষৎ পত্রিকা।

রঘুনাথ শিরোমণি।

ইতিহাসপ্রসিদ্ধ আদিশূর (গৌড়াধিপতি জয়ন্ত) খৃষ্টীয় অষ্টম শতাব্দের প্রথমভাগে যজ্ঞ-দনার্থ কান্যকুব্জ হইতে পঞ্চ ব্রাহ্মণ আনয়ন করিয়া গৌড়দেশে সাগ্নিক ব্রাহ্মণ প্রতিষ্ঠা ...[1] এই ঘটনার প্রায় এক শতাব্দ পূর্ব্বে শ্রীহট্টপ্রদেশে বিশুদ্ধ বৈদিক ব্রাহ্মণগণ মন করেন, ইহার প্রমাণ পাওয়া যাইতেছে। সুতরাং আদিশূরের কীর্ত্তি নূতন বা া নহে।

প্রায় তেরশত বর্ষ অতীত হইল, ত্রিপুরার রাজাসনে আদিধর্ম্মপা নামক এক নৃপতি অধি-ছিলেন। ইনি একজন প্রসিদ্ধ নৃপতি, ইঁহার জন্মকাল হইতে ত্রিপুরা-রাজ্যে "ত্রিপুরাব্দ" একটি অব্দ প্রচলিত হয়। তাঁহার রাজপ্রাসাদোপরি একটি অশুভ পক্ষী উপবেশন ছিল, ইহা অমঙ্গলকর জ্ঞান করিয়া তাহার শান্তির জন্য ত্রিপুরাধিপ, মন্ত্রিগণের পরামর্শে নক" ও "জ্যোতিষ্টোম" যজ্ঞ করিতে সঙ্কল্প করিলেন। কিন্তু যখন সভ্যতর গৌড়দেশেই ব্রাহ্মণাভাব ছিল, তখন বঙ্গের প্রান্তবর্ত্তী, তথাকথিত ত্রৈপুরাধিকৃত প্রদেশে যে ব্রাহ্মণ া দুষ্কর হইয়াছিল, তাহা বলা বাহুল্য।

াহা হউক, তিনি অভিজ্ঞ মন্ত্রিকর্ত্তৃক জ্ঞাত হইলেন যে, মিথিলাদেশেই যজ্ঞাদি-বৈদিক-মবিশারদ ব্রাহ্মণ পাওয়া যাইতে পারে। মিথিলা প্রাচীনকালাবধি বিদ্যাবিশারদগণের স্থান। বঙ্গদেশের নৃপতিবর্গ মিথিলাধিপতিকে মান্য করিতেন, তিনি "পঞ্চগৌড়াধিপ" এই সম্মানিত উপাধির অধিকারী ছিলেন। আদিধর্ম্মপা[2] স্বীয় মন্ত্রীর পরামর্শে অতি বিনীত ভাবে,

---

(১) বঙ্গের জাতীয় ইতিহাস, ব্রাহ্মণকাণ্ড প্রথমাংশ ১০১ ও ১০২ পৃষ্ঠা দ্রষ্টব্য।

(২) শ্রীযুক্ত কৈলাসচন্দ্র সিংহ প্রণীত "রাজমালা" ও বিখ্যাত "বিশ্বকোষ বৃহদভিধানে" ত্রিপুরারাজবংশের দুইটি বংশ-পত্রিকা উদ্ধৃত হইয়াছে; তদ্ব্যতীত ত্রিপুরাধিপতি বীরচন্দ্র মাণিক্য বাহাদুরের সাহায্যে পণ্ডিত শ্রীযুক্ত রামনারায়ণ বিদ্যারত্ন যে শ্রীমদ্ভাগবত বিতরণ করেন, তাহার ভূমিকায়ও একটি বংশ-পত্রিকা প্রকাশিত হইয়াছে।

মিথিলাধিপতির কাছে পাঁচজন বৈদিক-কর্ম্মতৎপর ব্রাহ্মণ প্রেরণের জন্য অনুরোধপত্র প্রেরণ করিলেন।

মিথিলাদেশে তখন বলভদ্র নামক নৃপতি বর্ত্তমান ছিলেন। তিনি ত্রিপুরাধিপতির বি· সন্তুষ্ট হইয়া পাঁচ জন বেদজ্ঞ ব্রাহ্মণকে ত্রিপুরায় গমন করিতে আদেশ করেন। কিন্তু ত্রি· সদাচারবহির্ভূত দেশ, ব্রাহ্মণগণ এখানে আসিতে নিতান্ত কাতর হইলেন।[৩] অনন্তর তাঁহা· ঐ দেশের অবস্থাদি জ্ঞাত হইবার জন্য জনৈক ব্যক্তিকে অগ্রে তথায় প্রেরণ করিলেন। ব্যক্তি মিথিলায় প্রত্যাগমন করিয়া জানাইলেন যে, রাজা চন্দ্রবংশসম্ভূত ক্ষত্রিয় ও বিবিধ গু· শালী। তখন তাঁহারা তথায় গমন করিতে সম্মত হইলেন; এবং বৎস, বাৎস্য, ভর· কৃষ্ণাত্রেয় ও পরাশর এই পঞ্চ গোত্রোৎপন্ন পাঁচ জন ব্রাহ্মণ ত্রিপুরা-রাজধানীতে আগমন কর্ি· লেন। ইঁহাদের নাম যথাক্রমে শ্রীনন্দ, আনন্দ, গোবিন্দ, শ্রীপতি ও পুরুষোত্তম।

ইঁহারা রাজধানীতে উপস্থিত হইয়া যথানিয়মে যজ্ঞ সমাপন করিলেন। শ্রীহট্টের অন্তর্গ· ভানুগাছ পরগণাধীন মঙ্গলপুর গ্রামে সেই প্রাচীনতম যজ্ঞকুণ্ডের চিহ্ন এখনও পরিলক্ষি· হইয়া থাকে। তখন ত্রিপুরা-রাজধানী বরচক্র নামক পুণ্যসলিলা-নদীতীরে ছিল।[৪]

যজ্ঞসমাপনান্তে ব্রাহ্মণগণ স্বদেশগমনোন্মুখ হইলে ডুঙ্গুর বা আদিধর্ম্মপা[৫] কৃতাঞ্জলিপূর্ব প্রার্থনা করিলেন যে, তাঁহারা যেন সেই স্থানে বাস করিয়া তাঁহাকে কৃতার্থ করেন। র· বিনয়ে সন্তুষ্ট হইয়া ব্রাহ্মণগণ এদেশে চিরবাস করিতে সম্মত হইলেন; তখন ত্রিপুরাধিপতি ত..

কিন্তু কোন বংশপত্রেই আদিধর্ম্মপা নাম নাই। ধর্ম্মপাল বলিয়া একজন রাজার নাম দৃষ্ট হয়, তিনি অ· প্রাচীন এবং যুধিষ্ঠিরের সমসাময়িক ত্রিপুর হইতে সপ্তম স্থানীয়, সুতরাং বর্ণিত সময়ের বহু পূর্ব্ববর্ত্তী। আ· বিশ্বাস, বর্ত্তমান মহারাজের উনচল্লিশ পুরুষ পূর্ব্বে ডুঙ্গর ফা নামে এক ক্ষমতাশালী রাজা ত্রিপুরার সিংহ· অধিষ্ঠিত হন, ইহাঁর পিতার নাম সেব রায়। বিশ্বকোষে ইঁহার নাম দানকুরু-ফা বলিয়া লিখিত হইয়াছে। বিদ্যারত্ন মহাশয় ত্রৈপুর "ডুঙ্গুর" শব্দে হরি অর্থ করিয়া ইঁহাকে হরিরায় নামকরণ করিয়াছেন। এই ত্রৈপুর নামটাই পশ্চাৎপ্রকাশিত তাম্রপত্রের রচয়িতা ব্রাহ্মণ আর্য্য-ভাষায় ধর্ম্মপা বলিয়া অনুবাদ করিয়া, তাম্রপত্রে [থাকিবেন। আরও বক্তব্য, কেবল এই একটি নাম সম্বন্ধেই যে এইরূপ হইয়াছে, তাহা নহে। ত্রিপুরা-রাজব· অধিকাংশ নামই ভিন্ন ভিন্ন ব্যক্তিগণ কর্ত্তৃক বিভিন্নরূপে বিভিন্ন স্থানে লিখিত হইয়াছে। ত্রৈপুর নামের বঙ্গা· স্বাধীনতা অবলম্বনই ইহার কারণ বোধ হয়। (পূর্ব্বোক্ত তিনটী বংশ-তালিকা দেখিলেই তাহা বোধগম্য হইবে.

(৩)"বিপ্রবরা কাতরাঃ সন্তঃ কথং স্বকীয়ং পুণ্যদেশং বিহায় সদাচাররহিতজনাবৃতদেশে গন্তব্যমিতি।"(বৈদিকসংবাদিনী)

(৪) শ্রীহট্টের দক্ষিণাংশ প্রাচীন কালে ত্রিপুরা রাজ্যের অংশ ছিল, ইহার বহুতর ঐতিহাসিক প্রমাণ আছে। প্রথমতঃ ভানুগাছের সন্নিকটে রাজধানী ছিল, পরে ক্রমশঃ তাহা দক্ষিণবর্ত্তী হইয়াছে। শ্রীযুক্ত কৈলাসচন্দ্র সিংহ প্রণীত রাজমালা গ্রন্থের দ্বিতীয় ভাগ দ্বিতীয় অধ্যায় ২১।২৩ পৃষ্ঠা ও অন্যান্য স্থানেও ঐ নাম উক্ত আছে।

(৫) বিদ্যারত্নানুবাদিত হরি ও ধর্ম্ম একপর্য্যায়ান্তর্গত। ত্রিপুরার ডুঙ্গুর যেমন আদিধর্ম্মপা, গৌড়ের অমনক নৃপতিও তদ্রূপ আদিশূর। উভয়ের নামের পূর্ব্বে আদি শব্দ (!!) উভয়েই ব্রাহ্মণ-আনয়নকারী বলিয়া এইরূপ নামের সাদৃশ্য পরিকল্পিত হইয়াছে কি না, কে জানে?

শয় আনন্দিত হইয়া, তাঁহাদিগকে নিজ রাজ্যে কতক ব্রহ্মোত্তর দান করিলেন। এইরূপে রাজা ব্রাহ্মণগণকে শ্রীহট্টের মধ্যে বাসোপযুক্ত ভূমি প্রদান করিলে, তাঁহারা শ্রীহট্টে উপনিবিষ্ট হইলেন। যে স্থান ব্রাহ্মণগণকে প্রদত্ত হইল, তথায় টেঙ্গরি-কুকি সম্প্রদায়[৬] আপনাদের "জুম" চাস করিত।[৭] রাজাজ্ঞায় পঞ্চবিপ্র পার্ব্বত্যভূমি আশ্রয় করিলেন; এবং পঞ্চ ব্রাহ্মণের মধ্যে বিভক্ত হওয়ায় সেই স্থান "পঞ্চখণ্ড" নামে (অধুনা উক্ত নামে পরগণা) পরিচিত হইল। এস্থলে দানপত্রের প্রতিলিপি উদ্ধৃত হইতেছে,—

"ত্রিপুরাপর্ব্বতাধীশা শ্রীশ্রীযুক্তাদিধর্ম্মপা,
সমাজ্ঞং দত্তপত্রঞ্চ মৈথিলেষু তপস্বিষু।
বৎস-বাৎস্য-ভরদ্বাজ-কৃষ্ণাত্রেয়-পরাশরাঃ,
শ্রীনন্দানন্দগোবিন্দশ্রীপতিপুরুষোত্তমাঃ।
প্রতীচ্যামুত্তরস্যাঞ্চ বক্রগা ক্রোশিরা[৮] নদী,
দক্ষিণস্যাঞ্চ পূর্ব্বস্যাং হাঙ্কনাকৌকিকাপুরী।[৯]
এতন্মধ্যাং সশস্যাং যাং টেঙ্গরিকুকিকর্ষিতাং
প্রাগলভ্যদত্তাং তদ্ভূমিং তেষু পঞ্চ তপস্বিষু।
মকরস্থে রবৌ শুক্লে পক্ষে পঞ্চদশীদিনে,
ত্রিপুরা চন্দ্রবাণাব্দে প্রদত্তা দত্তপত্রিকা।"[১০]

এইরূপে ৫১ ত্রৈপুরাব্দ বা খৃষ্টীয় ৬৪১ অব্দে শ্রীহট্টের পঞ্চখণ্ডে ব্রাহ্মণগণ উপনিবিষ্ট হইলেন। ইহার এক বর্ষকাল পরে শ্রীনন্দাদি স্বদেশে গমন করেন এবং স্ত্রীপুত্রাদি ও আত্মীয় কুটুম্বগণসহ পুনর্ব্বার শ্রীহট্টস্থ নিজ অধিকৃত স্থানে আগমন করেন। শাস্ত্রীয় ক্রিয়াকাণ্ড-সম্পাদনে অসুবিধা ঘটে বলিয়া, তাঁহারা ঐ সময় স্বদেশবাসী অপর পঞ্চগোত্রীয় (অর্থাৎ কাত্যায়ন, কাশ্যপ, মৌদ্গল্য, স্বর্ণকৌশিক ও গৌতম) ব্রাহ্মণগণকে আনয়ন করেন।[১১] পঞ্চখণ্ডে পরম প্রীতিতে এইরূপে

(৬) ঐ স্থান অধুনা "টেংরা" নামে কথিত।

(৭) জঙ্গল আবাদক্রমে একত্র বহুজাতীয় শস্যবীজ বপন করার প্রণালী কুকিসম্প্রদায়মধ্যে প্রচলিত, ঐ প্রথাকে জুমচাস বলে।

(৮) বর্ত্তমান ইহার নাম কুসিয়ারা নদী।

(৯) ইহাদের নামানুসারে প্রসিদ্ধ হাকলুকিহত্তরের নাম হইয়াছে।

(১০) এই অংশ এখন শ্রীহট্টের অধীন এবং মুসলমানাধিকার হইতেই শ্রীহট্টের অংশভুক্ত হইয়াছে; সুতরাং ইহা বৃটিশাধিকারভুক্ত। এই ভূসম্পত্তি উক্ত দানপত্রের বলে উদ্ধার করিবার জন্য মহারাজ কৃষ্ণকিশোর মাণিক্য বাহাদুর বাদী হইয়া গবর্ণমেন্টের বিরুদ্ধে শ্রীহট্ট জজ আদালতে এক দেওয়ানি মকদ্দমা রুজু করেন। উক্ত মকদ্দমা রুজুর তারিখ ৪।৬।১৮৪৩ খৃষ্টাব্দে, নং ৩১৪।১৮৪৩-৪৪ ইং। উক্ত মকদ্দমায় এই দানপত্র দাখিল হয় এবং এখন শ্রীহট্ট হইতে তাহা শিলঙে নীত হইয়াছে।

(১১) বৈদিক-সংবৰ্দ্ধিনী ও বৈদিকনির্ণয় গ্রন্থে এতদ্বিবরণ বিস্তারিত কথিত হইয়াছে।

দশগোত্রীয় ব্রাহ্মণগণ বাস করিতে লাগিলেন। ইহাদের ক্রিয়াকলাপ মৈথিল কুলাচার ও প্রাচীন প্রথানুসারে নির্ব্বাহ হইত ও অদ্যাপি হইতেছে।

সমস্ত বঙ্গদেশে রঘুনন্দন ভট্টাচার্য্যের স্মৃতি প্রচলিত,—রঘুনন্দনের স্মৃত্যুক্ত ব্যবস্থানুসারে অধিকাংশক্রিয়া পরিচালিত; কিন্তু শ্রীহট্টদেশে রঘুনন্দনের মত চলে না, অদ্যাপি শ্রীহট্টের শাস্ত্রীয় ক্রিয়া প্রাচীন মতে সম্পন্ন হয়। ইহার কারণ শ্রীহট্টে মৈথিল-বিপ্রগণের প্রাধান্য।

যাহা হউক, উক্ত ঘটনার ছয়শত বৎসর পরে বাৎস্যগোত্রীয় পূর্ব্বোক্ত আনন্দের বংশে নিধিপতি নামে এক ব্যক্তি অতি প্রসিদ্ধ ছিলেন, ইনি শ্রীহট্টে ইটা নামে এক নগর প্রতিষ্ঠা করেন, ইঁহার সপ্তপুরুষে শুভরাজ নামে এক ব্যক্তি দিল্লী হইতে খাঁন উপাধি প্রাপ্ত হন। ইহার পুত্রের নাম ভানুনারায়ণ। ভানু রাজা উপাধি লাভ করেন। তাঁহার নামানুসারে রাজ্যের নাম "ভানুগাছ" হয় (অধুনা উক্ত নামীয় পরগণা রহিয়াছে)। ভানুর জ্যেষ্ঠ পুত্রের নাম রাজা সুবিদ-(বা সুবুদ্ধি) নারায়ণ। যখন দিল্লীর সিংহাসন লইয়া হুমায়ুন ও সেরশাহ আফগানের মধ্যে প্রতিদ্বন্দ্বিতা চলিতেছিল, তখন শ্রীহট্টে ইটার সুবিদনারায়ণ স্বাধীনভাবে শাসনদণ্ড পরিচালন করিতেছিলেন।

এই সুবিদনারায়ণ নৃপতি এতদ্দেশে "সমাজপতি"-পদে প্রতিষ্ঠিত ছিলেন, "সমাজবন্ধনং কৃতং" ইত্যাদি বৈদিকনির্ণয়গ্রন্থকথিত বাক্যে তাহা জ্ঞাত হওয়া যায়। সুবিদনারায়ণ সর্ব্বপ্রকার ক্ষমতাপন্ন নৃপতি ছিলেন, তিনি পূর্ব্বদিগ্বর্ত্তী বাড়ুয়া পাহাড়ে দুর্গ প্রস্তুত করিয়া তাহাতে অস্ত্রশস্ত্র ও সৈন্য রক্ষা করিয়া রাজ্য দৃঢ় করেন, এবং "রাজনগর" নামক স্থানে রাজবাটী স্থানান্তরিত করেন।[১২] তিনি ধর্ম্মপরায়ণ, শিষ্টপালক, ও দুষ্টমর্দ্দক রাজা ছিলেন। বৈদিকনির্ণয়ে লিখিত আছে:—

"জাতঃ সুবুদ্ধিঃ শুদ্ধশ্চ রাজা পরমধার্ম্মিকঃ। দুষ্টানাং দমকশ্চৈব শিষ্টানাং পরিপালকঃ॥"

শ্রীহট্টে ব্রাহ্মণসম্প্রদায়ে এইরূপে সমাজবন্ধন হওয়ায়, এদেশে বল্লালী কৌলীন্যপ্রথা প্রবর্ত্তিত হয় নাই এবং শাস্ত্রোক্ত ক্রিয়াকাণ্ডও রঘুনন্দনের ব্যবস্থামত হয় না, তাহা পূর্ব্বেই বলিয়াছি। যদিও শ্রীহট্টে পরবর্ত্তিকালে কয়েকঘর রাঢ়ীশ্রেণীয় ব্রাহ্মণ আগমন করিয়াছেন বটে,* কিন্তু প্রকৃতপক্ষে শ্রীহট্ট বৈদিকপ্রধান দেশ এবং "সাম্প্রদায়িক" ব্রাহ্মণগণের সম্মানই শ্রীহট্টে সর্ব্বোপরি প্রতিষ্ঠিত। শ্রীহট্টে ব্রাহ্মণগণ মধ্যে শ্রেণী (বা গাঁই ইত্যাদি) ভেদ নাই। এখানে শ্রেণী জিজ্ঞাসা করিলে সুধু "সাম্প্রদায়িক" এই শব্দ বলিলেই পূর্ব্বোক্ত দশগোত্রীয় ব্রাহ্মণকে বুঝাইয়া থাকে।

---

(১২) প্রাচীন ভগ্নাবশিষ্ট রাজবাটীর সম্মুখবর্ত্তী দীর্ঘিকার তীরে পূর্ব্ব নামানুসারেই অধুনা "রাজনগর থানা" ও পোষ্ট আফিসাদি স্থাপিত হইয়াছে এবং বাড়ুয়া পাহাড়ের পাশীবারটিলায় দুর্গের ভগ্নাবশেষ দৃষ্ট হয়।

* W.W. Hunter তাঁহার Statistical Account of Assam Vol. II, শ্রীহট্টের বিবরণে লিখিয়াছেন যে, খৃষ্টীয় একাদশ শতাব্দীতে উক্ত ব্রাহ্মণগণ শ্রীহট্টে আগমন করেন।

…সুবিদনারায়ণের চারি পুত্র ও তিন কন্যা ছিল, তন্মধ্যে জ্যেষ্ঠ-কন্যা থঙ্গা ছিলেন, তাঁহার …ছিল রত্নাবতী। রাজা কাত্যায়ন-গোত্রীয় গোবিন্দ চক্রবর্ত্তীর পুত্র রঘুপতিকে কৌশলে …ভূত করিয়া[১৩] তাঁহার সহিত রত্নাবতীর বিবাহ দেন।

"বশীভূত করিয়া" বিবাহ দেন, তাহার কারণ এই যে বৎস, বাৎস্যাদি যে পঞ্চ-গোত্রীয় ব্রাহ্মণ এ দেশে আসিয়া ত্রিপুরাধিপতির যজ্ঞ সম্পাদন করেন ও রাজদত্ত দান গ্রহণ করেন, তাঁহারা প্রতিগ্রাহী বলিয়া অপর পঞ্চ-গোত্রীয় ব্রাহ্মণগণকর্ত্তৃক অবজ্ঞাত হইতেন। তন্মধ্যে আবার কাত্যায়ন গোত্রীয়গণ বিশেষ তেজোগর্ব্বসম্পন্ন ছিলেন, সুতরাং ধনলুব্ধ হইয়া রঘুপতি রাজকন্যা বিবাহ করিলে, তিনি নিজ আত্মীয়গণ কর্ত্তৃক পরিত্যক্ত হইয়াছিলেন।

এই রঘুপতির ভ্রাতারই নাম প্রসিদ্ধ রঘুনাথ শিরোমণি; যাঁহার নামে সমস্ত বঙ্গদেশ গৌরবান্বিত, সেই রঘুনাথের আদিপুরুষই শ্রীধরাচার্য্য। এ স্থলে কাত্যায়ন গোত্রীয় শ্রীধরাচার্য্যের বিস্তৃত বংশাবলীর একদেশমাত্র উদ্ধৃত হইল,[১৪]—

১। শ্রীধরাচার্য্য। (৫৩ ত্রিপুরাব্দে মিথিলা হইতে শ্রীহট্টে আগমন করেন।)

শ্রীপতি
|
শূলপাণি
|
বেদগর্ভ
|
শ্রীদত্তোপাধ্যায়
|
হলধর
|
গোবিন্দ
|
শ্রীনন্দ
|
গিরিধর
|
কন্দর্প
|
রামানুজ
|
শ্রীনিবাস
|
১৩ শশধর

১৩ শশধর
|
দিবাকর
|— বলভদ্র
|— শ্রীগর্ভ
  |
  ভূধরোপাধ্যায়
  |— বিভাকর
  | |
  | নীলকণ্ঠ
  | |
  | ভাস্করাচার্য্য
  | |
  | বৃহস্পতি
  | |
  | বিভাবতী
  | |— শ্রুতাচার্য্য
  | | |
  | | ২৩ ঈশান
  | |— রামশঙ্কর
  |— বিভাপতি

(১৩) "ততঃ সুবিদ্যানারায়ণনামা মহারাজঃ স্বকীয়ামেকাং কন্যাং কাত্যায়নগোত্রীয়ায় কস্মৈ তপস্বিনে দত্ত্বা উড়াভূমে ভূমিউড়াখ্যগ্রামং স্থিরীকৃত্য জামাতুর্ব্বসত্যর্থে দত্তবান্।" ইতি বৈদিকসংবাদিনী।

(১৪) কাত্যায়ন, পরাশর, বাৎস্য, ও স্বর্ণকৌশিক গোত্রীয় বিপ্রগণের সম্পূর্ণ বংশাবলী প্রাপ্ত হওয়া গিয়াছে। প্রথমাগত ব্যক্তি হইতে বর্ত্তমান জীবিত ব্যক্তিগণ পর্য্যন্ত তাঁহাদের মধ্যে কোন বংশে ৩৯ পুরুষ, কোথাও ৪০ পুরুষ; কোথাও ৪১ পুরুষ অতীত হইয়াছে। এ দিকে ত্রিপুরা-রাজবংশেও ডুঙ্গুর-ফা হইতে বর্ত্তমান মহারাজ পর্য্যন্ত ৩৯ পুরুষ ব্যবধান।

২৩ ঈশান
- বিদ্যুন্মালী
  - হরিহরাচার্য্য
    - রামকান্ত
      - রামচন্দ্র
        - গোবিন্দ
          - ২৯ রঘুপতি
          - **২৯ রঘুনাথ শিরোমণি**
    - রঘুনাথ
- রত্নগর্ভ

নিম্নে রঘুপতির অধস্তন বংশাবলীর একদেশমাত্র লিখিত হইল।

২৯ রঘুপতি
- রুদ্রপতি

শ্রীরাম (১ম পুত্র)	রঘুনাথ (২য় পুত্র)	শ্রীনাথ (৪র্থ পুত্র)
জয়কৃষ্ণ তর্কবাগীশ	রামেশ্বর	শুকদেব চক্রবর্ত্তী
রাধাকান্ত তর্কালঙ্কার	শ্রীকৃষ্ণ	ভ[া]নীপ্রসাদ
রামশরণ	শিবানন্দ	গৌরীশরণ
রাধাগোবিন্দ	শ্রীধর	রাজগোবিন্দ সার্ব্বভৌম
গোলোকচন্দ্র ন্যায়রত্ন	রামগঙ্গা সিদ্ধান্তবাগীশ	তারাকিশোর স্মৃতিরত্ন
রমেশচন্দ্র	তারানন্দ বিদ্যাবিনোদ	তারেশচন্দ্র
ব্রজেন্দ্রচন্দ্র	গদাধর	

উক্ত বংশাবলী দৃষ্টে প্রথমাগত শ্রীধরাচার্য্যের কালনিরূপণ সহজ হইয়া পড়ে এবং পূর্ব্ব-কথিত দানপত্রের সঙ্গেও তাহার অনৈক্য হয় না।

রঘুপতির কনিষ্ঠ ভ্রাতাই ভারতবিখ্যাত রঘুনাথ শিরোমণি, ইহা পূর্ব্বে বলিয়াছি। রঘুপতির পূর্ব্বপুরুষ অনেকেই মহামান্য পণ্ডিত ছিলেন। শ্রীহট্টে প্রথমাগত শ্রীধরাচার্য্য, কাত্যায়ন শ্রৌতসূত্রের ভাষ্যকার হইতে অভিন্ন ব্যক্তি কি না জানি না। ইহার পঞ্চদশ পর্য্যায়ে বল-ভদ্রাচার্য্যের নাম দৃষ্ট হয়; তিনি (১০০১ শকে) বঙ্গেশ্বর শ্যামলবর্ম্মের সভাসদ ছিলেন। ঐ বংশীয় হরিহরাচার্য্য (রঘুনাথের বৃদ্ধপ্রপিতামহ) জ্যোতিষশাস্ত্রে অসাধারণ পণ্ডিত ছিলেন। তাঁহার প্রণীত "সময়প্রদীপ" নামে এক জ্যোতিষগ্রন্থ আছে, এ দেশের চতুষ্পাঠীসমূহে তাহা

হয়। রঘুপতি ও রঘুনাথের পিতা গোবিন্দ। ইনি শুদ্ধিদীপিকার "দীপিকাপ্রভা" নামে টীকা রচনা করেন, অদ্যাপি তাহা এদেশে প্রচারিত আছে।

রুদ্রপতির তিন পুত্রের নাম লিখিত হইয়াছে। তৃতীয় পুত্র হরিনাথের নাম লিখিত হয় নাই, তাহার কারণ অল্পবয়সে অপুত্রকাবস্থায় তাঁহার মৃত্যু হয়। তৎপত্নী সুলোচনা দেবী, পতির জলন্ত চিতায় ঝাঁপ দিয়া, সহগমন করেন।

রুদ্রপতির দ্বিতীয় পুত্র রঘুনাথ ন্যায়ালঙ্কারের পুত্রবধূ মালতীদেবী পতির সহিত সহমৃতা হইয়াছিলেন। তাঁহার চতুর্থ পুত্র শ্রীনাথের বংশে রাজগোবিন্দ সার্ব্বভৌমের জন্ম হয়। ইনি অতি বিখ্যাত পণ্ডিত ছিলেন। ইঁহার মত পণ্ডিত ইদানীন্তন কালে এদেশে আর জন্মগ্রহণ করেন নাই। ইনি কোন এক প্রসিদ্ধ শ্রাদ্ধে সমবেত কাশী, মিথিলা, নবদ্বীপ প্রভৃতি স্থানের বহু পণ্ডিতকে শাস্ত্রবিচারে পরাস্ত করিয়াছিলেন। ইনি সংস্কৃতভাষায় ত্রয়োদশ খানা এবং বঙ্গভাষায় চারিখানা গ্রন্থ প্রণয়ন করেন।

আমরা কথাপ্রসঙ্গে বহুদূরে আসিয়া পড়িয়াছি। এখন আলোচ্য-বিষয়ের অনুসরণ করা যাউক। রঘুনাথের পিতার নাম গোবিন্দ এবং মাতার নাম সীতাদেবী। ৯২৫ বৎসর পূর্বে শ্রীহট্টের অন্তর্গত পঞ্চখণ্ডে তিনি জন্মগ্রহণ করেন। কথিত আছে, (১৩৯৯ শকাব্দে) পাঁচ বৎসর বয়সের পর নিজ গ্রামস্থ শিবরাম তর্কসিদ্ধান্তের টোলে অধ্যয়নের জন্য তাঁহাকে প্রেরণ করা হয়। দুই দিবস মধ্যে তিনি স্বরবর্ণ চিনিয়া ফেলেন। ব্যঞ্জনবর্ণ পরিচয়কালে, তিনি অধ্যাপককে এই প্রশ্ন করেন যে, দুটী 'ন' তিনটি 'শ' এবং দুটী 'জ' কেন? যাহা হউক, অত্যল্পকাল মধ্যে তিনি দেশে ব্যাকরণাদি শাস্ত্রে সুপণ্ডিত হইয়া উঠেন। যখন তাঁহার বয়ঃক্রম একাদশ বর্ষ মাত্র, তখন তাঁহার জ্যেষ্ঠ ভ্রাতা রঘুপতি রাজা সুবিদনারায়ণের কন্যাকে বিবাহ করেন। রঘুনাথের মাতা, তাঁহার অপর জ্ঞাতিগণ, এবং তিনি নিজে ইহাতে অতিশয় বিরক্ত হন। যদিও রঘুনাথ তখন বালক মাত্র, তথাপি তিনি ইহা অতি অপমানজনক মনে করিয়াছিলেন। বালক হইলে কি হয়, বালক অভিমন্যু কৌরবদলকে বিত্রস্ত করিয়াছিলেন, রাজপুতবালক বাদল তেজস্বী মুসলমানগণকে সন্ত্রাসিত করিয়াছিলেন; বালক আকবর মোগলসাম্রাজ্যের প্রতিষ্ঠা করেন। তেজস্বী বালক রঘুনাথ লোকমুখে ভ্রাতার নিন্দা শ্রবণে তাঁহার সহিত সম্বন্ধ ত্যাগ করিয়া, দেশ ছাড়িয়া নবদ্বীপে চলিয়া আসিবেন, তাহাতে আর বৈচিত্র্য কি?

ঐ সময় নবদ্বীপের বড় নাম। ব্রাহ্মণ-সমাজে নবদ্বীপ তখন বর্ত্তমান কলিকাতা অপেক্ষাও ঐশ্বর্য্যশালিনী। নবদ্বীপে তখন শ্রীহট্টদেশীয় বহুতর ব্যক্তি[১৫] বাস করিতেন। রঘুনাথ নবদ্বীপের নাম জানিতেন; নবদ্বীপে পুত্রকে বিদ্যাশিক্ষায় নিয়োজিত করেন, সীতাদেবীরও সে ইচ্ছা ছিল; কাজেই কনিষ্ঠপুত্রের ইচ্ছানুসারে তিনি তাঁহাকে লইয়া নবদ্বীপে যাইবেন সঙ্কল্প

---

(১৫) শ্রীহট্টবাসী শ্রীঅদ্বৈতাচার্য্য, রত্নগর্ভাচার্য্য, শ্রীবাসাচার্য্য, শ্রীচন্দ্রশেখর আচার্য্যরত্ন, শ্রীজগন্নাথ পুরন্দর প্রভৃতি পণ্ডিত এবং আরও বহুতর ব্যক্তির নাম বৈষ্ণবগ্রন্থাদিতে পাওয়া যায়।

করিলেন। পূর্ব্বে এতদ্দেশীয় লোক "মক্স্ুদাবাদে" গঙ্গাস্নানার্থ গমন করিত; সীতা পুত্রকে লইয়া প্রথমতঃ যাত্রীদের সহ মক্সুদাবাদে উপনীত হইলেন. তথায় তাঁহার উৎ রোগ হইল, এবং সঙ্গের যাত্রিগণ তাঁহাকে তদবস্থায় রাখিয়া চলিয়া আসিল। ঈশ্বর কৃপায় অ রেই তিনি আরোগ্য লাভ করিলেন, কিন্তু সম্বলশূন্য হওয়ায় বড়ই ব্যাকুল হইয়া পড়িলেন। য হউক, তখন তিনি এক ব্যবসায়ীকে পিতৃ-সম্বোধন করিয়া, তাঁহার সহিত নবদ্বীপে গমন করেন। ব্যবসায়ী তাঁহাকে নবদ্বীপে পৌছাইয়া দিয়া অন্যত্র চলিয়া যান। রঘুনাথ-জননী বালক-পুত্র লইয়া নবদ্বীপে উপস্থিত হইলেন; কিন্তু কাহার আশ্রয়ে যাইবেন, কোথায় স্থান পাইবেন, তাহার নিশ্চয়তা নাই। প্রবৃত্তির উত্তেজনায় বালকের বাক্যে চলিয়া আসিয়াছেন বলিয়া, তিনি অনুতপ্ত হইলেন। এই সময় ঘটনাক্রমে তথায় বাসুদেব সার্ব্বভৌম নামক প্রসিদ্ধ পণ্ডিতের সহিত তাঁহাদের দেখা হইল। বাসুদেব তাঁহাদের শোচনীয় অবস্থার কথা জ্ঞাত হইয়া তাঁহাদিগকে আশ্বাস দান করেন ও আপন আশ্রয়ে লইয়া যান। মাতাপুত্রে তাঁহার বাড়ীতেই স্থান পাইলেন।

এই সময়ে বাসুদেবের ন্যায়ের টোল নবদ্বীপে বিখ্যাত। এই টোলে তখন ছাত্র ধরিত না। বাসুদেব রঘুনাথের বুদ্ধি ও প্রত্যুৎপন্নমতিত্বের পরিচয় পাইয়া তাঁহার প্রতি সন্তুষ্ট হন ও তাঁহাকে তাঁহার মাতার প্রার্থনায় নিজ টোলে ছাত্ররূপে গ্রহণ করিয়া ন্যায়শাস্ত্র শিক্ষা দিতে লাগিলেন।

বাসুদেবের ছাত্রগণ ভারতবিখ্যাত। তাঁহারা এক একজন স্বগুণে দেশের গৌরবস্থল। স্মৃতিতত্ত্বকার রঘুনন্দন, জগদীশের গুরু প্রসিদ্ধ নৈয়ায়িক ভবানন্দ সিদ্ধান্তবাগীশ, ন্যায়কুসুমাঞ্জলির টীকাকার হরিদাস ভট্টাচার্য্য ও শ্রীচৈতন্য মহাপ্রভু বাসুদেব সার্ব্বভৌমের ছাত্র।

শ্রীচৈতন্য মহাপ্রভু কখন কখন সঙ্গিগণের সঙ্গে রঙ্গ করিতেন। তাঁহার তামাশার একটা বিশেষত্ব এই ছিল যে, যাঁহার সহিত কোনরূপ সম্পর্ক থাকিত, তাঁহার সহিত কখনও রঙ্গ করিতেন না। একদেশীয় বলিয়া তিনি শ্রীহট্টবাসীর সহিত তাঁহাদের কথ্য-ভাষা লইয়া ঠাট্টা করিতেন। তাঁহারা উত্যক্ত হইয়া বলিত, ঠাকুর! তোমার পক্ষে শ্রীহট্টের ভাষা লইয়া বিদ্রূপ শোভা পায় না।

"পিতামাতা আদি করি যতেক তোমার।
বল দেখি শ্রীহট্টে না হয় জন্ম কার?"[১৬]

এইরূপে যখন শ্রীচৈতন্যদেব গঙ্গাদাসের টোলে ব্যাকরণ অধ্যয়ন করিতেন, তখন তাঁহার সহিত কৃষ্ণানন্দ ও মুরারি গুপ্তও তথায় ছিলেন। কিন্তু তিনি কৃষ্ণানন্দকে কথাটি মাত্র না বলিয়া প্রতিদিন শ্রীহট্টবাসী মুরারিগুপ্তকে উত্যক্ত করিতেন। সার্ব্বভৌমের গৃহেও তিনি

(১৬) শ্রীচৈতন্যের পিতার জন্মস্থান শ্রীহট্টের অন্তর্গত ঢাকা দক্ষিণ, এবং মাতার জন্মস্থান এখানকার তরপ পরগণান্তর্গত জয়পুর গ্রাম। তাঁহার মাতামহ নীলাম্বর চক্রবর্ত্তী ও পিতা জগন্নাথ পুরন্দর নবদ্বীপে গমন করেন। জয়ানন্দের চৈতন্যমঙ্গল ও বৃন্দাবন-দাসের চৈতন্যভাগবতাদি গ্রন্থে তাহা কথিত হইয়াছে।

শ্রীহট্টের জয়পুর গ্রামে এখনও বহুতর বৈদিক ব্রাহ্মণের বাস রহিয়াছে।

রঘুনাথকে পাইলেন। রঘুনাথ অল্পবয়স্ক শ্রীচৈতন্যকে প্রথমতঃ বড় গ্রাহ্য করিতেন না; কিন্তু একটু পরেই তাঁহার এ ভ্রম ঘুচিয়া গিয়াছিল এবং তিনি শ্রীচৈতন্যের অসাধারণ প্রতিভায় স্তম্ভিত হইয়াছিলেন।

এক দিন সার্ব্বভৌম রঘুনাথকে একটি প্রশ্নের উত্তর দিতে বলেন। রঘুনাথ সে প্রশ্নের উত্তর কোন ক্রমেই স্থির করিতে পারিতেছিলেন না। তিনি নির্জ্জনে এক বৃক্ষমূলে বসিয়া ঐ প্রশ্নের উত্তরচিন্তা করিতে করিতে একবারে ধ্যানমগ্ন হইয়া পড়েন। সূর্য্যদেব যে অনেক দূরে চলিয়া গিয়াছেন, শাখাস্থিত পক্ষীরা যে তাঁহার অঙ্গে বিষ্ঠা ত্যাগ করিয়াছে, এ সকল তিনি জানেন না,—উত্তর-চিন্তায় তখন তিনি বিভোর! এমন সময় শ্রীচৈতন্যদেব তথায় উপস্থিত হইলেন এবং তাঁহাকে তদবস্থ দেখিয়া, তাঁহার গাত্রে বারিস্থিত জলের ছিটা দিলেন। জলের শীতলতায় রঘুনাথের চিন্তাস্রোত পরিবর্ত্তিত হইল, তিনি শ্রীচৈতন্যকে দেখিয়া হাসিলেন। নিমাই বলিলেন— "তপস্বীসাহেব বসিয়া অত কি ভাবিতেছ?" "সে কথায় তোমার কাজ কি? তুমি কি তাহা বুঝিতে পারিবে?"—রঘুনাথ উত্তর দিলেন। শ্রীচৈতন্য দেব কিন্তু প্রশ্নটি শুনিতে বিশেষ জেদ করাতে রঘুনাথ অগত্যা তাহা বলিলেন। তখন শ্রীচৈতন্য শ্রবণমাত্রে তাহার উপযুক্ত উত্তর দিয়া বলিলেন,—"এরই জন্ত তোমার এত চিন্তা?" রঘুনাথ বিস্মিতভাবে বলিলেন—"নিমাই! তুমি কি দেবতা?" ইহার পর আর একটী ঘটনায় রঘুনাথ চৈতন্যের প্রভাব বুঝিতে পারেন। রঘুনাথ ন্যায়ের এক টিপ্পনী লিখিতে আরম্ভ করেন; শ্রীচৈতন্যদেবও ঐ সময় ন্যায়ের এক টীকা লিখিতেছিলেন; রঘুনাথ কোন ক্রমে জানিতে পারিয়া, ঐ গ্রন্থখানা তাঁহাকে দেখাইতে নিমাইকে অনুরোধ করেন। নিমাই স্বীকৃত হইয়া এক দিন জাহ্নবী সন্নিধানে রঘুনাথকে তাহা পাঠ করিয়া শুনাইতে আরম্ভ করেন।

রঘুনাথের মনে বিশ্বাস ছিল যে, তাঁহার কৃত গ্রন্থখানা অদ্বিতীয় হইবে, ইহা দ্বারা তিনি খ্যাত হইবেন। কিন্তু নিমাইকৃত গ্রন্থে অদ্ভুত বিচারপদ্ধতি ও সিদ্ধান্তশ্রবণে তাঁহার সে ভরসা চলিয়া গেল। চিরপ্রোথিত আশা দূর হইতে লাগিল এবং সেই সঙ্গে তাঁহার ধৈর্য্য বিদূরিত হইল, তাঁহার চক্ষু ছল ছল করিতে লাগিল। এতদ্দৃষ্টে করুণ-হৃদয় নিমাই বড় ব্যথিত হইলেন এবং বলিলেন, "ভাই! তুমি কাঁদিতেছ কেন?" রঘুনাথ বলিলেন,—"আমার আশা ছিল, জগতে বিখ্যাত হইব; কিন্তু আমি দুই পৃষ্ঠা লিখিয়া যাহা ব্যক্ত করিতে পারি নাই, তুমি এক ছত্রে তাহা করিয়াছ। তোমার এ গ্রন্থ থাকিতে আমার লেখায় কেহ দৃক্‌পাত করিবে না।" এরূপ উক্তি শুনিয়া নিমাই সহাস্যে বলিলেন,—"ইহার জন্য এত ভাবনা কেন? এই অফল শাস্ত্রের আবার ভাল মন্দ কি? ইহা বলিয়া তিনি স্বীয় রচিত টীকাখানা জাহ্নবী-জলে বিসর্জ্জন করিলেন।* এইরূপে জগৎ এক মহামূল্য সম্পত্তি হইতে বঞ্চিত হইল। এই সময় হইতে নিমাই ন্যায়শাস্ত্র অধ্যয়নও ত্যাগ করিলেন। রঘুনাথের সেই গ্রন্থই দীধিতি।

* "সেই ক্ষণে প্রভু(?)নিধি দয়া উপজিল। নিজকৃত টীকা গঙ্গা মাঝে ডারি দিল।" (ঈশানদাসকৃত অদ্বৈতপ্রকাশ।) কিন্তু অদ্বৈতপ্রকাশে রঘুনাথের নাম নাই। সা. প. স.।

যাহা হউক, রঘুনাথ প্রতিভাবলে বাসুদেবকে চমকিত করিয়াছিলেন, তিনি সার্ব্বভৌমকৃত টীকায় বহু দোষ বাহির করিয়া দিয়াছিলেন, এমন কি, নিজ পাঠগ্রন্থ গঙ্গেশোপাধ্যায়কৃত "চিন্তামণি" গ্রন্থেও দোষ প্রদর্শন করেন! নবদ্বীপে তখন ন্যায়ের উপাধি-পরীক্ষা ছিল না, রঘুনাথ নবদ্বীপে পাঠ সমাপনপূর্ব্বক মিথিলার মহাপণ্ডিত পক্ষধর মিশ্রের নিকট অধ্যয়নার্থ গমন করেন। প্রায় ১৪২১ শকাব্দে রঘুনাথ মিথিলায় গমন করেন। তিনি মিশ্রাবাসে উপস্থিত হইয়া দেখিলেন যে, একখানি নির্জ্জন গৃহে পণ্ডিত অবস্থিতি করিতেছেন। মিশ্র, রঘুনাথকে তখন একটি প্রশ্ন করিলেন, কিন্তু রঘুনাথ প্রত্যুত্তরে অসমর্থ হওয়ায় নিগৃহীত ও লজ্জিত হইয়া বাসায় প্রত্যাগমন করিলেন। তিনি বাসায় আসিয়া আলোচনা করিয়া দেখিলেন যে, প্রশ্নটি একটা ফাঁকি বই কিছু নহে! তৎপরদিনও এইরূপ ঘটিল। রঘুনাথ ভাবিয়া আকুল হইলেন, কেন এরূপ ঘটে? কেন পক্ষধরের সাক্ষাতে তাঁহার প্রতিভা বিলুপ্ত হইয়া যায়? কেন তিনি সামান্য ফাঁকিতে নিরুত্তর হইয়া পড়েন? যাহা হউক, তিনি কিছুই নির্দ্ধারিত করিতে না পারিয়া চতুর্থদিনে মিশ্রাবাসে উপস্থিত হইয়া দেখে , মিশ্রবর গৃহে উপস্থিত নাই, কিন্তু তাঁহার পুঁথিখানা খোলা রহিয়াছে। এতদ্দৃষ্টে তিনি ভাবিলেন যে, পক্ষ রে অসাধারণ পণ্ডিত, যিনি তাঁহার প্রতিভাকে উপর্য্যুপরি তিন দিন আচ্ছাদিত করিয়াছেন, তিনি শাস্ত্র চিন্তা ব্যতীত এক তিলও বৃথা ব্যয় করেন, সম্ভব নহে; তবে তিনি গ্রন্থ খোলা রাখিয়া যাইবেন কেন? বোধ হয়, খোলা স্থলে কোন বিষয়ে তাঁহার সন্দেহ উপস্থিত হওয়ায়, চিন্তা করিতে করিতে অন্যমনস্কভাবে তিনি তদবস্থায় পুস্তক রাখিয়া গিয়াছেন।

এইরূপ ভাবিয়া তিনি গ্রন্থের খোলা পৃষ্ঠা পাঠ করিয়া দেখিলেন; কিন্তু কিছুই পাইলেন না, তবে একটি শব্দ এরূপ ভাবে দেখিলেন যে, তৎপরবর্ত্তী নকার সপ্তম্যন্ত পদের উত্তর নিষেধার্থক বলিয়া আপাততঃ প্রতীয়মান হয়, কিন্তু তাহা হইলে অর্থ সঙ্গত হয় না। ফলতঃ শব্দটি তৃতীয়া বিভক্তির একবচনান্ত, তাহাতে নিষেধার্থক নকার নাই। রঘুনাথ অন্য কিছু না পাইয়া ইহাকেই মিশ্রের সন্দেহ স্থল বলিয়া বোধ করিয়া, এই শব্দটি তৃতীয়া বিভক্ত্যন্ত, এতদ্-প্রতিপাদক এক টীকা লিখিয়া পুস্তকের উপরে রাখিয়া দিলেন।

মিশ্র ইত্যবসরে গৃহে প্রবিষ্ট হইলেন এবং পুস্তকের উপরিভাগে অভিনব টীকা দেখিতে পাইয়া তাহাই সঙ্গত বলিয়া গ্রাহ্য করিলেন। "এ টীকা কি তুমি লিখিয়াছ?" রঘুনাথকে পক্ষধর জিজ্ঞাসা করিলে তিনি স্বীকার করিলেন। তখন পক্ষধর বলিলেন, "তোমার অভিলাষ ব্যক্ত কর।" রঘুনাথ বলিলেন,—"বাহিরে আসুন,—এ আপনার তপঃসিদ্ধ-গৃহ, এ গৃহে বিচারে প্রবৃত্ত হইব না, এ গৃহে আমার বুদ্ধি আচ্ছাদিত হইয়া যায়।" পক্ষধর তখন বাহিরে গেলেন এবং তথায় রঘুনাথ বহুক্ষণ বিচারের পর পক্ষধরকে পরাস্ত করিলেন। পক্ষধর রঘুনাথের প্রতি অত্যন্ত সন্তুষ্ট হইলেন এবং শিষ্যরূপে গ্রহণ করিয়া ন্যায় অধ্যয়ন করাইতে লাগিলেন।

পক্ষধরের অধ্যাপনার এক রীতি ছিল। তিনি চতুষ্পাঠীতে বসিয়া নিজ কার্য্য করিতেন, শিষ্যগণ পিছনে থাকিয়া পড়িত। কিন্তু কোন ছাত্র যদি সূক্ষ্মতর্কে যোগ্যতা প্রদর্শন করিয়া

তাঁহাকে তুষ্ট করিতে পারিত, তবে তিনি সেই ছাত্রের দিকে মুখ ফিরাইয়া (অর্থাৎ তাঁহাকে সম্মুখে রাখিয়া) পড়াইতেন। রঘুনাথ তাঁহার কাছে যাওয়া অবধি তিনি আর ছাত্রের দিকে পৃষ্ঠ দিতে পারেন নাই। এইরূপে রঘুনাথ সগৌরবে মিথিলায় অধ্যয়ন করিতে লাগিলেন। নানাদেশীয় ছাত্রগণ তাঁহার অদ্ভুত প্রতিভা-দর্শনে বিস্মিত হইল। মিথিলায় অবস্থানকালে প্রায় ১৪২৪ শকাব্দে নবদ্বীপে তাঁহার মাতৃবিয়োগ হয়।

এই সময় পক্ষধর মিশ্র "সামান্যলক্ষণা" নামে গ্রন্থ লিখিতে ছিলেন, রঘুনাথ এই গ্রন্থে দোষ ধরেন। ইহাতে একদা মিশ্র রঘুনাথকে বলেন,—

"বক্ষোজপানকৃৎ কাণ সংশয়ে জাগ্রতি স্ফুটং।
সামান্যলক্ষণা কস্মাদকস্মাদবলুপ্যতে॥"

পক্ষধরের কথা শুনিয়া রঘুনাথ কহিলেন,—

"যোঽক্ষং করোত্যক্ষিমন্তং যশ্চ বালং প্রবোধয়েৎ।
তমেবাধ্যাপকং মন্যে তদন্যে নামধারিণঃ॥"

উভয়ে এই সূত্রে এইরূপভাবে বিচার উপস্থিত হইল, মিশ্র সম্পূর্ণরূপে পরাভূত হইলেন, এবং তাঁহার শিক্ষা সমাপ্ত হইয়াছে বলিয়া বিদায় দিলেন। পণ্ডিত-শিরোমণি বলিয়া রঘুনাথ "শিরোমণি" উপাধি লাভ করিলেন।

রঘুনাথ বঙ্গদেশে অপ্রাপ্ত সমুদয় গ্রন্থ অধ্যয়ন করিয়া দেশে প্রত্যাগমন করিতে উদ্যত হইলে মিশ্র বলিলেন, "এ দেশ হইতে পুস্তক লইয়া যাইবার রীতি নাই।"

রঘুনাথ বলিলেন—"আমার নাম রঘুনাথ, বাঁচিয়া থাকিলে আর বঙ্গদেশীয়কে মিথিলায় ন্যায় পড়িতে আসিতে হইবে না।" ইহার কারণ, রঘুনাথের অনেক গ্রন্থই কণ্ঠস্থ হইয়াছিল। এই উপায়ে বাসুদেব সার্ব্বভৌমও বঙ্গদেশে ন্যায় লইয়া যান। রঘুনাথের দ্বারা সে অভাব সম্পূর্ণরূপে দূরীভূত হইল।

অতঃপর রঘুনাথ নবদ্বীপে প্রত্যাগমন করেন এবং হরিঘোষ নামক জনৈক ব্যক্তির অর্থ সাহায্যে প্রায় ১৪২৫ শকাব্দে ন্যায়ের চতুষ্পাঠী প্রতিষ্ঠা করেন। দেখিতে দেখিতে রঘুনাথের টোল ছাত্রে পরিপূর্ণ হইয়া উঠে। এই সময়ই তাঁহার প্রসিদ্ধ গ্রন্থ-দীধিতি-প্রচারিত হয়। দীধিতি, চিন্তামণি অবলম্বনে লিখিত হইলেও, প্রকৃতপক্ষে ইহা নূতন গ্রন্থ,—বিচার উদ্ভাবনাদি সমস্তই নূতন। দীধিতিপ্রচারের পরই নবদ্বীপ ন্যায়ালোচনার শ্রেষ্ঠস্থান বলিয়া পরিগণিত হয়। তৎপূর্ব্বে নবদ্বীপে উপাধি-দানের প্রথা ছিল না, মিথিলাবিজয়ী শিরোমণিই নবদ্বীপে উপাধি-দানের ব্যবস্থা করেন। এই সময় বাসুদেব সার্ব্বভৌম, উড়িষ্যার রাজা প্রতাপরুদ্রের বৃত্তি প্রাপ্ত হইয়া উড়িষ্যাদেশে গমন করেন। কিন্তু রঘুনাথের আবির্ভাবে ইহাতে নবদ্বীপের কিছুমাত্র ক্ষতি হয় নাই।

দীধিতি ব্যতীত তিনি উদয়নাচার্য্যের "গুণকিরণাবলী"র ও বল্লভাচার্য্যকৃত "লীলাবতী"র টীকা রচনা করেন। তদ্ভিন্ন তৎকৃত "প্রামাণ্যবাদ" "নানার্থবাদ" "ক্ষণভঙ্গুর-

বাদ" "আখ্যাতবাদ" "পদার্থখণ্ডন" "আত্মতত্ত্ববিবেক" প্রভৃতি বিখ্যাত গ্রন্থগুলি সর্ব্বত্রই প্রচারিত আছে।

রঘুনাথের একটি চক্ষু ছিল বলিয়া কেহ কেহ তাঁহাকে কাণাশিরোমণি বলিয়া উল্লেখ করেন। রঘুনাথের উপাধি শিরোমণি। শুধু এই শিরোমণি বলিলেই পণ্ডিতসমাজ রঘুনাথ শিরোমণিকে বুঝিয়া থাকেন। "ভাষাপরিচ্ছেদ" "সিদ্ধান্তমুক্তাবলী" প্রভৃতি প্রণেতা বিশ্বনাথন্যায়পঞ্চানন ন্যায়সূত্রবৃত্তির সমাপ্তিতে "শ্রীমচ্ছিরোমণিবর" বলিয়া ইঁহারই কাছে কৃতজ্ঞতা স্বীকার করিয়াছেন এবং গদাধর-ভট্টাচার্য্য অনুমানখণ্ডদীধিতির টীকাপ্রারম্ভে,—

"অভিবন্দ্য মুহুঃ সমাদরাৎ, পদপঙ্কজযুগং পুরদ্বিষঃ।
বিবৃণোতি গদাধরঃ সুধীরতিদুর্ব্বোধগিরঃ শিরোমণেঃ॥"

ইত্যাদি শ্লোকে রঘুনাথের কাছে কৃতজ্ঞতা ও গ্রন্থপরিচয় দিয়া গিয়াছেন। "আত্মতত্ত্ববিবেক" দীধিতিতে তিনি স্বয়ং সগর্ব্বে আপনাকে "তার্কিকশিরোমণি" বলিয়া পরিচয় দিয়াছেন,—

"নির্ণীয় সারং শাস্ত্রাণাং তার্কিকাণাং শিরোমণিঃ।
আত্মতত্ত্ববিবেকস্য ভাবমুন্তাবয়ত্যসৌ॥"

রঘুনাথের কবিত্বপ্রতিভাও ছিল, কিন্তু তিনি ন্যায়ের চর্চ্চায় ব্রতী থাকায় কবিতা-রচনার অবসর পান নাই, এইজন্যই "নমঃ প্রামাণ্যবাদায় মৎকবিত্বাপহারিণে" ইত্যাদি শ্লোকে প্রামাণ্যবাদকে নমস্কার করিয়াছেন।

শক্তিবাদ, ব্যুৎপত্তিবাদ আদি বহুতর গ্রন্থ-প্রণেতা দীধিতির টীকাকার গদাধর, শব্দ-শক্তিপ্রকাশিকা ও তর্কার্ণবপ্রণেতা জগদীশ এবং কারকচক্র প্রভৃতি প্রণেতা ভবানন্দ সিদ্ধান্তবাগীশ প্রভৃতি পণ্ডিতমণ্ডলী এই শিরোমণির দীধিতির টীকা লিখিয়া কীর্ত্তিমান্ হইয়াছেন। পাশ্চাত্য দার্শনিক পণ্ডিতবর্গও এই শিরোমণির যথেষ্ট গুণগান করিয়া থাকেন। এতাদৃশ জগদ্বিখ্যাত শিরোমণি শ্রীহট্টে জন্মগ্রহণ করিয়া বঙ্গদেশকে গৌরবান্বিত করিয়াছেন।

শ্রীহট্টে যে সকল মহাপণ্ডিত জন্মগ্রহণ করেন, তাঁহারা কেবল শ্রীহট্টের নহে,—সমস্ত বঙ্গদেশের গৌরবস্বরূপ হইয়াছেন। এইজন্য পণ্ডিতসমাজে এখনও এই প্রবাদবাক্ শ্রুত হওয়া যায়,—

"সর্ব্বত্র ত্রিবিধা লোকা উত্তমাধমমধ্যমাঃ।
চট্টলে চোত্তমো নাস্তি শ্রীহট্টে নাস্তি মধ্যমঃ॥

শিরোমণি প্রায় ১৪৬৩ শকাব্দে পরলোক গমন করেন।

শ্রীঅচ্যুতচরণ চৌধুরী তত্ত্বনিধি।

রঘুনাথ শিরোমণি

বা

কাণভট্ট শিরোমণি

পুণ্যভূমি নবদ্বীপ একটি প্রকৃত রত্নাকর। এই আকর হইতে যে কত শত রত্নের উদ্ভব হইয়াছে, তাহার ইয়ত্তা নাই। রঘুনাথ শিরোমণি এই সকল রত্নের মধ্যে সর্ব্বাপেক্ষা উজ্জ্বল। মিথিলা ও নবদ্বীপ-নিবাসী কয়েকটী পণ্ডিতের মুখে তাঁহার জীবনের যে কয়েকটী অদ্ভুত ঘটনার কথা শুনিয়াছি, তাহা অবলম্বন করিয়াই এই প্রবন্ধটী লিখিত হইল।

খৃষ্টীয় পঞ্চদশ শতাব্দীর শেষভাগেই রঘুনাথ নবদ্বীপে জন্মগ্রহণ করেন। তিন চারি বৎসর বয়সে তাঁহার পিতৃ-বিয়োগ হয়। তাঁহার পিতা অতি দরিদ্র ছিলেন। দরিদ্র পিতার মৃত্যু হইলে দরিদ্রা জননীকে শিশু-সন্তানের লালন পালন জন্য যে কিরূপ দুঃসহ যন্ত্রণা ভোগ করিতে হয়, তাহা সহজেই অনুমান করা যায়। রঘুনাথের মাতা ভিক্ষাবৃত্তি অবলম্বন করিয়া বহুক্লেশে রঘুনাথের ভরণপোষণ করিতে লাগিলেন। তৎকালে বাসুদেব সার্ব্বভৌমই নবদ্বীপে শ্রেষ্ঠ নৈয়ায়িক পণ্ডিত ছিলেন। বহুসংখ্যক ছাত্র বহু-দূরবর্ত্তী স্থান হইতে আসিয়া তাঁহার চতুষ্পাঠীতে ন্যায়শাস্ত্র অধ্যয়ন করিতেন। রঘুনাথের মাতা কয়েকটী ছাত্রের গৃহকার্য্য সম্পন্ন করিয়া অতিকষ্টে আপনার ও পুত্রের জীবন রক্ষা করিতে সমর্থ হইয়াছিলেন।

রঘুনাথের একটী চক্ষুঃ না থাকায় লোকে তাঁহাকে "কাণাভট্ট" বলিয়া ডাকিত। এই "কাণাভট্ট"ই যে কত শত জ্ঞানান্ধ লোকের চক্ষুঃ ফুটাইয়া দিয়াছেন ও অদ্যাবধি দিতেছেন, তাহার সীমা নাই। মহাপুরুষের বাল্যকালেই মহাপুরুষত্বের কিছু কিছু আভাস প্রাপ্ত হওয়া যায়। মহাপুরুষ রঘুনাথের সম্বন্ধেও মহাপুরুষত্ব-সূচক তিনটী জনশ্রুতি আছে :—

প্রথমতঃ। রঘুনাথের মাতা একদিন তাঁহাকে টোল হইতে আগুন আনিতে বলেন। রঘুনাথ আগুনের জন্য একটী ছাত্রকে পুনঃ পুনঃ বিরক্ত করায় ছাত্রটী এক হাতা আগুন লইয়া তাঁহার সম্মুখে ধরিল। বালক রঘুনাথ উপায়ান্তর না দেখিয়া এক অঞ্জলি বালুকা লইয়া অগ্নি লইবার জন্য প্রস্তুত হইলেন। বাসুদেব সার্ব্বভৌম সেই সময় সেখানে উপস্থিত ছিলেন। তিনি বালকের প্রত্যুৎপন্ন-মতিত্ব দেখিয়া অবাক্ হইয়া গেলেন। সেই দিনই তিনি রঘুনাথের মাতাকে ডাকাইয়া আনিয়া কহিলেন, "তোমার ছেলেটী বড়ই বুদ্ধিমান্। কালক্রমে ছেলেটী একটী রত্ন হইবে। অদ্য হইতে আমি ইহার পড়াশুনার ভার লইলাম।" বাসুদেবের কৃপার কথা শুনিয়া রঘুনাথের মাতা আহ্লাদ-সহকারে তাঁহার হস্তে রঘুনাথের বিদ্যাশিক্ষার ভারার্পণ করিয়া নিশ্চিন্ত রহিলেন।

দ্বিতীয়তঃ। রঘুনাথের পাঁচ বৎসর বয়সের সময় বাসুদেব তাঁহার হাতে খড়ি দিলেন। রঘুনাথ 'ক খ' পড়িতে লাগিলেন। 'ক খ' পড়িতে পড়িতে স্বতঃই তাঁহার মনে হইল যে, অগ্রে 'ক' না

পড়িয়া 'খ' পড়িলেই বা কি দোষ হয়? বালক রঘুনাথ স্বয়ং এই সন্দেহের কিছুমাত্র মীমাংসা করিতে না পারিয়া বাসুদেবকে ইহার মীমাংসা করিতে বলেন। বাসুদেব শিষ্যের দুরন্ত জটিল প্রশ্ন শুনিয়া মহাবিপদে পড়িলেন। কোনও ছাত্রই তাঁহাকে পূর্ব্বে এরূপ অদ্ভুত প্রশ্ন করে নাই। সংস্কৃত বর্ণমালা কণ্ঠ, তালু, মূর্দ্ধা, দন্ত ও ওষ্ঠের সাহায্যে উচ্চারিত এবং বৈজ্ঞানিক প্রণালীতে আবদ্ধ। বাসুদেব রঘুনাথকে কোনরূপে ইহা বুঝাইয়া দিয়া এ ঘোর বিপদ্ হইতে স্বয়ং নিষ্কৃতি লাভ করিয়াছিলেন।

তৃতীয়তঃ। রঘুনাথ বাসুদেবকে ছাড়িবার পাত্র ছিলেন না। ব্যঞ্জন-বর্ণে দুইটী "জ", দুইটী "ন", দুইটী "ব" ও তিনটী "স" থাকিবার কারণ কি, তাহা তিনি একদিন তাঁহাকে জিজ্ঞাসা করিলেন। বাসুদেব পুনর্ব্বার বিপদে পড়িলেন। তিনি রঘুনাথের প্রশ্ন-কৌশল দেখিয়া মনে করিতে লাগিলেন, এ সামান্য বালক নহে। এরূপ প্রশ্নের উত্তর বালককে বুঝাইয়া দেওয়া বড় সহজ কথা নয়। বাসুদেব কোনরূপে ইহা রঘুনাথকে বুঝাইয়া দিয়া তাঁহাকে তুষ্ট করিয়াছিলেন। একমাত্র বর্ণমালা শিখাইতে গিয়াই বাসুদেব রঘুনাথকে ব্যাকরণের অনেক বিষয় শিক্ষা দিয়াছিলেন। রঘুনাথ অতি অল্প বয়সেই ব্যাকরণ, অভিধান, কাব্য ও স্মৃত শাস্ত্রের অধ্যয়ন শেষ করিয়া বাসুদেবের নিকট ন্যায়শাস্ত্র অধ্যয়ন করিতে আরম্ভ করেন।

বাসুদেব যেরূপ যত্ন-সহকারে রঘুনাথের অধ্যাপনা করিতে লাগিলেন, রঘুনাথও ততোধিক যত্ন-সহকারে স্বয়ং অধ্যয়ন করিতে লাগিলেন। বাসুদেব দিবাভাগে রঘুনাথকে যে সকল পাঠ দিতেন, রঘুনাথ রাত্রিকালে তাহা তন্ন তন্ন করিয়া বুঝিয়া লইতেন, এবং বাসুদেবের ব্যাখ্যায় কোন-রূপ ত্রুটি থাকিলে রঘুনাথ প্রাতঃকালেই তাহা বাসুদেবকে জানাইতেন। ক্রমে ক্রমে রঘুনাথ স্বীয় অখণ্ডনীয় যুক্তিপ্রভাবে বাসুদেবের মত খণ্ডন করিতে লাগিলেন এবং বাসুদেবের বিদ্যাবুদ্ধিরও প্রভাব কত দূর, তাহাও তিনি সম্যগ্‌রূপে অনুভব করিলেন। বাসুদেব "সার্ব্বভৌম-নিরুক্তি" নামক একখানি টীকা-গ্রন্থ রচনা করিয়াছিলেন। কুশাগ্রীয়-বুদ্ধি রঘুনাথ এই গ্রন্থের নানা দোষ বাহির করিতে লাগিলেন। নৈয়ায়িক-রাজ গঙ্গেশ উপাধ্যায়ও তাঁহার হস্ত হইতে নিষ্কৃতি লাভ করিতে পারেন নাই। রঘুনাথ তাঁহার কৃত "চিন্তামণি" গ্রন্থের নানা দোষ বাহির করিয়া ও তাহা একত্র লিপিবদ্ধ করিয়া স্বীয় মত প্রকাশ করিতে লাগিলেন। রঘুনাথের এই সমস্ত অলৌকিক কাণ্ড দেখিয়া নবদ্বীপে মহা হুলস্থূল পড়িয়া গেল!

এই সময়ে নবদ্বীপে মহাত্মা শ্রীচৈতন্য-দেবের প্রাদুর্ভাব। চৈতন্যদেব রঘুনাথের সমপাঠী ছিলেন বলিয়া উভয়েরই মধ্যে পরম সৌহার্দ্দ ছিল। রঘুনাথের যখনই যে কিছু সন্দেহ হইত, তখনই তিনি তাহা চৈতন্যদেবকে জ্ঞাপন করিলেই তাহার যুক্তি-সঙ্গত মীমাংসা পাইতেন। এক দিন রঘুনাথ কোনও জটিল প্রশ্নের সমাধান করিবার জন্য নবদ্বীপের নিকটবর্ত্তী কোনও প্রান্তরে এক যজ্ঞ-ডম্বুর-বৃক্ষতলে একাগ্রচিত্তে গভীর চিন্তায় নিমগ্ন ছিলেন। চিন্তাশীলতাই রঘুনাথের সবিশেষ গুণ ছিল। তিনি দিবানিশি সেই স্থানে থাকিয়া এরূপ চিন্তামগ্ন হইয়াছিলেন যে, পক্ষিগণ তাঁহার গাত্রে মলত্যাগ করিলেও তাঁহার চিন্তাভঙ্গ হয় নাই। পরদিন প্রাতঃকালে চৈতন্যদেব

স্নান করিয়া সেই স্থান দিয়া যাইতে ছিলেন। তিনি রঘুনাথকে এরূপ অবস্থাপন্ন দেখিয়া বন্ধু-ভাবে পরিহাস করিয়া তাঁহার মস্তকে এক গণ্ডূষ জল দিয়া কহিলেন "বৃক্ষতলে বসিয়া মাথামুণ্ড কি ভাবিতেছ?" চৈতন্যদেবের কথা শুনিয়া রঘুনাথের চিন্তাভঙ্গ ও সংজ্ঞালাভ হইল। রঘুনাথ কহিলেন, "আমি যাহা চিন্তা করিতেছি, তুমি তাহার কি বুঝিবে?" তখন চৈতন্যদেব কহিলেন, "ভাই! তুমি যাহা ভাবিতেছিলে, তাহা আমাকে এখনই একবার বল"। তখন রঘুনাথ তাঁহাকে নিজ চিন্তিত বিষয়ের কথা বলিলে চৈতন্যদেবও তৎক্ষণাৎ তাহার উত্তর দিয়া তাঁহাকে সন্তুষ্ট করিলেন। রঘুনাথ চৈতন্যদেবের নিকট হইতে সদুত্তর পাইয়া কহিলেন, "ভাই! তুমি সামান্য মনুষ্য নও! তুমি বাস্তবিকই একটী মহাপুরুষ।"

রঘুনাথ ও চৈতন্যদেব উভয়েই প্রথমতঃ এক পথের পথিক ছিলেন; কিন্তু পরিশেষে নিজ নিজ প্রকৃতি-বশতঃ বিভিন্ন পথের পথিক হইতে বাধ্য হইয়াছিলেন! উভয়েই সমান বুদ্ধিমান্ ছিলেন, কিন্তু চৈতন্যদেবের মত রঘুনাথের ধর্ম্ম-রস-পিপাসা বলবতী ছিল না। ন্যায়শাস্ত্রে উভয়েই এক মত অবলম্বন করিয়াছিলেন; কিন্তু বাসুদেবের সহিত তাঁহাদের মতের যথেষ্ট অনৈক্য হইত। বাসুদেব সরল-মনে ঐ সকল মত গ্রহণ করিতেন না। এজন্য রঘুনাথ সর্ব্বদাই অত্যন্ত মনঃক্ষুণ্ণ থাকিতেন। বাসুদেব রঘুনাথকে ইহার কারণ জিজ্ঞাসা করিলে রঘুনাথ কহিলেন, "গুরুদেব! আপনি আমার যুক্তি ও মত গ্রহণ করেন না, ইহাই আমার মনস্তাপের বিষয়। ইচ্ছা করিতেছি, মিথিলায় পক্ষধর মিশ্রের নিকট গিয়া আমার মত গুলি একবার তাঁহাকে জ্ঞাপন করিয়া আসিব।" বাসুদেব তাঁহাকে মিথিলা যাইতে অনুমতি প্রদান করিলেন বটে, কিন্তু ইহা তাঁহার ইচ্ছার বিরুদ্ধেই হইয়াছিল। রঘুনাথের মিথিলা-গমন করিবার আর একটী কারণ ছিল। তৎকালে নবদ্বীপে উপাধি-দানের ক্ষমতা ছিল না। যদি কেহ কোনরূপ উপাধি প্রাপ্ত হইতেন, তাহাও সর্ব্ব-বাদ-সম্মত ও গ্রাহ্য হইত না। রঘুনাথ মনে করিয়াছিলেন, পক্ষধরের নিকট ন্যায়শাস্ত্রে কৃতবিদ্য হইয়া ও মৈথিলগণকে পরাজিত করিয়া নবদ্বীপে চতুষ্পাঠী খুলিতে না পারিলে উপাধি-দান গ্রাহ্য হইবে না। ইহা ভাবিয়াই তিনি মিথিলায় গমন করিয়াছিলেন। রঘুনাথ বাসুদেবের নিকট হইতেই "শিরোমণি" উপাধি প্রাপ্ত হইয়াছিলেন।

রঘুনাথ মিথিলায় উপস্থিত হইলেন। এই সময়ে নৈয়ায়িক-কুল-পতি পক্ষধর মিশ্র মিথিলার আসনে বসিয়া ন্যায়শাস্ত্রের অধ্যাপনা করিতেছিলেন। তৎকালে মিথিলা ব্যতীত ভারতবর্ষের অন্য কোনও স্থানে ন্যায়শাস্ত্র পাঠ করিবার উপায় না থাকায় পক্ষধরের চতুষ্পাঠীতেই ভারতের চতুর্দ্দিক্ হইতে দলে দলে ছাত্রগণ আসিয়া উপস্থিত হইত। রঘুনাথ তাঁহারই চতুষ্পাঠীতে অধ্যয়ন করিতে প্রবৃত্ত হইলেন।

পক্ষধরের এইরূপ নিয়ম ছিল যে, কোনও আগন্তুক ছাত্র আসিয়া তাঁহার সহিত প্রথমতঃ কোনও কথা কহিতে পারিবে না। অগ্রে চতুষ্পাঠীর ছাত্রগণকে তর্কে পরাজিত করিতে পারিলে তবে তাঁহার সহিত কথা হইত। রঘুনাথ ছাত্রগণকে ন্যায়শাস্ত্রের কয়েকটী জটিল প্রশ্ন জিজ্ঞাসা করিয়া তাঁহাদিগকে পরাজিত করিলেন। পক্ষধরের আর একটী নিয়ম ছিল

যে, তিনি কোনও আগন্তুক ছাত্রের বিশেষ বিদ্যাবুদ্ধির পরিচয় না পাইলে তাহার দিকে মুখ ফিরাইয়া কথা কহিতেন না। রঘুনাথের উক্ত তর্কে বিমোহিত হইয়া পক্ষধর তাঁহার দিকে মুখ ফিরাইয়া জিজ্ঞাসা করিলেন :—

(১)

"আখণ্ডলঃ সহস্রাক্ষো বিরূপাক্ষস্ত্রিলোচনঃ।
অন্যে দ্বিলোচনাঃ সর্ব্বে কো ভবানেকলোচনঃ ॥"

ইন্দ্রের সহস্র চক্ষুঃ জানে ত্রিভুবন, শিবের তিনটী চক্ষুঃ জানে সর্ব্ব জন ॥
অপরের দুটী চক্ষুঃ তাও জানি আমি, এক চক্ষুঃ দেখি তব,—কে হে বাপু তুমি?

রঘুনাথ পক্ষধরের এই ব্যঙ্গোক্তি শুনিয়া সগর্ব্বে কহিলেন :—

(২)

"নলদ্বীপকুশদ্বীপনবদ্বীপনিবাসিনঃ।
তর্কসিদ্ধান্তসিদ্ধান্তশিরোমণিমনীষিণঃ ॥"

নলদ্বীপে কুশদ্বীপে নবদ্বীপে আর, তর্কসিদ্ধান্ত সিদ্ধান্ত শিরোমণি সার।

নলদ্বীপ-নিবাসী "তর্কসিদ্ধান্ত" ও কুশদ্বীপ-নিবাসী "সিদ্ধান্ত" এই দুই জন কে, তাহা জানিতে পারা যায় না। শ্লোকটী দেখিয়া অনুমিত হয়, ইঁহারা দুই জনেই ন্যায়শাস্ত্র অধ্যয়ন করিবার জন্য রঘুনাথের সহিত মিথিলায় গিয়াছিলেন।

এই সময়ে পক্ষধর মিশ্র "সামান্য-লক্ষণা" নামক একখানি ন্যায়-গ্রন্থ লিখিতেছিলেন। কিয়ৎক্ষণ এই পুস্তক সম্বন্ধে কথা কহিবার পর রঘুনাথ ইহার দোষ বাহির করিতে লাগিলেন। রঘুনাথ "সামান্য-লক্ষণা" স্বীকার করিলেন না। তখন পক্ষধর ক্রোধান্ধ হইয়া রঘুনাথকে কহিলেন :—

(৩)

"বক্ষোজপানকৃৎ কাণ সংশয়ে জাগ্রতি স্ফুটম্।
সামান্যলক্ষণা কস্মাদকস্মাদবলুপ্যতে ॥"

সংশয় রহিলে মনে দৃঢ় অনিবার, সামান্য-লক্ষণা কিসে কর অস্বীকার?

রঘুনাথের একটী চক্ষুঃ ছিল না। এজন্য পক্ষধর তাঁহাকে "কাণা" বলিয়া ব্যঙ্গ করাতে রঘুনাথের অত্যন্ত মনঃপীড়া হইল। তখন রঘুনাথ আক্ষেপ-সহকারে কহিলেন :—

(৪)

"যোঽন্ধং করোত্যক্ষিমন্তং যশ্চ বালং প্রবোধয়েৎ।
তমেবাধ্যাপকং মন্যে তদন্যে নামধারিণঃ ॥"

অন্ধ জনে চক্ষুষ্মান্ করেন যে জন, শিশুর করেন জ্ঞান-চক্ষুঃ-উন্মীলন,
তিনিই যথার্থ অধ্যাপক ভূমণ্ডলে, অধ্যাপক-নাম-ধারী অপর সকলে!

কথা-প্রসঙ্গে রঘুনাথ "চিন্তামণি"-গ্রন্থের কয়েকটী জটিল প্রশ্ন উত্থাপন করিলেন। পক্ষধর

সকল প্রশ্নের যথাযথ উত্তর দিতে না পারায় রঘুনাথ সন্তুষ্ট না হইয়া পুনঃপুনঃ তাঁহাকে উত্ত্যক্ত করিতে লাগিলেন। তখন পক্ষধর নানা বাক্য-জাল বিস্তার করিয়া রঘুনাথকে পরাস্ত করিবার চেষ্টায় কৃত-সংকল্প হইলেন। রঘুনাথ সহজে পরাস্ত হইবার ছাত্র ছিলেন না। তাঁহার যুক্তিযুক্ত তর্কে পরাজিত হইয়া ও উপায়ান্তর না দেখিয়া পক্ষধর তাঁহারই মতই সমর্থন করিলেন। কিছু দিনের মধ্যেই মিথিলার সর্ব্বত্র রঘুনাথের নাম প্রচারিত হইল।

যদিও পক্ষধর সময়ে সময়ে রঘুনাথের তর্কে পরাস্ত, অপ্রতিভ ও ক্রোধান্ধ হইয়া উঠিতেন, তথাপি তিনি তাঁহাকে অত্যন্ত ভাল বাসিতেন। একদিন চতুষ্পাঠীতে কয়েকটী মৈথিল অধ্যাপক ও বহুসংখ্যক ছাত্র উপস্থিত ছিলেন। এমন সময়ে পক্ষধর রঘুনাথকে জিজ্ঞাসা করিলেন, "ন্যায়-শাস্ত্র ভিন্ন অন্য কোনও শাস্ত্রে তোমার অধিকার আছে?" ইহা শুনিয়া রঘুনাথ কহিলেন :—

(৫)

"কাব্যেঽপি কোমলধিয়ো বয়মেব নান্যে
তর্কেঽপি কর্কশধিয়ো বয়মেব নান্যে।
তন্ত্রেঽপি যন্ত্রিতধিয়ো বয়মেব নান্যে
কৃষ্ণেঽপি সংযতধিয়ো বয়মেব নান্যে॥"

কাব্যেও আমার সদা সুকোমল মতি, তর্কেও আমার বুদ্ধি সুকর্কশ অতি।
তন্ত্রেও যন্ত্রিত সদা মনটী আমার, কৃষ্ণেও সংযত-চিত্ত আমি অনিবার!

এই শ্লোকটী শুনিয়া পক্ষধর কহিলেন, "তুমি নৈয়ায়িক হইয়াও কিরূপে কবিতা রচনা করিতে শিখিলে?" তখন রঘুনাথ কহিলেন :—

(৬)

"কবিত্বং কিয়দৌন্নত্যং চিন্তামণিমনীষিণঃ।
নিপীতকালকূটস্য হরস্যেবাহিখেলনম্॥"

"চিন্তামণি"-গ্রন্থে যিনি দক্ষ বিলক্ষণ, কবিত্ব তাঁহার কাছে অতি তুচ্ছ ধন!
চক্ চক্ ক'রে বিষ খান্ যেই হর, সাপ খেলাইতে তাঁর কভু লাগে ডর?

পক্ষধর কহিলেন, "যে বৈয়াকরণ-গণ খ ফ ছ ঠ লইয়া এবং নৈয়ায়িক-গণ ঘট পট লইয়াই সর্ব্বদা ব্যস্ত থাকেন, তাঁহাদিগের হৃদয় কদাপি কাব্যরসে সিক্ত হইতে পারে না।" তদুত্তরে রঘুনাথ কহিলেন :—

(৭)

"পঠন্তু কতিচিচ্ছঠাঃ খ ফ ছ ঠেতি বর্ণাঞ্ছঠা
ঘটঃ পট ইতীতরে পটু রটন্তু বাক্‌পাটবাৎ।

বয়ং বকুলমঞ্জরীগলদমন্দমাধ্বীঝরী-
ধুরীণপদরীতিভির্ভণিতিভিঃ প্রমোদামহে ॥"

পঠুক্ কুটিল বৈয়াকরণ সকল থ ফ ছ ঠ এইরূপ বর্ণ অবিরল ;
পঠুক্ বা বাক্য-পটু নৈয়ায়িক-গণ ঘট পট কট্‌কটে শব্দ সর্ব্বক্ষণ ;
বকুল-মঞ্জরী-মধু-সুরা-প্রস্রবণ পদ লইয়াই মোরা মত্ত অনুক্ষণ !

পক্ষধর কহিলেন, "যাঁহারা সর্ব্বদাই পরম কর্কশ স্থায়-শাস্ত্রের আলোচনায় মস্তিষ্ক বিলোড়ন করেন, তাঁহারা ছন্দঃ, ব্যাকরণ ও অলঙ্কার শাস্ত্রে সুপণ্ডিত হইলেও কিছুতেই সুকোমল কবিতা রচনা করিতে পারেন না"। তখন রঘুনাথ কহিলেন :—

(৮)

"সাহিত্যে সুকুমারবস্তুনি দৃঢ়ন্যায়গ্রহগ্রন্থিলে
তর্কে বা ভৃশকর্কশে মম সমং লীলায়তে ভারতী।
শয্যা বাস্তু মৃদুত্তরচ্ছদবতী দর্ভাঙ্কুরৈরাবৃতা
ভূমির্বা হৃদয়ং গতো যদি পতিস্তুল্যা রতির্যোষিতাম্ ॥"

যদি কিছু সুকোমল রহে এ সংসারে, একমাত্র সাহিত্যই বলিব তাহারে ;
প্রস্তরের মত যদি শক্ত কিছু রয়, যদি বা কর্কশ কিছু রহে অতিশয়,
স্থায়-শাস্ত্র সেই বস্তু,—দুয়ে অনিবার খেলিবে সমান খেলা ভারতী আমার ;
মৃদু-আস্তরণ শয্যা হউক কোমল, হউক কর্কশ তৃণাবৃত ভূমিতল,
যেখানে হউক,—পতি হৃদয়ে উঠিলে রমণীর রতিসুখ তুল্য ভূমণ্ডলে ;

(৯)

"যেষাং কোমলকাব্যকৌশলকলালীলাবতী ভারতী
তেষাং কর্কশতর্কবক্রবচনোদ্গারেঽপি কিং হীয়তে।
যৈঃ কান্তাকুচমণ্ডলে কররুহাঃ সানন্দমারোপিতা-
স্তৈঃ কিং মত্তকরীন্দ্রকুম্ভশিখরে ক্রোধান্ন দেয়াঃ শরাঃ ॥"

সুকোমল কাব্য-কলা-কেলি-সুকৌশল লইয়াই ব্যস্ত যাঁরা রন্ অবিরল,
পরম কর্কশ তর্ক-শাস্ত্রের চর্চ্চায় কিবা ক্ষতি তাঁহাদের হয় এ ধরায় ?
যাঁহারাই রমণীর বক্ষোজ-মণ্ডলে নখ বসাইয়া দেন মহা কুতূহলে,
তাঁহারাই মত্ত-করি-কুম্ভের উপরে নিক্ষেপ করেন শর মহা ক্রোধভরে !

(১০)

"তর্কে কর্কশবক্রবাক্যগহনে যা নিষ্ঠুরা ভারতী
সা কাব্যে মৃদুলোক্তিসারসুরভৌ স্যাদেব মে কোমলা।
যা তীক্ষ্ণা প্রিয়বিপ্রযুক্তযুবতীহৃৎকর্ত্তনে কর্ত্তরী
প্রেয়োলালিতযৌবতে ন মৃদুলা সা কিং প্রসূনাবলী॥"

তর্ক-শাস্ত্র ল'য়ে আমি উন্মত্ত যখন, বিষম কর্কশ বক্র আমার বচন।
কাব্য-শাস্ত্রে থাকি আমি যবে কুতূহলী, অতি মিষ্ট সুকোমল মোর বাক্য গুলি।
বিরহিণী যুবতীর হৃদয়-কর্ত্তনে যে পুষ্প কর্ত্তরী সম বোধ হয় মনে,
সে পুষ্প সে যুবতীর পক্ষে সুকোমল, প্রিয়তম-পার্শ্বে যার স্থিতি অবিরল!

রঘুনাথ পরম নৈয়ায়িক ছিলেন। তাঁহার মত নৈয়ায়িকের কবিতায় বিফল শব্দ থাকিবে কেন? তিনি স্বীয় কবিতায় যে সকল শব্দ ব্যবহার করিতে লাগিলেন, তাহাদের এক একটীতে বিশেষ সার্থকতা থাকিতে লাগিল। সুতরাং কবিতা বলিতে অবশ্যই তাঁহার একটু বিলম্ব হওয়ায় পক্ষধর কহিলেন, "এ সংসারে দ্রুত কবিই প্রশংসনীয়। কবিতা রচনা করিতে যদি বিলম্বই হয়, তবে আর কবির কবিত্ব-শক্তি কি?" পক্ষধরের এই কথা শুনিয়া রঘুনাথ কহিলেন :—

(১১)

"শ্লাঘ্যাস্তে কবয়ো যদীয়রসনারুক্ষাধ্বসঞ্চারিণী
ধাবন্তীব সরস্বতী দ্রুতপদন্যাসেন নিষ্ক্রামতি।
অস্মাকং রসপিচ্ছিলে পথি গিরাং দেবী নবীনোদয়ং-
পীনোত্তুঙ্গপয়োধরেব যুবতির্মান্থর্য্যমালম্বতে॥"

ধন্য ধন্য সেই সব কবি এ সংসারে যাঁদের কর্কশ-জিহ্বা-পথের উপরে
সরস্বতী অতি কষ্টে ভ্রমণ করিয়া বাহিরে আসেন দ্রুত পদ নিক্ষেপিয়া।
আমাদের জিহ্বা-পথ রসসিক্ত অতি,— পরম পিচ্ছিল তাই,—তাই সরস্বতী
নব-পীন-তুঙ্গ-স্তনী যুবতীর মত অতি সাবধানে পদ ফেলিয়া সতত
বাহির হয়েন শেষে হ'য়ে উল্লাসিনী, আমাদের সরস্বতী মন্থর-গামিনী!

রঘুনাথের ন্যায় নৈয়ায়িকের ন্যায়-সঙ্গত কথা শুনিয়া পক্ষধর নিরুত্তর হইয়া অধোমুখে রহিলেন। রঘুনাথ এই কবিতাটীতে আপনার প্রাণের কথা খুলিয়া ফেলিলেন। এখনও পক্ষধরের হস্তে রঘুনাথের নিষ্কৃতি নাই। পক্ষধর ভাবিলেন, রঘুনাথ নৈয়ায়িক হইতে পারে, কিন্তু হয় ত তাহার অলঙ্কার-শাস্ত্রে অধিকার নাই। ইহা ভাবিয়া পক্ষধর কহিলেন, "ধ্বনি ও রসই কবিতার প্রাণ। ধ্বনি ও রস-শূন্য কবিতা কবিতাই নয়।" রঘুনাথ অলঙ্কার-শাস্ত্রেও

সুপণ্ডিত ছিলেন তিনি জানিতেন, কেবল ধ্বনি ও রস থাকিলেই কবিতা হয় না। শব্দশুদ্ধি, শব্দ-সার্থকতা ও মাধুর্য্যই কবিতার প্রাণ। তখন তিনি কৌশল-সহকারে আপনার অভিপ্রায় জানাইবার জন্য কহিলেন :—

(১২)

"মাতঙ্গীমিব মাধুরীং ধ্বনিবিদো নৈব স্পৃশন্ত্যুত্তমাং
ব্যুৎপত্তিং কুলকন্যকামিব রসোন্মত্তা ন পশ্যন্ত্যমী।
কস্তূরীঘনসারসৌরভসুহৃদ্ব্যুৎপত্তিমাধুর্য্যয়ো-
র্যোগঃ কর্ণরসায়নং সুকৃতিনঃ কস্যাপি সংজায়তে॥"

মাধুর্য্যের দিকে হায় ধ্বনিবিদ্ যত লক্ষ্য নাহি রাখে কভু চণ্ডালীর মত!
ব্যুৎপত্তির প্রতি হায় রসোন্মত্ত জন কুল-বালিকার ন্যায় না রাখে দর্শন!
কস্তূরীর সনে হ'লে কর্পূরের যোগ, যেরূপ সুগন্ধ লোক করে উপভোগ;
মাধুর্য্য ব্যুৎপত্তি,—দুয়ে হইলে মিলিত সেরূপ কতই রস ছুটে অবিরত!
এ দুই দুর্লভ গুণ যাঁর কবিতায়, ধন্য ধন্য সেই মহাকবি এ ধরায়!

ব্যাখ্যা। সাধু ও সচ্চরিত্র পুরুষগণ পাপাশঙ্কায় চণ্ডাল-রমণীকে যেরূপ কিছুতেই স্পর্শ করেন না, ধ্বনিপ্রিয় কবিগণও সম্পূর্ণ-রূপে মাধুর্য্য ত্যাগ করিয়া কেবল ধ্বনি লইয়াই সেইরূপ উন্মত্ত থাকেন। প্রেমরসোৎফুল্ল পুরুষগণ কুল-বালিকার দিকে যেরূপ কিছুমাত্র লক্ষ্য রাখেন না, রসোন্মত্ত কবিগণও শব্দ শুদ্ধি ও শব্দ-সার্থকতার দিকে কিছুমাত্র লক্ষ্য না রাখিয়া কেবল রস-বিচার করিতেই সেরূপ ব্যগ্র থাকেন। কর্পূর ও মৃগনাভির সম্মিলন যেরূপ মনোহর, মাধুর্য্য শব্দ-শুদ্ধি ও শব্দ-সার্থকতা কবিগণের পক্ষে তদ্রূপ সুখকর। যে কবি স্বীয় কবিতায় মাধুর্য্য শব্দ-শুদ্ধি ও শব্দ-সার্থকতা রক্ষা করিতে পারেন, তিনিই ধন্য; এবং তাঁহার কবিতার শ্রোতৃগণও পরম ধন্য!- ধ্বনি ও রস কবিতার অঙ্গ, কিন্তু মাধুর্য্য শব্দ-শুদ্ধি ও শব্দ-সার্থকতা কবিতার প্রাণ; ইহাই রঘুনাথের অভিপ্রেত বিষয়।

পক্ষধরের বিশ্বাস ছিল যে, পরম নৈয়ায়িক বা বৈয়াকরণ হইলে মানুষ কখনই সুকবি হইতে পারেন না। পক্ষধরের এই দৃঢ় বিশ্বাস অপনোদন করিবার এবং নিজ কবিত্ব-শক্তির পরিচয় দিবার জন্যই রঘুনাথ তাঁহাকে এই কয়েকটী কবিতা রচনা করিয়া শুনাইয়া ছিলেন। উক্ত কয়েকটী শ্লোকেই রঘুনাথ এইরূপ ধ্বনি রাখিয়াছেন যে, যাঁহার প্রকৃত তীক্ষ্ণ বুদ্ধি থাকে, তিনি কি দুর্গম ন্যায়-শাস্ত্রে, কি জটিল ব্যাকরণ-শাস্ত্রে, বা কি পরম কোমল কাব্য-শাস্ত্রে, সকল শাস্ত্রেই, তিনি সমান অধিকারী হইতে পারেন। রঘুনাথের বুদ্ধি সুদুর্গম ন্যায়-শাস্ত্রেও যেরূপ, সুকোমল কাব্য-শাস্ত্রেও ঠিক সেইরূপ ছিল। তিনি মনে করিলেই যে মহাকাব্য রচনা করিয়া যাইতে পারিতেন, তদ্বিষয়ে অণুমাত্র সন্দেহ নাই।

রঘুনাথের কবিতা শ্রবণ করিয়া পক্ষধর অবাক্ হইয়া গেলেন। তিনি রঘুনাথকে

আন্তরিক ভাল বাসিতেন বটে, কিন্তু তর্কের সময় তাঁহাকে নির্য্যাতন করিতেও ক্ষান্ত হইতেন না। কয়েক বৎসর মাত্র মিথিলায় থাকিয়া রঘুনাথ ন্যায়-শাস্ত্রে অদ্বিতীয় হইয়া উঠিলেন। আর্য্যাবর্ত্ত ও দাক্ষিণাত্য-নিবাসী ছাত্রগণ তাঁহার প্রতি বিষম বিদ্বেষ প্রকাশ করিতে লাগিল। মিথিলার গর্ব্ব খর্ব্ব করিয়া নবদ্বীপে আসিয়া চতুষ্পাঠী খুলিব এবং তথায় ছাত্র রাখিয়া ও তাহাদিগকে ন্যায়-শাস্ত্রে পণ্ডিত করিয়া উপাধি-দান করিব, এই বাসনাই রঘুনাথের হৃদয়ে চিরদিন বলবতী ছিল। মিথিলা ভিন্ন অন্য কোনও স্থানে ন্যায়-শাস্ত্রের পুঁথি পাওয়া যাইত না। পক্ষধরও কাহাকেও কোন পুঁথি দেশে লইয়া যাইতে, এমন কি তাহার নকলও করিয়া লইতে দিতেন না। রঘুনাথ ন্যায়-শাস্ত্রের অধ্যয়ন শেষ করিয়া নবদ্বীপে প্রত্যাগমন করিবার জন্য পক্ষধরের অনুমতি চাহিলেন; পক্ষধরও তৎক্ষণাৎ অনুমতি প্রদান করিলেন। তখন রঘুনাথ কহিলেন,"গুরুদেব! আমি নবদ্বীপে গিয়া চতুষ্পাঠী খুলিব। অতএব আপনি আমাকে কিঞ্চিৎ ন্যায়-শাস্ত্রের পুঁথি দিন; অন্ততঃ তাহার নকল করিয়া লইতে অনুমতি দিন।" ইহা শুনিয়াই পক্ষধরের শিরে বজ্রাঘাত হইল। তিনি পুঁথি ছাড়িবার বা নকল করিয়া লইতে দিবার পাত্র ছিলেন না। তিনি রঘুনাথের প্রস্তাবে সম্পূর্ণরূপ অস্বীকার করিলেন। পক্ষধরের অসম্মতি দেখিয়া রঘুনাথ ক্রোধান্ধ হইয়া উঠিলেন, এবং মনে মনে সংকল্প করিলেন, অদ্য রাত্রিকালেই পক্ষধরের প্রাণ নষ্ট করিব। রাত্রিকাল উপস্থিত হইল। দেখিতে দেখিতে নিশীথের সমাগম। চতুষ্পাঠি-গৃহে ছাত্রগণ গভীর নিদ্রায় অভিভূত। পৃথিবী নিস্তব্ধ! আকাশে শারদীয় পূর্ণচন্দ্র বিরাজমান! পক্ষধর, পত্নীর সহিত শয়ন-মন্দিরে নানা প্রেমালাপে ব্যাপৃত! এদিকে রঘুনাথ মনের আবেগে গুরু-হত্যা করিবার জন্য শাণিত অস্ত্র হস্তে লইয়া পক্ষধরের শয়ন-গৃহের দ্বারদেশে দণ্ডায়মান। কথায় কথায় পক্ষধর-গৃহিণী কহিলেন "ঠাকুর! এ সংসারে কোন্ বস্তু আপনার পক্ষে পরম নির্ম্মল? আমি, বা আমার সন্তান, বা আকাশের পূর্ণচন্দ্র?" পক্ষধর কহিলেন "যদি মনে কিছুমাত্র অভিমান না কর, তবে আমি বলিতে পারি"। গৃহিণীর নির্ব্বন্ধাতিশয় দেখিয়া পক্ষধর কহিলেন "তুমি, বা তোমার সন্তান, বা আকাশের পূর্ণচন্দ্র, কিছুই আমার নিকট নির্ম্মল নহে। নবদ্বীপ হইতে রঘুনাথ-নামক যে একটী নবীন যুবা আসিয়া আমার নিকট হইতে সমগ্র ন্যায়-শাস্ত্র শিক্ষা করিয়া লইয়াছে, তাহার বুদ্ধির ন্যায় সুনির্ম্মল বস্তু আমি এ জগতে আর কিছুই দেখিতে পাই না।" রঘুনাথ শয়ন-গৃহের দ্বারদেশেই অস্ত্র-হস্তে দণ্ডায়মান! তিনি গুরুদেবের কথা শুনিয়াই ক্রন্দন করিতে লাগিলেন, এবং চিন্তা করিতে লাগিলেন, আমার যে বুদ্ধি তাঁহাকে বধ করিবার জন্য আমাকে প্রণোদিত করিয়াছে, আমার সেই বুদ্ধিই তাঁহারই চক্ষে জগতের সর্ব্বাপেক্ষা নির্ম্মল বস্তু। এইরূপ চিন্তা করিতে করিতে রঘুনাথের হৃদয় ক্রমশঃই অনুতাপানলে দগ্ধ হইতে লাগিল। কিয়ৎক্ষণ পরে পক্ষধর গৃহের দ্বারোন্মোচন করিয়া বাহিরে আসিয়া দেখিলেন, রঘুনাথ ভূমিতলে একখানি শাণিত অস্ত্র রাখিয়া অত্যন্ত ক্রন্দন করিতেছে। পক্ষধর ইহার কারণ জিজ্ঞাসা করিলে রঘুনাথ কহিলেন "আপনি আমাকে পুঁথি বা পুঁথির নকলও লইতে দেন নাই। এজন্য ক্রোধান্ধ হইয়া আপনাকে বধ করিবার জন্য উদ্যত হইয়াছিলাম। পরে আমার প্রতি

আপনার অকৃত্রিম অনুরাগের কথা শুনিয়া মর্ম্মাহত হইয়া ক্রন্দন করিতেছি। এখন আমার তুষানল বা অন্য কোনও প্রায়শ্চিত্তের বিধান করুন।" পক্ষধর ও তাঁহার গৃহিণী ইহা শুনিয়া অবাক্ হইয়া পড়িলেন, এবং তাঁহার অকপট আত্মগ্লানিই যে তাঁহার সমুচিত প্রায়শ্চিত্ত হইয়াছে, ইহা তাঁহাকে বুঝাইয়া দিলেন। রাত্রি প্রভাত হইলে রঘুনাথ কহিলেন "গুরুদেব! এখন নবদ্বীপ-গমন স্থগিত রাখিলাম। আমার ন্যায়-শাস্ত্র-অধ্যয়ন এখনও শেষ হয় নাই। আরও কিছু দিন আপনার গৃহে অবস্থান করিব।" পক্ষধর কহিলেন, "যতদিন ইচ্ছা, আমার বাটীতে থাকিয়া ন্যায়-শাস্ত্র অধ্যয়ন করিতে পার"।

রঘুনাথের প্রাণ পুঁথির দিকেই পড়িয়া রহিয়াছে। তিনি অনন্যমনাঃ ও অনন্যকর্ম্মা হইয়া দিবানিশি পক্ষধরের এক এক খানি করিয়া সমস্ত পুঁথিই কণ্ঠস্থ করিতে লাগিলেন। পুঁথিগুলি কণ্ঠস্থ করিয়া ও ২।১ বৎসর পরেই দিগ্বিজয়ী নৈয়ায়িক হইয়া রঘুনাথ খৃষ্টীয় ষোড়শ শতাব্দীর প্রারম্ভেই নবদ্বীপে প্রত্যাগমন করেন।

নবদ্বীপে প্রত্যাগমন করিয়াই রঘুনাথ সর্ব্বাগ্রে তাঁহার আশ্রয়দাতা বাল্যগুরু বাসুদেব সার্ব্বভৌমের সহিত সাক্ষাৎ করিতে গেলেন। তিনি পূর্ব্বেই রঘুনাথের মিথিলা-জয়ের কথা শুনিয়াছিলেন। বাসুদেব সরল-মনে রঘুনাথকে মিথিলা-গমনের অনুমতি দেন নাই। এক্ষণে তিনি রঘুনাথকে জিজ্ঞাসা করিলেন :—

(১৩)

"অয়ি দিবসমনৈষীঃ পদ্মিনীসদ্মনি ত্বং
রজনিষু নিরতোঽভূঃ কৈরবিণ্যাং রমণ্যাম্।
কথয় কথয় ভৃঙ্গ স্বচ্ছভাবেন তাবৎ
কিমধিকসুখমাপস্তত্র বা চাত্রবেতি ৷"

সারাদিন ছিলে তুমি পদ্মিনীর ঘরে, সারা রাত ছিলে কুমুদিনীর মন্দিরে।
অহে অলি! প্রাণ খুলি বল, শুনি আমি,— কোথায় অধিক সুখ পাইলে হে তুমি!

বাসুদেবের উক্ত কবিতাটী শুনিয়া রঘুনাথ নিম্ন-লিখিত শ্লোকে তাঁহার প্রশ্নের উত্তর দিয়াছিলেন—

(১৪)

"ত্বং পীযূষ দিবোঽপি ভূষণমসি দ্রাক্ষে পরীক্ষেত কো
মাধুর্য্যং তব বিশ্বতোঽপি বিদিতং সাধ্বী চ মাধ্বীকতা।
কিন্ত্বেকস্তপরস্তবকস্তদমপি ক্রমো ন চেৎ কুপ্যসি
যঃ কান্তাধরপল্লবে মধুরিমা নান্যত্র কুত্রাপি সঃ ॥"

হে অমৃত কিবা তব মিষ্ট আস্বাদন, যথার্থই তুমি সদা স্বর্গের ভূষণ!

তুমিও পরম মিষ্ট হে আঙ্গুর ফল! মিষ্টও তোমার মত্ত,—জানে ভূমণ্ডল!
তোমাদের কাছে আমি এক কথা বলি, কটু হইলেও কিন্তু নাহি দিও গালি,—
কান্তাধরে রহে সদা মাধুর্য্য যেমন, হায় রে কুত্রাপি নাহি পাইনু তেমন!

ব্যাখ্যা। বাসুদেব সার্ব্বভৌমের পাণ্ডিত্য অপেক্ষা পক্ষধর মিশ্রেরই পাণ্ডিত্য অধিক; ইহাই এই শ্লোকের ধ্বনি।

রঘুনাথের উক্ত শ্লোকটী শুনিয়া বাসুদেব অতি আক্ষেপ-সহকারে তাঁহাকে বলিয়াছিলেন:—

(১৫)

"যস্যা জন্মাহন্যবংশে বসতিরপি সদা দূরদেশে পুরাসীৎ
সৈষা ভূত্বা বধূটী প্রকটিতবিনয়া বেশ্মমধ্যে প্রবিশ্য।
আজন্মপ্রাণতুল্যান্ গুরুজনজননীসোদরান্ বন্ধুবর্গান্
দূরীকৃত্য স্বগেহাৎ পতিমভিরমতে ধিক্ গৃহস্থাশ্রমং তম্॥"

অন্য বংশে জন্মলাভ করিয়া যে জন বসতি করিত পূর্ব্বে দূরে সর্ব্বক্ষণ,
হায় রে সেজন আজ বিনয় প্রকাশি "বধূ" নাম ল'য়ে দেখ গৃহমধ্যে পশি,
আজন্ম যাহারা প্রিয় প্রাণের মতন কিবা সহোদর, মাতা, গুরু, বন্ধু জন,
দূর করি দিয়া সবে নিজ গৃহ হ'তে লইয়া পতিরে ঘর করে বিধিমতে।
গৃহস্থ-আশ্রমে দিই ধিক্ শত ধিক্, নারীর প্রভুত্ব যথা এতই অধিক!

ব্যাখ্যা। গুরু-নিন্দক শিষ্য এবং গুরু-নিন্দক শিষ্যের গুরু উভয়কেই ধিক্, ইহাই এই শ্লোকেব ধ্বনি।

নবদ্বীপে চতুষ্পাঠী খুলিবার জন্য রঘুনাথ কৃত-সংকল্প হইলেন। কিন্তু অর্থাভাবে তাঁহার সংকল্প পূর্ণ হওয়া দুঃসাধ্য হইয়া উঠিল। নবদ্বীপে "হরি ঘোষ" নামক একজন সম্পত্তিশালী গোয়ালা বাস করিতেন। তিনি গরু রাখিবার জন্য একখানি সুবিস্তৃত গো-শালা নির্ম্মাণ করাইয়াছিলেন। ইহাতে গ্রামের অনেক লোকেরই গরু থাকিত। এই গো-শালাই অদ্যাপি "হরি ঘোষের গোয়াল" বলিয়া প্রসিদ্ধ। এই হরি ঘোষই নিজ অর্থব্যয়ে রঘুনাথের জন্য এই গো-শালায় একটী চতুষ্পাঠী খুলিয়া দিলেন। রঘুনাথের বিদ্যোপার্জ্জন-বলে ও শিক্ষা দান-ফলে দেখিতে দেখিতে নবদ্বীপ একটী প্রকৃত সারস্বত মন্দির হইয়া উঠিল।

রঘুনাথ অনেকগুলি গ্রন্থ লিখিয়া গিয়াছেন,—"তত্ত্ব-চিন্তামণি-দীধিতি", "পদার্থ-খণ্ডন," "আত্মতত্ত্ব-বিবেক-টীকা," "প্রামাণ্য-বাদ," "নানার্থ-বাদ", "ক্ষণভঙ্গুর-বাদ," "আখ্যাত-বাদ," "ব্যুৎপত্তিবাদ" ও "লীলাবতী-টীকা," "খণ্ডন-খণ্ড-খাদ্য-টীকা," "গুণ-কিরণাবলী-প্রকাশ-দীধিতি," "ন্যায়-কুসুমাঞ্জলি-টীকা," "ন্যায়-লীলাবতী-প্রকাশ-দীধিতি," "ন্যায়-লীলাবতী-বিভূতি," "ব্রহ্ম-সূত্র-বৃত্তি," "মলিম্লুচ-বিবেক"। "মলিম্লুচ-বিবেক" স্মৃতি-শাস্ত্রীয় গ্রন্থ। শুনিয়াছি, এই গ্রন্থ-

খানি পূর্ব্বস্থলী-নিবাসী পরম পূজ্য-পাদ পণ্ডিতবর মহামহোপাধ্যায় শ্রীযুক্ত কৃষ্ণনাথ ন্যায়পঞ্চানন মহাশয়ের নিকটে আছে। মথুরানাথ ও রামভদ্রই রঘুনাথের সর্ব্বপ্রধান ছাত্র। কেহ কেহ কহেন, এই রামভদ্রই রঘুনাথের পুত্র। কেহ কেহ কহেন, রঘুনাথ আজীবন অনূঢ় পুরুষ ছিলেন। কেহ তাঁহাকে বিবাহের কথা জিজ্ঞাসা করিলেই তিনি কহিতেন "পুত্র কন্যার জন্যই বিবাহের প্রয়োজন। 'ব্যুৎপত্তি-বাদ' আমার পুত্র এবং 'লীলাবতী' আমার কন্যা।" রঘুনাথ আজীবন শাস্ত্র-চর্চ্চায় নিরত থাকিয়া খৃষ্টীয় ষোড়শ শতাব্দীর মধ্যভাগে দেহ পরিত্যাগ করেন।

শ্রীপূর্ণচন্দ্র দে কাব্যরত্ন উদ্ভটসাগর।

উদ্ভিদ্-বিদ্যার উপক্রমণিকা

উপক্রমণিকায় যাহা থাকা উচিত, এই প্রবন্ধে তাহার কিয়দংশ সন্নিবিষ্ট হইয়াছে। ইহার অতিরিক্ত কিছু জানিতে হইলে মূল গ্রন্থের প্রয়োজন। উদ্ভিদ্-বিদ্যা বিষয়ে মূল গ্রন্থ লিখিবার এখন প্রয়োজন হইয়াছে। কিন্তু এ বিষয়ে কাহারও বিশেষ বলবতী চেষ্টার পরিচয় পাওয়া যায় নাই। যাহাতে কোনও যোগ্যতর ব্যক্তি এ বিষয়ে হস্তক্ষেপ করেন। তাহাই আমাদের প্রার্থনা।

পাশ্চাত্য মত

কেহ বলেন, ঘাস ও বাঁশ যে এক জাতীয়; এই তত্ত্বটি সাহেবেরাই এ দেশে নূতন আমদানী করিয়াছেন। অর্থাৎ এই তত্ত্ব আমাদের দেশে কেহ জানিত না। সাহেবেরা আমাদিগকে অনেক নূতনতত্ত্ব শিখাইয়াছেন, অনেক নূতন পথ দেখাইয়াছেন সত্য, কিন্তু সর্ব্বত্রই যে তাঁহারা আমাদের পূর্ব্ববর্ত্তী ঋষিগণের গুরুস্থানীয় হইতে পারিয়াছেন, তাহা স্বীকার করিতে পারি না। অন্ততঃ আজ এই উদ্ভিদ্-বিদ্যা বিষয়ে আমরা একথা বলিতে পারি।

উদ্ভিদ্-বিদ্যা-শিক্ষা

বহুযুগ পূর্ব্বে যখন এতদ্দেশে উদ্ভিদ্-বিদ্যার শিক্ষা প্রচলিত ছিল, যখন ভিষক্-পদবাচ্য হইতে হইলে উদ্ভিদ্-বিদ্যায়ও পারদর্শী হইতে হইত, তখন তাঁহারা জানিতেন, গুবাক তাল খর্জ্জুর নল কুশ কাশ বংশ দূর্ব্বা প্রভৃতি এক তৃণ-শ্রেণীর অন্তর্গত। রাজনির্ঘণ্ট, বৈদ্যকনিঘণ্টু, অর্কপ্রকাশ প্রভৃতি গ্রন্থে ইহার বহুল প্রমাণ দৃষ্ট হইবে।

চরক-সংহিতা

চরক-সংহিতা একখানি প্রাচীন গ্রন্থ। চরক-সংহিতা পাঠ করিলে আভ্যন্তরিক প্রমাণ হইতে জানিতে পারি, ইহার তিনটী স্তর আছে। প্রথম স্তরে আত্রেয় পুনর্ব্বসুর শিষ্য অগ্নিবেশের কর্ত্তৃত্ব। দ্বিতীয় স্তরের কর্ত্তা ঋষি চরক। তৃতীয় স্তরে মহামতি দৃঢ়বলের প্রতিভা সংযুক্ত হয়। দৃঢ়বল পঞ্চনদ-জনপদবাসী। ইহা ব্যতীত তাঁহার অন্য কোন পরিচয় নাই। আমরা বর্ত্তমান সময়ে যে চরক-সংহিতা দেখিতে পাই, তাহাতে এই তিনটী

স্তরেরই উল্লেখ আছে। মহামহোপাধ্যায় চক্রপাণিদত্ত এই চরক-সংহিতার টীকা করিয়াছেন এবং ইহার সারসংগ্রহ করিয়া চক্রদত্ত-নামক প্রসিদ্ধ সংগ্রহ-গ্রন্থ প্রণয়ন করিয়া গিয়াছেন। চক্রপাণি পালবংশীয় নৃপতি নয়পালের রাজত্বকালে বর্ত্তমান ছিলেন। এই নয়পালের রাজত্বকাল খৃষ্টের একাদশ শতাব্দী। * ইহা হইতে আমরা বুঝিতে পারি, তৃতীয় স্তরের চরক-সংহিতা ৯০০ শত বৎসরের বহু পূর্ব্বে রচিত হইয়াছিল। এই গ্রন্থে উদ্ভিদ্-বিদ্যার প্রথম সন্ধান পাই।

চক্রপাণির সময়

অগ্নিবেশ বলিতেছেন, ওষধির নাম ও রূপ গোপাল, মেষপাল, ছাগপাল এবং অন্যান্য বনবাসিগণের সকলেই জানে; কিন্তু কেবল রূপের কথা ও নামের কথা জানিলেও ওষধিতত্ত্বের মীমাংসা করা যায় না। ওষধিতত্ত্ব জানিতে হইলে, তাহার নাম, রূপ, প্রকৃতি প্রভৃতি সমুদায় বিষয় জানিয়া, তবে তাহার গুণ ও ক্রিয়ানির্ণয়ে সমর্থ হইবে। † আমরা চরক-সংহিতা হইতে এই অভিমত জানিতে পারি যে, একজন ভিষক্‌তম হইতে হইলে, তাঁহাকে আয়ুর্ব্বেদের উপক্রমণিকাস্বরূপ ওষধি-বিদ্যা অর্থাৎ উদ্ভিদ্-বিদ্যা অধ্যয়ন করিতে হইবে।

চরক সংহিতা ও উদ্ভিদ্-বিদ্যা

"কি পুনর্যো বিজানীয়াৎ ওষধীঃ সর্ব্বথা ভিষক্‌॥" চরক-সূত্রস্থান ১।

ঐতিহাসিকদিগের নিকট পুরাণগুলি অপ্রাচীন বলিয়া হেয় হইতে পারে, কিন্তু পুরাণের সহিত আমাদের সম্বন্ধ বড় বেশী। পুরাণই আমাদের জাতীয় ইতিহাস। ইহা দ্বারা আমাদের ধর্ম্ম, জাতীয়তা ও নৈতিকবল রক্ষিত হওয়াতেই আমরা এত দুর্ব্বিষহ যন্ত্রণাভোগের পরও স্বাতন্ত্র্য রক্ষা করিতে পারিয়াছি। ইহার আদর নিত্য-তর্পণকারী আমরা করিব না, তবে করিবে কে? এই সকল পুরাণ মধ্যে অগ্নিপুরাণ অন্যতম। অগ্নিপুরাণ যতই অপ্রাচীন হউক, ৪০০ চারি শত বৎসর কালের মধ্যে ইহা কখনই রচিত হয় নাই। ‡ ইহাতেও বৃক্ষায়ুর্ব্বেদের উল্লেখ দেখিতে পাওয়া যায়। উদ্ভিদ্-বিদ্যা জানা না থাকিলে সেই অতি প্রাচীনকালে চিকিৎসা-বিদ্যা কিরূপে প্রচারিত হইয়াছিল?

পুরাণ

অগ্নিপুরাণে উদ্ভিদ্ চিকিৎসা

এই অগ্নিপুরাণে আয়ুর্ব্বেদ, ছন্দ, ব্যাকরণ, অভিধান প্রভৃতি বহুশাস্ত্রের সংক্ষিপ্ত সন্নিবেশ রহিয়াছে। তৎকালে যে বিরাট উদ্ভিদ্-শাস্ত্রের প্রচলন ছিল, বোধ হয় তাহা দেখিয়াই অগ্নিপুরাণকার সংক্ষেপেই ইহার উল্লেখ করিয়া গিয়াছেন।

---

* বিশ্বকোষ ১১শ ভাগ, ৩১৭ পৃষ্ঠা।

† "ওষধীর্নাম রূপাভ্যাং জানতে হ্যজপা বনে।
অবিপাশ্চৈব গোপাশ্চ যে চান্যে বনবাসিনঃ॥
ন নামজ্ঞানমাত্রেণ রূপমাত্রেণ বা পুনঃ।
ওষধীনাং পরাম্প্রাপ্তিং কশ্চিদ্বেদিতুমর্হতি॥
যোগবিন্নামরূপজ্ঞস্তাসাং তত্ত্ববিদুচ্যতে।"

‡ "বৃক্ষায়ুর্ব্বেদমাখ্যাস্যে প্লক্ষশ্চোত্তরতঃ শুভঃ।
সর্ব্বেষামবিশেষেণ বৃক্ষাণাং রোগমর্দ্দনম্॥"—অগ্নিপুরাণ, ২৮২ অধ্যায়।

চক্রপাণি সুশ্রুতের ভানুমতী-নাম্নী টীকার এক স্থানে বলিয়াছেন যে, উদ্ভিদের বনস্পতি প্রভৃতি পারিভাষিক সংজ্ঞা সকল আগমপ্রসিদ্ধ। * যদি তাঁহার সময়ে উদ্ভিদ্-বিদ্যা না থাকিত, তাহা হইলে তিনি এরূপ "আগম" বলিতেন না; এবং এই আগম শব্দে উদ্ভিদ্-বিদ্যা না বুঝাইলে, প্রাচীন সমুদায় গ্রন্থের সংজ্ঞাগুলি এক প্রকার হইত না।

অভিধান, পুরাণ ও বৈদ্যক-গ্রন্থসমূহে উদ্ভিদের নানা প্রকারের জাতিভেদ স্বীকৃত হইয়াছে।

উদ্ভিদের নামকরণে বৈজ্ঞানিকত্ব

যদি উদ্ভিদ্-বিদ্যা-বিষয়ে ঋষিগণের অভিজ্ঞতা না থাকিত, তাহা হইলে উদ্ভিদগণের শ্রেণীবিভাগ করিতে এবং নব-নামকরণে বিশেষ শ্রেণীর উল্লেখ করিতে দেখিতে পাইতাম না।

অমরসিংহ ও বনস্পতিবর্গ

অমরসিংহ উদ্ভিদের জন্য একটী স্বতন্ত্র অধ্যায় নির্ব্বাচন করিয়া গিয়াছেন। † এবং এই অধ্যায়ে উদ্ভিদের শ্রেণীভেদের উল্লেখ করিয়া গিয়াছেন। এই অধ্যায়টী তাঁহার স্বকপোলকল্পিত নহে। সাবধান হইয়া এই অধ্যায়টি পাঠ করিলে উদ্ভিদ্-বিদ্যা বিষয়ে বিবিধতত্ত্ব জানিতে পারা যায়। সে যাহা হউক, পূর্ব্বোল্লিখিত গ্রন্থসমূহে উদ্ভিদের যেরূপ শ্রেণীভেদ স্বীকৃত হইয়াছে, ক্রমে তাহার উল্লেখ করিতেছি।

উদ্ভিদের শ্রেণীভেদ বন্ধ্য ও অবন্ধ্য

জীবজগৎ স্থাবর ও জঙ্গমভেদে দুই প্রকার। ‡ ইহাদের মধ্যে উদ্ভিদ্গণ স্থাবর বলিয়া প্রসিদ্ধ। স্থাবর অর্থাৎ উদ্ভিদ্গণ চারিভাগে বিভক্ত—বনস্পতি, বানস্পত্য বা বৃক্ষ, বিরুধ্ ও ওষধি। ¶ অমরসিংহ ইহা অপেক্ষা সুন্দর শ্রেণীভেদ দেখাইয়াছেন। তিনি বলেন, "বন্ধ্য ও অবন্ধ্যভেদে § উদ্ভিদ্গণ দ্বিবিধ,—যাহাদের পুষ্প বা ফল কখনও হইতে দেখা যায় না, তাহারা বন্ধ্য ও যাহাদের পুষ্প ও ফল হইয়া থাকে, তাহারা অবন্ধ্য। আকৃতি ও প্রকৃতি অনুসারে উদ্ভিদের অন্যরূপ ভেদ দৃষ্ট হয়।

বৃক্ষ, ক্ষুপ, লতা ও ওষধি

বৃক্ষ, ক্ষুপ, লতা ও ওষধিভেদে উদ্ভিদ্গণ চারিপ্রকার। §§ বৃক্ষশ্রেণীস্থ উদ্ভিদ্গণের আকৃতি বিশাল এবং ইহা বহুশাখাপ্রশাখা পত্রপল্লবপরিশোভিতা। ক্ষুপ শ্রেণীস্থ উদ্ভিদ্গণের আকৃতি ক্ষুদ্র—কচিৎ ক্ষুদ্র বৃক্ষাকারে, কচিৎ গুচ্ছাকারে পরিদৃষ্ট হয়। ইহাদের মূল ক্ষুদ্র। লতাশ্রেণীস্থ উদ্ভিদ্গণ অধিক ঊর্দ্ধে উঠিতে পারে না বা উঠিতে কোন আশ্রয় প্রার্থনা করে না এবং কতকগুলি মাটিতেই বিস্তৃত হইতে থাকে। ওষধিগণ নাতিদীর্ঘায়ুঃ—ফলপাকান্তে মরিয়া যায়।

---

* "এতে বনস্পতি প্রভৃতয়ঃ সংজ্ঞা আগমপ্রসিদ্ধাঃ।" সুশ্রুত—ভানুমতী প্রথমাধ্যায়।

† বনৌষধিবর্গ—অমরকোষ।

‡ "লোকো হি দ্বিবিধঃ স্থাবরোজঙ্গমশ্চ।" সুশ্রুত—সূত্র° ১ম।

¶ "বনস্পতয়ো বৃক্ষা বীরুধ ওষধয় ইতি।" সুশ্রুত—সূ° ১।

§ * * * * * স্যাদবন্ধ্যঃ ফলে গ্রহিঃ।
বন্ধ্যোঽফলো ইব কেশী চ * * *। ৬।৭ বনৌষধি।

§§ বনৌষধিবর্গ—৫ম, ৮ম, ৬ষ্ঠ, ৯ম—অমরকোষ।

বৃক্ষশ্রেণী তিন শ্রেণীতে বিভক্ত—বনস্পতি, বানস্পত্য ও স্থাণু * যাহাদের পুষ্প ব্যতীত ফল হয়,তাহারা বনস্পতি যথা বট, অশ্বত্থ, যজ্ঞ-ডুমুর প্রভৃতি। যাহাদের ফুল হইতে ফল হয়, তাহারা বানস্পত্য যথা আম্র, নিম্ব, কদম্ব প্রভৃতি। যাহাদের মূল হইতে অগ্রদেশ পর্য্যন্ত কোন একটীমাত্র প্রকাণ্ড অর্থাৎ গুঁড়ি শাখা, প্রশাখা কিছুই নাই, তাহারা স্থাণুশ্রেণীর অন্তর্গত। যথা নারিকেল, তাল, গুবাক প্রভৃতি। কিন্তু ইহাদিগকে বৃক্ষশ্রেণীর অন্তর্গত করা তত যুক্তিসিদ্ধ নহে। বিশাল আকৃতি ভিন্ন ইহাদের বৃক্ষত্বে অধিকার কিছুই নাই। ইহা কেবল আমার মত বলিতেছি, তাহা নহে, প্রাচীন নির্ঘণ্ট-সমূহে ইহাদিগকে তৃণরাজ † রূপে অভিহিত করা হইয়াছে।

বৃক্ষশ্রেণীর উপ-শ্রেণী বনস্পতি, বানস্পত্য, স্থাণু

ক্ষুপশ্রেণীর উপশ্রেণী

ক্ষুপ শ্রেণীস্থ উদ্ভিদ্‌গণের মধ্যে কতকগুলি গুল্মাকৃতি, কতকগুলি ক্ষুদ্র বৃক্ষাকৃতি, কতকগুলি তৃণজাতীয়। যথা বেড়েলা, ঝিণ্টী, ঘেঁটু প্রভৃতি।

লতাশ্রেণীর উপশ্রেণী

লতাশ্রেণীস্থ উদ্ভিদ্‌গণ ত্রিবিধ। প্রথম বীরুধ্‌ জাতি—এই জাতীয় লতাসমূহ বহু শাখায় বিভক্ত হইয়া থাকে। দ্বিতীয় বল্লীজাতি—ইহাদের প্রধান লতাটী ভিন্ন অপর শাখা হইতে দেখা যায় না। তৃতীয় গুল্মিনীজাতি—ইহাদের মূলদেশ হইতে একাধিক লতা ইতস্ততঃ বিস্তৃত হইয়া থাকে।

ওষধিশ্রেণী উপশ্রেণী

ওষধি জাতীয় উদ্ভিদ্‌গণ দুই শ্রেণাতে বিভক্ত। প্রথম,—ধান্যশ্রেণী। ‡ ধান্যশব্দে শস্যবিশেষকে বুঝাইলেও আভিধানিকগণ কতকগুলি বিভিন্ন প্রকৃতির ওষধিকে এক জাতীয় বুঝাইবার জন্য ধান্য শব্দ ব্যবহার করিয়া গিয়াছেন। যে সমুদায় ওষধি এক বৎসরের অধিক বাঁচে না. তাহারা ধান্যশ্রেণীর অন্তর্গত। কিন্তু যাহারা ইহা অপেক্ষা দীর্ঘায়ুঃ, তাহারা দ্বিতীয় শ্রেণীভুক্ত—ইহাদের বিশেষ কোন নাম নাই। ইহারা কদলীজাতীয়। ধান্যশ্রেণী ফলের প্রকার-ভেদে দ্বিবিধ। প্রথম—শূকধান্য, এ জাতীয় শস্যের একটী উপবৃত্ত, একটী বীজ-বিশিষ্ট একটী মাত্র ফল হয়। সেই ফলের গায়ে একটী শূক (শোঁয়া) থাকে। তৃণ ¶ ধান্যশ্রেণী ইহার অন্তর্গত। দ্বিতীয়,—শিম্বীধান্য § (বা শমীধান্য) এই জাতীয় শস্যের একটী ফলের মধ্যে অনেকগুলি বীজ থাকে, যেমন কড়াই, মটর, খেঁসারী প্রভৃতি।

সঙ্করজাতি

উপরোক্ত শ্রেণী ব্যতীত কতকগুলি সঙ্কর-জাতীয় উদ্ভিদ্‌ দেখিতে পাওয়া যায়। এমন কতগুলি ক্ষুপ আছে, তাহারা ফল পাকিলেই মরিয়া যায়। কতকগুলি ওষধি লতা শ্রেণীর অন্তর্গত হইতে পারে।

---

* অমরকোষ—বনৌষধিবর্গ ৬ষ্ঠ—৩৮৫।

† অমরকোষ—বনৌষধিবর্গ। "তালঃ। গুবাকঃ, তালী, কেতকী, খর্জ্জুর, খর্জ্জুরী, নারিকেলঃ, হিন্তালঃ, এতে তৃণক্রমাঃ"—রাজনির্ঘণ্ট।

‡ বৈশ্যবর্গ—২১ শ্লোক।

"অন্নত্ত্ব ধান্যসম্ভূতং গিরিজে যদি জায়তে……ধান্যানি কথিতানি বৈ।" পদ্মপুরাণ উত্তরখণ্ড।

¶ বৈশ্যবর্গে অমরকোষ—২৪ শ্লোক।

§ বৈশ্যবর্গ—অমর ২৪।

শ্রেণীর তালিকা

উপরি-লিখিত বিষয়সমূহের একটী তালিকা প্রদত্ত হইল,—

১। বন্ধ্য বিভাগ,—(ক) লতাশ্রেণী, (খ) বৃক্ষশ্রেণী, (গ) ক্ষুপশ্রেণী।

২। অবন্ধ্য বিভাগ,—(ক) বৃক্ষ উপবিভাগ—বনস্পতি শ্রেণী, বানস্পত্য শ্রেণী, স্থাণুশ্রেণী।

(খ) লতা উপবিভাগ,—বীরুধ্ শ্রেণী, বল্লীশ্রেণী, গুল্মিনীশ্রেণী।

(গ) ক্ষুপ উপবিভাগ—গুল্ম শ্রেণী, তৃণ শ্রেণী।

(ঘ) ওষধি উপবিভাগ,—১ ধান্য শ্রেণী—[ক] শূকধান্য উপশ্রেণী।

[খ] শিম্বীধান্য উপশ্রেণী। ২ কদলী শ্রেণী।

উদ্ভিদের শ্রেণীভেদ

হেমচন্দ্র তদীয় কোষগ্রন্থে উৎপত্তিভেদে উদ্ভিদের ছয় প্রকার জাতিভেদ স্বীকার করিয়া গিয়াছেন। যথা—১ কুরণ্ট প্রভৃতি অগ্রবীজ। ২ উৎপল প্রভৃতি মূলজ। ৩ ইক্ষু প্রভৃতি পর্ব্বযোনি। ৪ শল্লকীমুখ প্রভৃতি কন্দজ। ৫ শালিধান্য প্রভৃতি বীজরুহ এবং তৃণগণ সম্মূর্চ্ছনজ। *

মূলের আকৃতি অনুসারে শ্রেণীভেদ

মূলের আকৃতি ও প্রকৃতি অনুসারেও উদ্ভিদের জাতিভেদ নির্ণীত হইতে পারে। কতকগুলি উদ্ভিদের মূল গভীর-প্রোথিত কাষ্ঠাংশ-বহুল। এই শ্রেণীস্থ মূলের বিশেষ কোন পারিভাষিক নাম নাই, কিন্তু শিফা ও কন্দজাতীয় মূল ইহা হইতে স্বতন্ত্র। যে সকল উদ্ভিদের মূল তন্তু সদৃশ কোন একটী প্রধান মূল অবলম্বন নহে এবং উদ্ভিদের বিস্তৃতির সহিত মূলেরও তন্তুসংখ্যা বৃদ্ধি প্রাপ্ত হয়, তাহা শিফা নামে অভিহিত। † কন্দ ‡ নামক তৃতীয় শ্রেণীস্থ মূলগুলি খুব বর্দ্ধিতায়তন হইয়া থাকে। ইহার বাহ্য ও অভ্যন্তর-ভাগ কোমল ও কাষ্ঠাংশবিহীন। উদ্ভিদ্‌গণের মধ্যে কতকগুলির মূল ইহার কোনও এক বিশেষ শ্রেণীর অন্তর্গত এবং কতকগুলি সঙ্করজাতীয়। পদ্মমূল সঙ্করজাতীয় এই জন্য ইহা শিফাকন্দ § নামে অভিহিত।

অবরোহ

এতদ্ব্যতীত শাখা বা স্কন্ধ দেশ হইতে যে মূল বাহির হইয়া থাকে, তাহার নাম অবরোহ। §§ কতকগুলি লতা জাতীয় উদ্ভিদে এবং বট প্রভৃতি মহীরুহে এইরূপ অবরোহের বাহুল্য হইয়া থাকে। তবে কেতকীর অবরোহ ইহা অপেক্ষা স্বতন্ত্র।

উদ্ভিদ্‌ বিদ্যার শব্দতত্ত্ব গবেষণার বিষয়। নিম্নে কতকগুলি উদাহরণ প্রদর্শিত হইতেছে। মূল—প্রতিষ্ঠার্থক মূল্‌ ধাতুর উত্তর কর্তৃবাচ্যে ক প্রত্যয়ে "মূল" শব্দ সিদ্ধ হয়। যদ্দ্বারা দ্রব্য

---

* "কুরণ্টাদ্যা অগ্রবীজাঃ মূলজাস্তূৎপলাদয়।
পর্ব্বযোনয় ইক্ষ্বাদ্যাঃ কন্দজাঃ শল্লকীমুখাঃ॥
শাল্যাদয়ঃ বীজরুহাঃ সংমূর্চ্ছজাঃ তৃণাদয়ঃ॥"—হেমচন্দ্র।

† শিফা জটে।—অমর-বনৌষধি।

‡ "শূরণঃ শস্তমূলং" ইতি মেদিনী। "গৃঞ্জনং" রাজনির্ঘণ্ট। "মেঘ" ইতি মেদিনী।

§ "করহাটঃ শিফাকন্দঃ" ইতি—অমর-বনৌষধি।

§§ "শাখা শিফাবরোহঃ স্যাৎ।" অমর—বনৌষধি।

প্রতিষ্ঠিত থাকে, তাহাই তাহার মূল। এখনও এই অর্থে মূল শব্দ অব্যাহতভাবে ব্যবহৃত হইতেছে। অমরসিংহ তদীয় কোষগ্রন্থে মূল শব্দের পর্য্যায়ে ব্রধ্ন ও অঙ্ঘ্রি-বাচক সমুদায় শব্দ উল্লেখ করিয়া গিয়াছেন। * প্রতিষ্ঠার্থক বন্ধ ধাতুর উত্তর কর্ত্তৃবাচ্যে নক্ প্রত্যয়ে ব্রধ্ন শব্দ সিদ্ধ হয়। অতএব ব্রধ্ন ও মূল শব্দের মৌলিক অর্থ একই এবং এই একার্থবোধক শব্দ দুইটী বৃক্ষমূল বুঝাইতেছে। কিন্তু প্রাচীন গ্রন্থসমূহে মূলার্থে ব্রধ্ন শব্দের প্রয়োগ বিরল। বরং বহুস্থলে অঙ্ঘ্রি বাচক শব্দের ব্যবহার দৃষ্ট হইয়া থাকে।

ব্রধ্ন ও মূল

পূর্ব্বে বলিয়াছি, মূল নানা প্রকার, তন্মধ্যে শিফা অন্যতম। শিফা শব্দের পর্য্যায় জটা। † বটের ঝুরী শিফাজাতীয় অবরোহ। শিফাজাতীয় মূল দেখিতে জটা বা তন্তু-সমষ্টির মত। এই জন্য উপমানবাচী শব্দ হইতে ইহার পর্য্যায় পরিগৃহীত ও ব্যবহৃত হইয়া আসিতেছে। বোধ হয় শিফাই ইহার মৌলিক শব্দ। জটা শব্দ বহুস্থলে অন্য অর্থে প্রযুক্ত হইয়াছে—কিন্তু শিফা শব্দ শিফা-জাতীয় মূল ব্যতীত অন্য অর্থে প্রযুক্ত হয় নাই। কেবল চক্রপাণি কেশর অর্থে শিফা ‡ ব্যবহার করিয়াছেন দেখিতে পাই। শিফাধর ও শিফারুহ শব্দের অর্থ যথাক্রমে শাখা ও বটবৃক্ষ, ¶ কিন্তু জটাধর শব্দের অর্থ অন্য প্রকার। এই শিফা শব্দও আধুনিক গ্রন্থে মূল শব্দের পর্য্যায়রূপে ব্যবহৃত হইয়াছে। § কখন কখন দেখা যায় যে, কাল-ক্রমে বট ও কেতকীর শিফা (জটা) গুলিও মূলের কার্য্য করিয়া থাকে। রাজনির্ঘণ্টে শিফারুহ শব্দের অর্থ বটবৃক্ষ লিখিত হইয়াছে।

শিফা ও জটা

অন্য প্রকার মূলের নাম কন্দ। ব্রততী ও ওষধিজাতীয় উদ্ভিদের মধ্যে যাহাদের মূল স্থূল ও কোমল তাহাদের সেই মূল কন্দ বলিয়া অভিহিত, যথা—মূল, শূরণ, গাজর, বারাহী-কন্দ প্রভৃতি। অমরকোষে মূলবাচী কন্দ শব্দের স্বতন্ত্র উল্লেখ নাই। কিন্তু পলাণ্ডুর পর্য্যায়ে সুকন্দক §§ ও রশুন পর্য্যায়ে মহাকন্দ শব্দের উল্লেখ দৃষ্ট হয়। আমরা কন্দ শব্দের এই প্রাচীন অর্থের ব্যভিচার মেদিনীকোষে দেখিতে পাই। তাহাতে সজিনা কটু-কন্দ নামে অভিহিত হইয়াছে।

কন্দ ও শিফাকন্দ

পত্র—পত্র শব্দের পর্য্যায়ে—নিম্নলিখিত শব্দগুলি ব্যবহৃত হইয়াছে।

অমর	১ পত্র	৩ ছদন	৫ দল
	২ পলাশ	৪ ছদঃ	৬ পর্ণ

---

* "মূলং ব্রধ্নোঽঙ্ঘ্রি নামকঃ"। ইতি অমর—বনৌষধি।

† "শিফা জটে"—অমর।

‡ "মাতুলুঙ্গশিফা—মাতুলুঙ্গ কেশর"—জ্বরাধিকারে চক্রদত্ত।

¶ "শিফাধরঃ শাখা"—শব্দচন্দ্রিকা।

"শিফারুহঃ বটবৃক্ষঃ"—রাজনির্ঘণ্ট।

§ "মূলং" ইতি—জটাধর।

§§ "মহাকন্দশ্চ রসোনকঃ" ইতি—অমর বনৌষধি।

"পলাণ্ডুস্তু সুকন্দকঃ" ইতি—অমর বনৌষধি।

শব্দ-রত্নাবলী	৭ পাত্র	৯ বর্হ	১১ পত্রক
	৮ ছাদন	১০ বর্হন	

১। পত্র শব্দের আভিধানিক অর্থ বৃক্ষপত্র ও লিখনাধার।

২। পলাশ—বৃক্ষপত্র, কিংশুক, বাতপোথ অর্থাৎ পলাশবৃক্ষ, যাজ্ঞিক, ত্রিপর্ণ, বক্রপুষ্প, পূতদ্রু, ব্রহ্মবৃক্ষ, ব্রহ্মোপনেতা, কাষ্ঠদ্রু, শঠী, রাক্ষস, হরিদ্বর্ণ, মগধদেশ, নির্দ্দয়।

৩।৪। ছদন, ছদঃ = বৃক্ষপত্র, তমালবৃক্ষ, পক্ষ, পিধান, তমালপত্র, তেজপাতা।

৫। দল—বৃক্ষপত্র, উৎসেধ, খণ্ড, সন্নীচ্ছদ, অপদ্রব্য, ঘন. তমালপত্র, অর্দ্ধ।

৬। পর্ণ—বৃক্ষপত্র, পক্ষ, তাম্বুল, পলাশবৃক্ষ।

৭। পাত্র—পক্ষপত্র, অন্তর, ভাজন, ভাণ্ড, কোষ, যোগ্য নাট্যানুকর্ত্তা, আঢ়ক-পরিমাণ।

৮। ছাদন—বৃক্ষপত্র, আচ্ছাদন, ছদন, অন্তর্দ্ধান, নীলাম্লানবৃক্ষ।

৯। বর্হ—ময়ূরপিচ্ছ, বৃক্ষপত্র, পরীবার।

১০। বর্হণ—বৃক্ষপত্র।

১১। পত্রক—পত্রাবলী, তেজপত্র, বৃক্ষপত্র।

পত্র শব্দের আভিধানিক অর্থ লইয়া কোষকারগণের বিবিধ মত উদ্ধৃত হইল। উল্লিখিত সমুদায় শব্দই পত্র শব্দের পর্য্যায়বাচী। কিন্তু ইহাদের সকলগুলিই পত্রের মৌলিক অর্থবাচী কিনা সন্দেহ।

উপরে বলা হইয়াছে দল শব্দ কেবল পত্রবাচী নহে। লীলাবতীর মতে ইহা অর্দ্ধবোধক।* কোন আভিধানিকের মতে ইহা খণ্ডবাচী।† এই দুই প্রকার অর্থ থাকায় দ্বিদল শব্দ ত্রিপর্ণ সপ্তপর্ণ প্রভৃতির মত যাহাদের একস্থানলগ্ন দুইটী পত্র আছে তাহাদিগকে না বুঝাইয়া—যাহাদের বীজ দুইটী ফলক দ্বারা অর্দ্ধার্দ্ধভাবে আবৃত থাকে, তাহাদিগকে বুঝাইতেছে। যথা—খেসারী, মটর প্রভৃতি। কিন্তু বক পলাশ প্রভৃতিতে ইহার ব্যভিচার পরিদৃষ্ট হয়। শতদলের দলশব্দ বীজকোষ বা পত্র কিছুই না বুঝাইয়া ফুলের পাপড়ী বুঝাইয়া থাকে। ইহা দ্বারা বুঝিতে পারা যায়, দলশব্দের মৌলিক অর্থ পত্র নহে।

এইরূপ ছদঃ শব্দের মৌলিক অর্থ আচ্ছাদন এবং সেই অর্থ হইতেই পত্রাকৃতি আবরকসমূহে ছদঃ শব্দ প্রযুক্ত হইয়া কালক্রমে ছদঃ শব্দ পত্রপর্য্যায়ে স্থান পাইয়াছে। কতকগুলি উদ্ভিদের আচ্ছাদনপত্রের ন্যায় বৃক্ষের শ্বাসক্রিয়া সম্পাদন করিয়া থাকে।‡ ইহাতেও ছদঃ শব্দ পত্রপর্য্যায়বাচী হইতে পারে।

পূর্ব্বে পাত্র অর্থাৎ ভাণ্ডের জন্য সর্ব্বদা পত্র ব্যবহৃত হইত। এবং "পত্রস্য ইদং" এই

* শব্দকল্পদ্রুমঃ।

† হেমচন্দ্রকোষ।

‡ বংশচ্ছদ ইহার উদাহরণ।

অর্থে ষ্ট্রণ প্রত্যয় হইয়া পাত্র শব্দ নিষ্পন্ন হইত। কালক্রমে সেই পাত্র শব্দ অপরার্থ-বোধক হইলেও কচিৎ তাহার মৌলিক অর্থে প্রযুক্ত হইতেছিল এবং তাহা দেখিয়া অনতি প্রাচীন কোষ-কার তাহাকে পত্রপর্য্যায়ে স্থান দিয়াছেন। * অথবা কোষার্থ পাত্র শব্দ হইতে পাত্র শব্দে পত্রের একটী বিশিষ্ট জাতিও বুঝিতে পারি। এইরূপ বলিবার কারণও আছে। ছদ ও পত্র ভিন্নার্থ-বাচী না হইলে "ছদপত্র" শব্দের প্রয়োগ দেখিতে পাইতাম না। ছদপত্র অর্থে ভূর্জ্জবৃক্ষ। † এইরূপ পলাশপর্ণী শব্দ অশ্বগন্ধাকে ‡ বুঝাইয়া থাকে। ইত্যাদি কারণে আমরা এই বুঝিতে পারি যে, পত্রের পর্য্যায়বাচী শব্দের কোনটী বিভিন্ন অবস্থার জ্ঞাপক এবং কোনটী উদ্ভিদের পত্রাকৃতি অংশবিশেষের জ্ঞাপক।

প্রকাণ্ড—বৃক্ষের গুঁড়ির নাম প্রকাণ্ড ও স্কন্ধ। কচিৎ কাণ্ড § শব্দ এতদর্থে ব্যবহৃত হইয়া থাকে এবং স্কন্ধ শব্দ শাখা ও প্রকাণ্ডের সংযোগ-স্থলকেও বুঝায়।

শাখা—বৃক্ষের ছোট শাখা ও লতা। ‖

স্কন্ধশাখা—বৃক্ষের বড় শাখার নাম স্কন্ধশাখা ও শালা। **

বল্কল—বৃক্ষত্বকের নাম বল্কল ও বল্ক। ††

সার—সার ও মজ্জা। ‡‡

কাষ্ঠাংশ—কাষ্ঠ ও দারু।

বৃন্ত—বোঁটা (বৃন্তের অপভ্রংশ শব্দ)। আভিধানিকেরা ইহাকে প্রসব-বন্ধন বলিয়া থাকেন। §§ অর্থাৎ অঙ্কুর, বীজ, ফল, পুষ্প ও পত্রের বন্ধন বৃন্ত নামে অভিহিত।

মঞ্জরি— } বল্লরি— } ইহা উদ্ভিদের কোন অংশ তাহা বুঝিতে পারিলাম না। নিম্নে আভিধানিকের মত উদ্ধৃত করিয়া দিতেছি।

"বল্লরি র্মঞ্জরিঃস্ত্রিয়ৌ"—অমর বনৌষধি।

"মঞ্জরি র্মঞ্জরী মল্লি মঞ্জিরং ত্রিষু বল্লরী।
বল্লরং ত্রিষু বল্লিশ্চ বল্লরিঃ পত্রনালিকা॥"—হড্ডচন্দ্র।

'অভিনবনির্গতা, আয়তা, সুকুমারা, সকুসুমা অকুসুমা বা মঞ্জরিঃ। যথা—চূতমঞ্জরিঃ

---

* শব্দরত্নাবলী।

† রত্নমালা।

‡ রাজনির্ঘণ্ট।

§ মেদিনী।

‖ অমরকোষ—'সমে শাখালতে'।

** অমরকোষ—'স্কন্ধশাখাশালে'।

†† অমরকোষ—'ত্বক্‌স্ত্রীবল্কঃবল্কলমস্ত্রিয়াং'।

‡‡ অমর—'সারোমজ্জাসমৌ'।

§§ অমর—'বৃন্তং প্রসববন্ধনং'।

কদলীমঞ্জরিঃ। বল্লরিঃ পুনশ্চির ভূতাপি যথা—তালবল্লরিঃ গুবাকবল্লরিঃ। দ্বয়মেব নবে চিরন্তনেঽপি।'—(অমরটীকা-ভরত)।

তবে বোধ হয় যদি কোনও একটী বৃন্তে অনেকগুলি উপবৃন্ত, পত্র বা পুষ্প অবস্থিত থাকে, তাহার নাম মঞ্জরি।

পল্লব—নবোদ্গত পত্রের নাম—পল্লব বা কিশলয়, কিন্তু কোন আভিধানিকের মতে নব পত্রাদি যুক্ত শাখাগ্রের নাম পল্লব।*

ক্ষারক—ফুলের কলির এক অবস্থার নাম ক্ষারক বা জালক। এই অবস্থার ছদক অর্থাৎ সবুজ বর্ণের আচ্ছাদন দ্বারা পুষ্প আবৃত থাকে।

কলিকা—কোরক বা কলিকা, ক্ষারকের ঈষৎ প্রস্ফুটিতাবস্থা।

কুট্মল—কলিকার প্রস্ফুটিতাবস্থা—কুট্মল বা মুকুল।

পুষ্পরজঃ } পুষ্পরেণু বা কেশর।
পরাগ }

পর্ব্ব—পাব্। তৃণজাতীয় উদ্ভিদের বৃদ্ধির সঙ্গে সঙ্গে যে স্থানে তাহার আবরকচ্ছদ সংলগ্ন থাকে, তাহার নাম পর্ব্ব। ইহা কাণ্ড, সন্ধি ও গ্রন্থি নামেও অভিহিত হয়। † দূর্ব্বা ও বাঁশের নামান্তর শতপর্ব্বা ‡ এবং ইক্ষু, নল প্রভৃতি পর্ব্বযোনি বলিয়া প্রসিদ্ধ। ‡‡

গুচ্ছ } অনেক পুষ্প এক বল্লরীতে (?) উৎপন্ন হইলে তাহার নাম গুচ্ছ বা স্তবক।
স্তবক } ধনে, শত-পুষ্পা প্রভৃতি এই জাতীয়।

বীজকোষ—কর্ণিকা অর্থাৎ বীজের আধার। পদ্মকর্ণিকা বীজ-কোষ নামে প্রসিদ্ধ।

নাড়ী—(নাড়ী, নাল বা কাণ্ড) শতপর্ব্বা জাতীয় উদ্ভিদের এক পর্ব্ব হইতে অপর পর্ব্ব পর্য্যন্ত স্থানের নাম নাড়ী, নাল বা কাণ্ড।

অঙ্কুর } নব-জাত উদ্ভিদ্। প্ররোহ,—ইহার পর্য্যায়বাচী শব্দ হইলেও ইহাদিগকে
প্ররোহ } দুই বিভিন্ন জাতিতে দেখিতে পাওয়া যায়। বীজোৎপন্ন অভিনব উদ্ভিদে অঙ্কুর ও পর্ব্বোৎপন্ন অভিনব উদ্ভিদে প্ররোহ শব্দ প্রয়োগ করা যাইতে পারে।

উদ্ভিদের নাম প্রায়ই অন্বর্থ দেখিতে পাওয়া যায়। যথা—গোক্ষুর, হস্তিকর্ণ, পলাশ, ত্রিবৃৎ, শৃঙ্গী, শৃঙ্গাটক, অর্জ্জুন, সপ্তপর্ণ প্রভৃতি।

উপসংহারে আমাদের বক্তব্য এই যে—বালকদিগের প্রথম শিক্ষার জন্য নূতন পদ্ধতি অনু-

---

* 'নবপত্রাদিযুক্তঃ শাখাগ্রপর্ব্বঃ' ইতি—ভরতঃ।

† মেদিনী।

‡ অমরকোষ—"বংশে ত্বক্‌সারকর্ম্মারত্বচিসারতৃণধ্বজাঃ।
শতপর্ব্বা যবফলো বেণুমস্করতেজনাঃ॥"

‡‡ হেমচন্দ্র।

সাবে যে সমুদায় গ্রন্থ বিরচিত হইয়াছে, তাহাতে উদ্ভিদ্-বিদ্যার উল্লেখ দেখিতে পাই, কিন্তু দুঃখের সহিত বলিতে হইতেছে যে, গ্রন্থকারগণের সকলেই প্রায় ইংরাজী-নবিশ। যে স্থলে তাঁহারা পারিভাষিক শব্দের প্রয়োগ করিয়াছেন, সেখানেই তাঁহাদের স্বেচ্ছাচার প্রকাশ পাইয়াছে। যতদূর সম্ভব তাঁহারা ইংরাজীর অনুবর্ত্তন করিয়াছেন! সুবিধা সত্ত্বেও প্রাচীন পারিভাষিক শব্দগুলি গ্রহণ করেন নাই। ইহা আমাদের দুর্দ্দশার নূতন চেষ্টামাত্র। নিম্নে দুই একটী উদাহরণ দিতেছি। আস্থানিক, বায়ব্য, দৈবার্ষিক প্রভৃতি নূতন সৃষ্ট-শব্দের স্থলে অনায়াসে শিফা, অবরোহ, ওষধি প্রভৃতি শব্দ ব্যবহার করা যাইতে পারিত। বস্তুতঃ যে স্থলে অনুরূপ বৈজ্ঞানিক শব্দের অভাব হয়, সে স্থলে এইরূপ শব্দ প্রশংসনীয় সন্দেহ নাই; কিন্তু একটা থাকিতে আর একটা নূতন গঠন, বোধ হয় যুক্তিসঙ্গত নহে। যে যাহা হউক, সামান্য চেষ্টায় এইরূপ ত্রুটি সংশোধিত হইতে পারে; কিন্তু উদ্ভিদ্-বিদ্যা-বিষয়ক গ্রন্থ লিখিতে যিনি এখন অগ্রসর হইবেন, তাঁহাকে অনুরোধ করি, তিনি যেন প্রাচীন পারিভাষিক শব্দগুলিকে রক্ষা করিতে চেষ্টা করেন।

শ্রীদুর্গানারায়ণ সেন।

মাণিক দত্তের মঙ্গলচণ্ডী।

মঙ্গলচণ্ডী ও বিষহরী প্রথমে হিন্দুসমাজে পূজা পাইতেন না। পূজা পাওয়ার জন্য ইঁহা-দিগকে বিস্তর চেষ্টা করিতে হয়। নির্দ্দোষ নখিন্দর ও বেহুলার প্রতি বিষহরী কি অকথ্যই অত্যাচারই না করিয়াছিলেন। বিনাদোষে অথবা সামান্যদোষে জয়ন্ত ও মালাধরকে পৃথিবীতে আনিবার জন্য মঙ্গলচণ্ডীকে বিস্তর চিন্তা করিতে হইয়াছিল। মঙ্গলচণ্ডী ও বিষহরী বুঝিয়া-ছিলেন যে, তৎকালে বাণিয়াগণের বড় মান। রাজপুত্র, সদাগরপুত্র ও কোটালের পুত্রের সখ্যের উপাখ্যান অদ্যাপি জরতীদের মুখে শুনিতে পাওয়া যায়। বণিকগণ রাজসভায় বসিয়া রাজগণের সঙ্গে পাশা খেলিতেন ও হাস্য পরিহাসে কালক্ষেপ করিতেন। এমন বণিকগণের হাতে "ফল ফুল পানি" না পাইলে মর্ত্ত্যে পূজা হয় না। তাই বিষহরী, চম্পানগরের চাঁদ সদাগরের ও মঙ্গলচণ্ডী উজানি-নগরের ধনপতি সদাগরের নিকট পূজা পাইবার চেষ্টা করেন। তৎকালে বণিকেরা শৈব ছিলেন। তাঁহারা এই নূতন দেবীদ্বয়ের পূজায় সম্মত হন নাই। যাহা হউক দেবীদ্বয় অন্তঃপুরে পূজাপ্রাপ্তির ব্যবস্থা করিয়া লন; কিন্তু বণিকেরা পূজা করিতে কোনরূপে সম্মত হন নাই। দেবীদ্বয় চাঁদ সদাগর ও ধনপতি সদাগরকে নানা বিপদে ফেলেন। অবশেষে কৃতকার্য্যও হইয়াছিলেন। বণিকেরা গন্ধবণিক-সম্প্রদায়ভুক্ত ছিলেন। ধনপতির নিবাস

অজয়নদ-তীরবর্ত্তী মঙ্গলকোটের নিকটস্থ উজানি নগরে ছিল। মঙ্গলচণ্ডীর উপাখ্যানের মূল কি তাহা বুঝিতে পারা যায় না। উপাখ্যানানুসারে প্রথমে কলিঙ্গ নগরে, তারপর গুজরাটে, তারপর উজানি নগরে মঙ্গলচণ্ডীর পূজা হয়। কোন্ ব্যক্তি প্রথমে মঙ্গলচণ্ডী পুস্তকের রচনা করেন, তাহা জানিতে পারি নাই। মাণিকদত্তের মঙ্গলচণ্ডী অতি প্রাচীন। গ্রন্থকার কোন্ সময়ের ও কোন্ দেশের লোক তাহা জানিতে পারি নাই। কয়েকটী কারণে মাণিকদত্তকে গৌড়ের নিকটবর্ত্তী কোন স্থানের লোক বলিয়া বোধ হয়।

প্রথম—মগরার জলে শ্রীমন্তের নৌকা ডুবাইবার সময় চণ্ডীর আদেশে বহুনদ-নদীর আগমন হয়, তন্মধ্যে মহানন্দা, কালিন্দী, পুনর্ভবা ও টাঙ্গন আসিয়াছিল। এই কয়েকটী নদী গৌড়ের নিকটবর্ত্তী। অন্য কোন কবি এই চারিটি নদীকে মগরায় আনেন নাই।

দ্বিতীয়—ধনপতি গৌড়ে আসিবার সময় মোড়গ্রামে স্নান করিয়া ছেতেভেতের বিল পার হন। যথা—

"রাজার আরতি সদাগর গঠিবারে সুবর্ণ পিঞ্জর
ছাড়ি বাণ্যা নিজ উজিয়ানি।
মোড়গ্রামে করি স্নান রন্ধন ভোজন পান
ছাত্যাভাত্যা এড়াইল তথি।
বড় গাঠা আগলা সকালে গঙ্গা পার হইলা
বুধমাত্রে বাণিয়া ধনপতি ॥
কাঞ্চন নগর আইল সদাগর
আইলে বাণ্যা সন্ন্যাসী পাটন ॥
জায় সাধু গঙ্গাজলে স্নান করিঞা জলে
রাজদ্বারে দিল দরশন ॥"

গৌড় হইতে বিদায় হইয়া—

"বন্দিয়া ভূপতি রায় পণ্ডিত সমাজে।
শুভক্ষণে ধনপতি চাপে গজরাজে ॥
গৌড়েশ্বরী প্রণমিঞা গঙ্গনপুর হইল পার।
গঙ্গাস্নান করিঞা করিল ফলাহার ॥"

গৌড়ের নিকটবর্ত্তী লোক না হইলে মোড়গ্রাম, ছেতেভেতের বিল ও গৌড়েশ্বরীর নাম জানার সম্ভাবনা ছিল না।

তৃতীয়—চৌত্রিশ অক্ষরে ভগবতীর স্তবের সময় ভগবতীকে দ্বারবাসিনী বলিয়া সম্বোধন করা হইয়াছে। অদ্যাপি চণ্ডীপুর গ্রামে রণচণ্ডী বা দ্বারবাসিনী দেবীর মন্দিরের বিশাল ভগ্নস্তূপ পড়িয়া আছে। দ্বারবাসিনী গৌড়ের নিকটবর্ত্তিনী।

মাণিক দত্ত মুকুন্দরাম অপেক্ষা প্রাচীন। মাণিকদত্তের রচনা অপেক্ষা মুকুন্দরামের রচনা ও ভাব উৎকৃষ্ট। বরদর্শনে কামিনীগণের পতিনিন্দা, বিশ্বকর্ম্মাকর্ত্তৃক ভগবতীর কাঁচলি-নির্ম্মাণ, বারমাস্তা ও চৌত্রিশা রচনায় মুকুন্দরামের অধিকতর দক্ষতা দেখা যায়। মাণিকদত্তের পদ্য, পদ্যের গন্ধযুক্ত গদ্য-রচনামাত্র। মুকুন্দরামের পৌরাণিক বর্ণনা, হিন্দুপুরাণের অনুযায়িনী; কিন্তু মাণিকদত্তের পুরাণ অতি অদ্ভুত। উহাতে বর্ণিত আছে; ধর্ম্ম হইতে ব্রহ্মা-বিষ্ণু-শিবাদির উদ্ভব হয়। শূন্যবাদেরও উল্লেখ আছে। স্পষ্টই বোধ হয়, মাণিক দত্তের পুস্তকের পৌরাণিক অংশ কোন বৌদ্ধশাস্ত্র হইতে গৃহীত। জগজ্জীবনের মনসার পাঁচালীর কোন কোন অংশ সম্বন্ধে ঐরূপ মত প্রকাশ করিতে পারা যায়। উহাতে লিখিত আছে, শিব ধর্ম্মকে পূজা করিতে যাইতেন। এই ধর্ম্ম হইতে ব্রহ্মা-বিষ্ণু-শিবের জন্ম হয়। আমরা মাণিক দত্তের গ্রন্থেরও পৌরাণিক ভাগের কিয়দংশের উদ্ধার করিলাম।

"অনাদ্যের উৎপত্তি জগৎ সংসারে।
হস্তপদ নাহি ধর্ম্মের ভ্রমে নৈরাকারে॥
আপনে ধর্ম্ম গোঁসাঞিঃ গোলোক ধেয়াইল।
গোলোক ধেয়াইতে ধর্ম্মের মুণ্ড স্বজিল॥
আপনে ধর্ম্ম গোসাঞিঃ শূন্য ধেয়াইল।
শূন্য ধিয়াইতে ধর্ম্মের শরীর হইল॥
আপনে ধর্ম্ম গোসাঞি যুহিত ধেয়াইল।
যুহিত ধিয়াইতে ধর্ম্মের দুই চক্ষু হইল॥
জন্ম হৈল ধর্ম্ম গোসাঞি গুণে অনুপামা।
পৃথিবী স্বজিয়া তেঁহো রাখিবে মহিমা॥
ইন্দ্র জিনিয়া তবে সিন্ধু উথলিল।
মুখের অমৃত ধর্ম্মের খসিঞা পড়িল॥
হস্তপদ পৃথিবীতে জল উপজিল।
জলে ত আসন গোঁসাই জলেত বৈসল॥
জলভর করিঞা ভাসেন নিরঞ্জন।
ভাসিতে ধর্ম্ম গোঁসাই পাইল বৈসন॥
চৌদ্দযুগ রহিয়া গেল ততক্ষণ।
*　*　*　*　*
ধর্ম্ম বৈসন হইতে উলূক জন্মিল।
জোড় হস্ত করি উলূক সম্মুখে দাঁড়াইল॥

হাসিঞা কহেন কথা ত্রিদশের রায়।
কহ কহ উলূক কত যুগ যায়॥
যত যুগ গেল তবে ব্রহ্মার উদ্ধারণে।
তখনে আছিলাঙ আমি মন্ত্র ধিয়ানে॥
মন্ত্র ধিয়ানে আমি ভাল পাইলাঙ বর।
চৌদ্দযুগের কথা শুন আমার গোচর॥
চৌদ্দ যুগের কথা তুমি শুন নৈরাকার।
ই তিন ভুবনে পাতকী নাহি আর॥
সম্মুখে রচিল গোসাই পদ্মফুল।
তাহাতে বসিঞা গোসাই জপে আদ্য মূল॥
নানা পত্র বাহ্যা* গেল এ তিন ভুবন।
পাতাল ভুবন লাগি করিল গমন॥
দ্বাদশ বৎসরে মৃত্তিকার লাগি পাইল।
হস্ত করি মৃত্তিকা শরীরে বুলাইল॥
বাটুল প্রমাণ মৃত্তিকা হস্তেত করিঞা।
শূন্যাকারে ধর্ম্ম গোসাই উঠিল ভাসিঞা॥
পুনরপি আসিঞা পদ্মেত কৈল ভর।
মনে মনে চিন্তে গোসাই ধর্ম্ম নৈরাকার॥
মনে মনে চিন্তে তবে ধর্ম্ম অধিপতি।
কার উপর স্থাপিব নির্ম্মল বসুমতী॥
আপনে ধর্ম্ম গোসাই গজমূর্ত্তি হইল।
গজের উপরি বসুমতীকে স্থাপিল॥
গজ সহিতে নারে পৃথিবীর ভার।
গজ সহিতে পৃথিবী যায় রসাতল॥
টানিঞা ছিড়িল গলার কনক পৈতা।
এক গোটা নাগ হৈল সহস্রেক মাথা॥
নাগের নাম বাসুকি থুইল নিরঞ্জন।
তাহাকে ধরিতে আজ্ঞা ই তিন ভুবন॥

---

* বাহ্যা—বাহিয়া।

যাও যাও বাসুকি হউক চিরাই।
আমি যাকে জন্ম দিব তাকে দিহ ঠাই ॥
গান করে দেবীর ব্রত সুখী সর্ব্বজয়া।
যে ঘাটে অবতার করিবে মহামায়া ॥
দেবীর চরণে মাণিক দত্তে গায়।
নায়কের তরে দুর্গা হবে বরদায় ॥"

দেবতার মহিমাসূচক যে সমস্ত গ্রন্থ গীত হইত, সে সমুদায়ের নাম 'মঙ্গল' গ্রন্থ। মনসামঙ্গল, দুর্গামঙ্গল, চণ্ডীমঙ্গল প্রভৃতিতে এক এক দেবতার মহিমা কীর্ত্তিত হইয়াছে। 'মঙ্গল' গ্রন্থগুলি লিখিবার পূর্ব্বে লেখকগণ স্বপ্নে দেবতার নিকট আদেশ প্রাপ্ত হইতেন। জাগরিত হইয়া তাঁহারা অদ্ভুত কবিত্বশক্তি সম্পন্ন হইতেন। মাণিক দত্ত কাণা ও খোড়া ছিলেন, চণ্ডীর আদেশে গান করিবার ও রচনা করিবার শক্তি প্রাপ্ত হন। প্রথমে কয়েকজন লোক লইয়া দল বাঁধেন। সে দেশের রাজা নূতন দেবতার পূজার বিরোধী হইয়াছিলেন, কিন্তু মাণিক দত্তের গান শুনিয়া তিনি কোন প্রতিবন্ধকতা করেন নাই।

কবি শ্রীপতি ও কালকেতুর সময়ের আচার ব্যবহারের বর্ণনা করিতে চেষ্টা করিয়াছেন বটে, কিন্তু স্বসময়ের আচার ব্যবহারের বর্ণনা করা হইয়াছে। আমরা জানিতে পারি, তৎকালে বাঙ্গালীর আচার ব্যবহার অতি সাদাসিদে ছিল। রাজার সহিত সাক্ষাৎ করিতে হইলে বড় লোকেরা কয় হাঁড়ি দই, কয় কান্দি কলা, কয় ভার নারিকেল এবং কয়েকটা খাসি লইয়া যাইতেন। গঙ্গাজল লাড়ু ও সঙ্গে যাইত। গঙ্গাজল লাড়ু, মেঘডম্বর শাড়ী ও পামরীভোট তৎকালে বড় দরের সামগ্রী ছিল। রাজারা সন্তুষ্ট হইলে চড়িবার ঘোড়া, গাএর খাসা জোড়া ও পাটের কাপড় দান করিতেন। চন্দনের ছড়া দিয়া সম্মান প্রদর্শন করা হইত। পাটের দোলা প্রধান যান ছিল। বড় লোকের আগে পাছে পাইকেরা বড় লোকের মহিমা গান করিতে করিতে যাইত। স্ত্রীলোকদের স্বামী বশ করার চেষ্টা ছিল। বাঙ্গালীর পঞ্চাশ ব্যঞ্জন, বেয়াল্লিশ বাজন ও অষ্ট অলঙ্কারের নাম জানি না। হাট বাজারে পাঁজি পুঁথি কাঁখে করিয়া মূর্খ ব্রাহ্মণেরা ভ্রমণ করিত এবং নির্ব্বোধ স্ত্রীলোক দেখিলে ঠকাইয়া পয়সা লইত। ভোজের সময় শত্রুতা করিয়া কখন কখন গৃহস্থের দুর্দ্দশার একশেষ করিত। সতীনের কোন্দল চিরকালই আছে, তখনও ছিল। দুর্ব্বলা দাসীর ন্যায় দাসী একালেও যে পাওয়া যায় না এমন নয়। কোন কার্য্যে আদেশ দানের সময় আদিষ্ট ব্যক্তিকে তাম্বূল দানের ব্যবহার ছিল। ওরূপ করিলে আদিষ্ট ব্যক্তির প্রতি সম্মান প্রদর্শন করা হইত। এক বাটায় পান খাওয়া বিশেষ প্রণয়ের চিহ্ন ছিল। বিষহরী দেবী অশেষ চেষ্টা করিয়াও সমাজের ভক্তি পান নাই; লোকে যেন অগত্যা তাঁহাকে দেবী বলিয়া পূজা করিত।

"ঘট স্থাপিয়া বৈসে গৌরী পার্ব্বতী
নাটগীতে বড় হৈল রঙ্গ।
দুয়ারে ব্রহ্মা পাতালে বাসুকি
নব গ্রহ বৈসে স্থানে স্থানে,
অনকূট নাগ লৈঞা আইল মনসাদেবী
সেহ বসে এক স্থানে।
পূজহি মঙ্গল-চণ্ডিকা একমন চিত্তে
হইঞা হরষিত মনে॥
দুর্গারে পূজিলে বিঘ্ন খণ্ডিবে
লক্ষ্মী হবে পরসন্ন।
বারি অবলম্বনে নানা নাট শুভক্ষণে
অষ্ট রাত্রি সপ্তদিন পূজন॥"

মঙ্গলা গীতগুলি, অষ্টরাত্রি সপ্তদিন গীত হইত, তজ্জন্য ইহা সচরাচর অষ্টমঙ্গলা নামে কথিত হইত। গ্রন্থের একস্থান হইতে কিছু উদ্ধৃত হইল—

"আমারে বোল ডানরে বুড়িরে বোল ডান।
কার খাইনু তাহার পুত কার করিনু হান॥
ডান নইরে ডান নই হইএ মুখদোষী।
দ্বারে বোসে খাইনু মুই চৌদ্দঘর পড়সি॥
ডাইন বোলিঞা মোরে বোলে বারবার।
দ্বারে বোসে খাইনু মুই বুঢ়া পোদ্দার॥
উত্তর দেশে গেনু খাইঞা আইনু কাঙ্গাল।
দুয়ারে বসিয়া খাইনু তিন লক্ষ বাঙ্গাল।
ডাইন বোলিঞা মোরে বোলে বারবার।
আজিকা হইনু ডান তোমা খাইবার॥"

গ্রন্থ মধ্যে এমন অনেক ধুয়া আছে, যাহার সহিত মূল প্রস্তাবের কোন সম্পর্ক নাই। কয়েকটী উদ্ধৃত হইল—

(ক) দেখরে দেখরে দুর্ব্বাদলশ্যাম। (খ) ও রাম কাহাই জীবন কাহাই।

(গ) গোরাচাঁদের চলন মাধুরীরে। (ঘ) যমুনার জল থাঞা সুখে রহে ধেনু,
কদম্বতলে বৈসে রাম কাহ্নু।

(ঙ) বড় রসিঞানাগর কাহ্নু বংশীবটের তলে বাঁশিটী বাজায় তাহা দেখিঞা শুনিঞা অস্থির হৈনু।

(চ) সখী সঙ্গে গিয়াছিনু যমুনার জলে। কালিয়া মেঘের ছটা কদম্বের তলে।

(ছ) চিকন কালা মোহনমালা মোহন মূরতি। (জ) প্রাণগোপাল আরে হয়।

(ঝ) ঐ যায় ঐ যায় কাহ্নু ঐ যায় ঐ যায়, হরিঞা রাধার মন ঐ যায় ঐ যায়।

(ঞ) যেই দিবস আমি দৃঢ় ব্যঞ্জন রান্ধি। মারঞ পীড়ায় বাড়ি কোণে বসে কান্দি ॥

এই কবিতাটী আমরা মাণিকদত্তের মঙ্গলচণ্ডীতে, জগজ্জীবনের মনসার পাঁচালীতে ও কবিকঙ্কণের চণ্ডীতে দেখিয়াছি, কোন্ কবির মুখ হইতে এইটী প্রথম নির্গত হইয়াছিল, আমরা তাহা বলিতে পারি না।

কয়েকটী বিশেষ কথা বলিয়া প্রবন্ধের উপসংহার করিব—

(ক) মাণিকদত্তের সময় পয়ারের নাম করণ হইয়াছিল,যথা-'রচিল মাণিকদত্ত দেবীর পয়ার।'

(খ) একাল অপেক্ষা সেকালে নাম ধাতুর ক্রিয়াপদ অধিক ব্যবহৃত হইত।

শ্রীরজনীকান্ত চক্রবর্ত্তী।

দেশী শব্দ।

খাঁটি সংস্কৃত শব্দ ব্যতীত অনেক দেশী শব্দ বহুল পরিমাণে সংস্কৃত সাহিত্যে স্থানলাভ করিয়াছে। সমাজের প্রসার-বৃদ্ধির সঙ্গে সঙ্গে নূতন নূতন ভাব-প্রকাশের জন্য নূতন নূতন শব্দের সৃষ্টি হওয়া স্বাভাবিক। অনার্য্য বিদ্বেষ থাকিলেও আর্য্যসমাজে অনার্য্যেরা প্রবেশলাভ করিয়াছিল; এবং তাহাদের ভাষার অনেক শব্দ আর্য্যেরা গ্রহণ করিতে বাধ্য হইয়াছিলেন। পাণিনির যুগে কোন দেশী শব্দ ব্যবহার্য্য বলিয়া আদৌ গৃহীত বা স্বীকৃত হয় নাই। অপভাষা, ম্লেচ্ছভাষা কিম্বা দেশীভাষা ব্যবহার করিলে প্রত্যবায়ভাগী হইতে হয়, প্রাচীন ব্রাহ্মণাদি শাস্ত্রে এরূপ কথার উল্লেখ দৃষ্ট হয়। মহাভাষ্যেও ঐ সকল ভাষা সম্পূর্ণ পরিত্যাগ করিবার বিধিই দেখিতে পাই বটে; কিন্তু তবুও দেশী শব্দ যে কিয়ৎপরিমাণে ব্যবহার করা চলে, তাহাও ঐ গ্রন্থেই আছে। এ সকল বিধি ব্যবস্থার প্রতি লক্ষ্য করিলেই প্রতীতি জন্মে, যে যদিও প্রাচীনকালে আর্য্য-সাহিত্যে, অপভাষা এবং দেশী ভাষা ব্যবহৃত হইত না, তবুও আর্য্যেরা ঐ সকল ভাষার শব্দ গ্রহণ করিয়াছিলেন এবং প্রচলিত কথাবার্ত্তায় ব্যবহার করিতেন।

যে সাহিত্য যত অর্ব্বাচীন, তাহাতে দেশী শব্দের ব্যবহার তত অধিক পরিমাণে লক্ষিত হয়। সূক্ষ্মভাবে বিচার করিলে এই শব্দ প্রয়োগ হইতে অনেক সাহিত্যের কালনিরূপণের পক্ষে সহায়তা লাভ করা যায়। যখন দেশী শব্দগুলি সংস্কৃতে ব্যবহৃত হইতেছিল, তখন সেগুলিকে পবিত্র করিবার জন্য অনেক চেষ্টা হইয়াছিল।

কোন সংস্কৃত ধাতু বা শব্দের সহিত যদি উচ্চারণের কোন প্রকার সমতা পাওয়া যাইত, তাহা হইলে তৎক্ষণাৎ সেই শব্দটিকে সংস্কৃত গোছের করিয়া সাজাইয়া লওয়া হইত। কন্দ ভাষায় 'জোরি' অর্থ নদী; ওড়িষার হিন্দুরা কন্দদের কঠ্‌জোরিটি, কাঠজুড়িয়া পার হইবার ইতিহাস রচনা করিয়া "কাঠ্‌জুড়ি" নামে অভিহিত করিয়াছেন। বাঙ্গালা দেশের অনেক গ্রাম পণ্ডিতবর্গের হাতে সংস্কৃত নাম পাইয়াছে; অনেক "কালু" গাঁ কালীগ্রাম হইয়া গিয়াছে। দেশী ভাষায় 'পইট্ঠণ' অর্থে নগর বুঝাইত; সম্ভবতঃ এটা আন্ধ্রদের ভাষা। আন্ধ্রদের দক্ষিণ দেশের 'পইট্ঠণ' যখন আর্য্যদিগের অধিকারে আসিল, তখন উহার নাম হইল প্রতিষ্ঠানপুরী। কখন বা এক একটা সহজ দেশী শব্দ কেবলমাত্র অতিরিক্ত বর্ণ যোগে সংস্কৃত আসনে বসিবার স্থানলাভ করিয়াছিল; এখন সেগুলির উৎপত্তি খুঁজিয়া পাওয়া যায় না। যে সকল দেশী শব্দের উচ্চারণ একটু সংস্কৃতপ্রায়, সেগুলি অনেকে ভুলক্রমেও সংস্কৃত শব্দ বলিয়া গ্রহণ করিয়াছেন। এ কালেও শ্রীযুক্ত গৌরগোবিন্দ রায় মহাশয়ের মত সুপণ্ডিত ব্যক্তি, বঙ্গদেশের দেশী "কাণ্ডারী" কথাটা সংস্কৃত মনে করিয়া সংস্কৃত রচনায় ব্যবহার করিয়াছেন।

খৃষ্টীয় দ্বাদশ শতাব্দীতে জৈনসূরি হেমচন্দ্র, রত্নাবলী বা 'দেশী নামমালা'সঙ্কলন করিয়াছিলেন। ইহাতে গুজরাত এবং তন্নিকটবর্ত্তী স্থানের প্রচলিত দেশী শব্দ সংগৃহীত হইয়াছে। হেমচন্দ্র লিখিয়াছেন যে, ভিন্ন ভিন্ন প্রদেশে এইরূপ দেশী শব্দ অনেক প্রচলিত আছে; কিন্তু তাহা সংগ্রহ করা সুসাধ্য নহে। তিনি গ্রন্থের মুখবন্ধে লিখিয়াছেন যে, যে সকল শব্দ সংস্কৃত হইতে উৎপন্ন হয় নাই, এবং সংস্কৃত ধাতুর সহিত যাহাদের কোন প্রকার সংস্রব নাই, সেইগুলিই তাঁহার নামমালায় সঙ্কলিত হইয়াছে।

যদিও হেমচন্দ্র গুজরাত প্রভৃতি দেশের দেশী শব্দের তালিকা দিয়াছেন, তথাপি তাঁহার সুবিস্তৃত গ্রন্থে এমন অনেক দেশী শব্দ স্থান পাইয়াছে,যেগুলি বঙ্গদেশেও প্রচলিত দেখিতে পাই। ইহাতে ঐ শব্দগুলির প্রাচীনতা এবং ভিন্ন ভিন্ন প্রদেশের সহিত প্রাচীন কালের সম্বন্ধ বিশেষরূপে সূচিত হয়। সংক্ষিপ্ত মন্তব্যসহ সেই শব্দগুলির একটী তালিকা প্রস্তুত করিয়া দিলাম। আশ্চর্য্য এই, যে ইহার অধিকাংশ শব্দ এখন আর গুজরাত অঞ্চলে ব্যবহৃত নাই; অথচ বঙ্গদেশে আছে।

প্রাচীন দেশী শব্দ।	সংস্কৃত অর্থ।	বাঙ্গালার প্রয়োগ।
অল্লট্ট-পলট্ট	পার্শ্ব পরিবর্ত্তন	**উলোট্‌ পালট্‌; উল্টা পাল্টা।**
উৎথল্লা	পরিবর্ত্তন ও পরিবর্ত্তনজনিত বেগ	**উতলা; উৎলান।**
উৎথল্ল-পৎথল্ল	"পার্শ্বদ্বয়েন পরিবর্ত্তনং"	**অথাল্‌-পাথাল।**

প্রাচীন দেশী শব্দ।	সংস্কৃত অর্থ।	বাঙ্গালায় প্রয়োগ।
উড়িদো	মাষধান্য	উড়িদ্ (এই নামের ধান কোথাও কোথাও পরিচিত)।
ওড্ঢন	উত্তরীয়	উড়নী (ওড়না পশ্চিম দেশে)।
ওইল্ল	আরোহণ ও অবরোহণ	ওলা (অবতরণ অর্থে)
ওসা	নিশাজল	ওস্ (এই কথাটি শিশির অর্থে উৎকলে এবং পূর্ব্ববঙ্গের কোন কোন স্থানে ব্যবহৃত)
কচ্ছর	পঙ্ক	হিন্দিতে কিচড়্ আছে; বঙ্গদেশেও কচ্ড়া জঞ্জাল অর্থে কোথাও কোথাও ব্যবহৃত আছে।
কুড়আ	তুম্বীপাত্র	ভিক্ষুকদিগের ব্যবহৃত "কড়ঙ্গ"।
কোট্ট	নগর	পশ্চিম প্রদেশে অনেক নগরের শেষ কোট্ কথা পাওয়া যায়, যথা—ধারাকোট, শিয়াল-কোট ইত্যাদি। নিজের অধিকৃত স্থান অর্থে "কোট্" বাঙ্গালায় আছে; যেমন 'আপনার কোটে পাই'।
কোইলা	কাষ্ঠাঙ্গার	কয়লা।
কোলাহল	খগরুত (প্রাচীন অর্থ)	কোলাহল (অর্ব্বাচীন সংস্কৃত শব্দমাত্র)।
কড়ংত	মুসল	"কাঁড়ানো", এই কথা হইতে ঐ শব্দের প্রাচীন বাঙ্গালা ব্যবহার সূচিত হয়।
খলী	তিলপিণ্ডিকা	খোল্ (তিলের হউক সরিষার হউক)।
খড়	তৃণ	খড়।
খাইয়া	পরিখা	খাই ("খাদ" দ্বারা নিষ্পন্ন করিয়া সংস্কৃত করিবার সুবিধা আছে)।
গঢ়ো	দুর্গ	গড়।
গংডীব	ধনুঃ	অর্জ্জুনের ধনুকের প্রায় ঐ নাম, সেই জন্যই এটা তুলিলাম।
গড়য়ড়ি	বজ্রনির্ঘোষ	গড় গড়, ঘড় ঘড় ইত্যাদি (এ শ্রেণীর অধিকাংশ শব্দই দেশী)
গেণ্ড ও গেণ্ট্ঠুঅ	স্তনয়োরুপরি বস্ত্র-গ্রন্থি	গাঁঠ=গেরো; গাঁঠরি (এটাকেও সহজে গ্রন্থির সহিত মিলাইবার সুবিধা আছে)।
গোচ্ছা	মঞ্জরীবাচক (এ কালের সংস্কৃতে গুচ্ছ পাওয়া যায়)	গোচ্ছা, গোছা।

প্রাচীন দেশী শব্দ।	সংস্কৃত অর্থ।	বাঙ্গালার প্রয়োগ।
ঘোড়ো	অশ্ব ; (এটাকে মাজিয়া ঘসিয়া ঘোটক করা হইয়াছে)	ঘোড়া।
ঘোলই	ঘূর্ণতে	ঘুলিয়ে যাওয়া ; ঘোলাজল ইত্যাদি।
চোট্টি	শিখা	উড়িয়া চুঁটি, বাংলা ঝুঁটি। "চৈতন চুট্‌কি" কথাটাও আছে।
চট্টু	দাকহস্ত	চাটু ; (উড়িয়াতে খুন্তির নাম চটু ; এ স্থানে অর্থটা বেশি কাছাকাছি)।
চাউল	তণ্ডুল	চাউল।
চিল্লা	শকুনিকাখ্য পক্ষিবিশেষ	চিল্।
ছল্লী	ত্বক্	ছলি বা ছুলী (চর্ম্মরোগবিশেষ)।
{ ছিনাল ছিনালী	জার জারভুক্তা }	ছিনাল (পুংলিঙ্গে এখন ব্যবহার নাই)।
ছিবই (অন্তাস্থ ব), ছিহ্বই }	স্পৃশতি	ছোঁআ (অন্তাস্থ ব হইতে "অ" উচ্চারণ সহজ)।
জড়িঅ	খচিত	জড়িত, জড়ান ইত্যাদি।
ঝড়ী	নিরন্তর বৃষ্টি	ঝড়।
{ ঝলসিঅ ঝলুংকিঅ ঝামিঅ ঝলঝলিয়া	দগ্ধার্থবাচক (ঝলসিত ও ঝলকিত অর্ব্বাচীন সংস্কৃতে আছে) উজ্জ্বল }	ঝলসান ও ঝলক প্রভৃতি (ঝামিঅ = হইতে হয় ত পোড়া ইট বা ঝামা)।
ঝাড়	লতা গহন	ঝাড়।
ঝরই	ক্ষরতি	ঝরা, ঝরণা প্রভৃতি এবং ঝর ঝর শব্দ। বাঙ্গালা অর্ব্বাচীন সংস্কৃতে আছে।
টিপ্পি টিক }	তিলক	{ টিপ্ টিকা
টুংটো	ছিন্নকর	ঠুঁটো
ডব্ব, ডাবো	বামকর	উড়িয়ার ডেব্‌রি অর্থ বামদিক ; ডেব্‌রিয়া অর্থ যে বাঁ হাতে কাজ করে। নেটা হাত। ঠিক এই শেষ অর্থে পূর্ব্ব বাঙ্গালায় ডেব্‌রা কথা ব্যবহৃত আছে।
ডলো	লোষ্ট্র	ঢিল, ডেলা।

প্রাচীন দেশী শব্দ।	সংস্কৃত অর্থ।	বাঙ্গালায় প্রয়োগ।
ডালী	শাখা	ডাল।
ডুম্ব	শ্বপচ	ডোম।
ডোলো	শিবিকা	ডুলি।
ঢংঢল্ল	ভ্রমণ ও পতন	ঢল্ ঢল্ (অন্য অর্থে) ?
তগ্গ	সূত্র	তাগা।
তড়ফড়িঅ	পরিতশ্চলিতং	ধড়ফড়।
তুলসী	সুরসলতা	তুলসী (দেবপূজার ইতিহাসে এই দেশী শব্দের প্রয়োজন আছে)।
থরহরিঅ	কম্পিত	থরহরি কম্প।
দোরা	কটি-সূত্র	ডোর।
ধন্ধা	ভ্রম, লজ্জা	ধাঁ ধাঁ।
ধনী	ভার্য্যা	স্ত্রীলোকের সম্বোধনে, কাব্যে এই ধনি কথাটা কেবল বঙ্গদেশেই আছে।
পপ্পিঅ	চাতকজাতীয় পক্ষিভেদ	পাপিয়া
পুফ্ফা	পিতৃষ্বসা	বাঙ্গালায় মুসলমানেরা এবং অন্যত্র হিন্দুরাও ফুপা, ফুফু শব্দ ব্যবহার করেন।
পেল্লই ফেল্লই	ক্ষিপতি	ফেলা।
পোট্ট	উদর	পেট (মহারাষ্ট্রি পোট্ ও পোড়)।
পলোট্টই	প্রত্যাগচ্ছতি	পালটান, পাল্টে।
ফগ্গু	বসন্তোৎসব। (এই উৎসব ফাগুন মাসে হইত না, মধু ও মাধব অর্থাৎ চৈত্র বৈশাখে হইত)	ফাগ (উৎসবে ব্যবহৃত রং বিশেষ)।
ফুক্কা	মিথ্যা	ফক্কা।
বড়বড়ই	বিলপতি	বড়বড়, বিড়বিড়।
বুক্কই	গর্জ্জতি	কুকুরের ডাক হিন্দিতে সর্ব্বদাই "ভুক্না" ব্যবহৃত হয়; বাঙ্গালায়ও 'বুক্নি' ব্যবহার আছে।
বুড্ডই	মজ্জতি	বোড়া, ডোবা।
বোক্কড়	ছাগ	বোকা পাঁটা (বক্‌রা ?)
ভল্লূ	ঋক্ষ	ভল্লূক (অর্ব্বাচীন সংস্কৃতেও এইরূপ)।

প্রাচীন দেশী শব্দ।	সংস্কৃত অর্থ।	বাঙ্গালায় প্রয়োগ।
ভেড়ো	ভীরুবাচক (নিন্দার্থে)	ভেড়া (প্রথম ভীরুর নাম হইতে মেষের ভেড়া নাম, এখন মেষের গুণ হইতে ভীরুকে ভেড়ো বলা হয়)।
মুহ 'থড়ি'	মুখজাত পবন	থুড়ি।
রোল	কলহ ও রব	রোল।
বট্টা	পন্থা (৭ম শতাব্দীর সাহিত্যে বাট পাওয়া যায়, যথা—শ্মশান-বাট)।	"বাট" পথ অর্থে প্রাচীন বাঙ্গালায় আছে, এখন উড়িয়ায় আছে।
বরড়ী, বল্লার	দংশ ভ্রমর	উড়িয়ায় বোলতাকে বিরুড়ি বলে, পূর্ব্ব-বাঙ্গালায় "বল্লা" বলে।
বিহাণ	প্রভাত	বিহান্।
হড্ড	অস্থি	হাড়।
হণ্	দূর	(হন্ হন্ করিয়া যাওয়া কথাটায় ঐ হন্ রহিয়া গিয়াছে মনে হয়)।
হল্লীসো	মণ্ডলেন স্ত্রীণাং নৃত্যম্	(হল্লীস শ্রেণীর নাটকেও এই নৃত্য বেশি; কথাটা প্রাচীন দেশী এবং কৃষ্ণলীলায় ব্যবহৃত বলিয়া, ইতিহাসের জন্য উদ্ধৃত রহিল)।
হেলা	বেগ	হেলান (বাঁকানো অর্থে) ?
হেরিম্বো	বিনায়ক (দেশী হেরিম্বো হেরম্ব হইয়া, বিনায়কের নাম হইয়াছে।)	হেরম্ব (গণেশ ঠাকুর) অর্ব্বাচন যুগের সংস্কৃতে ঐ অর্থে ব্যবহৃত। দেবতার ইতিহাসের জন্য প্রয়োজন আছে)

যে শব্দগুলি বাঙ্গালায় পাওয়া যায়, সেই গুলিই তুলিলাম। এমন অনেক শব্দ আছে, যাহা কেবল উড়িয়ায়, অথবা কেবল হিন্দিতে, অথবা কেবল মহারাষ্ট্রিতে ব্যবহৃত। এখন আদৌ প্রচলিত নাই, এরূপ শব্দও নামমালায় পাইয়াছি।

শ্রীবিজয়চন্দ্র মজুমদার।

ভারতে লিপির উৎপত্তি।

প্রাচ্য-ভাষাভিজ্ঞ প্রথিত-নামা বিদেশীয় পণ্ডিতেরা বলেন যে, লিখন-প্রণালী বিদেশ হইতে ভারতে প্রচলিত হয়। কিন্তু, কেমন করিয়া কোন্ সময়ে এ ব্যাপার সঙ্ঘটিত হয়, সে বিষয়ে তাঁহাদের তাদৃশ সন্তোষজনক কোনরূপ ইঙ্গিত জানিতে পারা যায় না। মহামতি সর্ উইলিয়ম্ জোন্স্ (১৮০৬ খৃঃ) সর্ব্বপ্রথম ভারতীয়-লেখন-প্রণালীর সেমিটিক্ উদ্ভবের আভাস দিয়া যান। কিছুকাল পরে সুপণ্ডিত কপ্ (১৮২১ খৃঃ) সাধারণ্যে দেখাইলেন যে, দেবনাগরী বর্ণমালা বিদেশীয় সেমিটিক বা সাইরোআরেবিয়ান্ হইতে উদ্ভূত।

পরে, ১৮৩৪ খৃঃ সুলেখক ডাক্তার আর্ লেপ্সিয়স্ এই মতের সমর্থন করেন। তা'র পর, ১৮৫৬ খৃঃ অধ্যাপক বেবের (Weber) এই পণ্ডিত-দ্বয়ের অভিমত সংরক্ষণের জন্য দৃঢ়তর যুক্তি দেখান। ফলতঃ, এই ব্যক্তিই সর্ব্বপ্রথম এই মত বা theoryর যাথার্থ্য-প্রমাণের জন্য প্রকৃত তর্কজাল বিস্তার করেন। ইনিই এই মতের প্রথম ও প্রধান সমর্থক। অধ্যাপক টমাস্ বেন্ফী[১], ম্যাক্সমূলর[২] ও হুইট্নী[৩] নামক অধ্যাপকত্রয়ও কপ্-মহাশয়ের মত সম্ভবপর বলিয়া বিবেচনা করিয়াছেন। পট্ (Pott), বেস্টারগার্ড (Westergaard), [৪] বুহ্লর (Bühler), সেস্ (Sayce), এবং লেনর্মাণ্ট্ (Lenormant) প্রভৃতি পণ্ডিতগণও তেমন কোনও যুক্তি দেখান আর না দেখান, ভারতীয় বর্ণমালার জন্মটা যে সেমিটিক্ তাহা সকলেই স্বীকার করিয়া লইয়াছেন। তবে, কেহ বা স্পষ্টতঃ, কেহ বা অস্পষ্টতঃ, এইটুকুই প্রভেদ। ডাক্তার ডেকে (Decke) আবার এক অদ্ভুত মত প্রকাশ করিয়াছেন। তাঁহার মতে ভারতীয় বর্ণমালা সেমিটিক হইতে উৎপন্ন হইলেও ইহার নিস্তার নাই। তিনি ইহাকে আর একমাত্রা উপরে তুলিয়াছেন। তিনি বলেন,—দক্ষিণ সেমিটিকের মধ্য দিয়া আসিরীয় কিইনিফর্ম্ হইতে ভারতীয় লিপির জন্ম। ডাক্তার বর্ণেল (Burnell) স্থির করিয়াছেন যে, ফিনিকীয়-উৎপন্ন পারস্য অথবা বাবিলোনিয়ার আরামীয় হইতে পালী অক্ষরের উৎপত্তি হইয়াছে। আমরা ভারতে লিপির উৎপত্তি-বিষয়ে এই এক প্রকারের মত উল্লেখ করিলাম[৫]।

---

(১) Orient und Occidunt, iii, 170

(২) Ancient Sanskrit Literature, 2nd ed p. 521.

(৩) Studies, p. 85

(৪) Uber den Altesten zeitreum der Indischen Geschichte, p. 37

(৫) Etymologische Forschungen, Wurzel—Wörterbuch.

প্রিন্সেপ্ (Prinsep) এক অভিনব মত প্রকাশ করেন। তাঁহার মতে, অশোক-বর্ণমালার যা কিছু বিশেষত্ব সে সমস্ত নাকি গ্রীকবিজয়ের চিহ্ন। এই মতের পোষকতার জন্য তিনি কয়েকজন পণ্ডিতও পাইয়াছেন। ওট্‌ফ্রীড্ মুলর (Otfried Müller), মুসো সেনার (Senart) এবং মুসো জোসেফ্ হালেভি (Joseph Halevy)—উক্ত মতাবলম্বীদিগের অগ্রণী। গ্রীক বা ফিনিকীয় আদর্শে যে অশোক-বর্ণমালা গঠিত হইয়াছিল, তাহা ডাক্তার উইল্‌সনও দেখাইতে ভোলেন নাই।

এই কয়েকটী মতাবলম্বী এবং স্বনাম-ধন্য ফ্লীট্ ও টেলার ভিন্ন প্রধানতঃ আর কাহাকেও ভারতীয় লিপিপ্রথা বিষয়ে বড় বেশী কিছু বলিতে শোনা যায় না। তবে ভারতীয় লিপিপ্রথার স্বদেশ-সম্ভবের সম্ভাবনা-বিষয়ে ছয় জন য়ুরোপীয় পণ্ডিতের উক্তি জানিতে পারা যায়। সেই ছয় জন কীর্ত্তিমান্ ব্যক্তির নাম—এড্‌ওয়ার্ড্ টমাস্, অধ্যাপক ক্রিশ্চিয়ান্ লাসেন্, অধ্যাপক জন্ ডাউসন্, অধ্যাপক জেসেনিয়স্, জেনেরেল্ কানিঙ্‌হাম্, এবং লণ্ডন্ ইউনিভার্সিটির অধ্যাপক গোল্ড্ ষ্টুকার।

টমাস্ মহাশয় (১৮৬৬ খৃঃ) বলিয়াছেন যে, ভারতীয় বর্ণমালার আদি দ্রাবিড়ীয় বর্ণমালা। ইনি সেমিটিক-সম্ভূতি-বিপক্ষে বহু যুক্তি দেখাইয়া তাঁহার নিজ সিদ্ধান্তে উপনীত হন। অধ্যাপক লাস্‌সেন্ ভারতীয় বর্ণমালার বৈদেশিক উৎপত্তি-বিপক্ষে সহস্র যুক্তি প্রদর্শন করিয়া সাহস সহকারে নির্ভয়ে বলিয়াছেন যে, ভারতীয় বর্ণমালার সৃষ্টি কখনই বিদেশে হইতে পারে না;—ভারতীয় বর্ণমালার জন্ম ভারতে। অধ্যাপক ডাউসন্ বলেন—ভারতের বর্ণমালায় এ প্রকারের বিশেষত্ব বিদ্যমান রহিয়াছে যে, তাহাতে ইহাকে কখনই বিদেশজাত বলা যায় না। ইহার ভারতে সৃষ্টির অনুকূল কারণ যথেষ্ট বর্ত্তমান।

অধ্যাপক জেসেনিয়স্ ও গোল্ড্‌ষ্টুকার এই অধ্যাপকদ্বয় তাঁহাদের সুতীক্ষ্ণ যুক্তিদ্বারা দেখাইয়াছেন যে ভারতের এমন অবস্থা কোন দিন হয় নাই, যে দিন তাহাকে বিদেশ হইতে বর্ণমালা গ্রহণ করিতে হইয়াছিল। কানিঙ্‌হাম্‌ও এই মতের অনুবর্ত্তী। এইরূপ ভারতীয় লিপি-বিষয়ে য়ুরোপীয়গণ নিজ নিজ যুক্তি ও মত দিয়া গিয়াছেন। কিন্তু, অতি ক্ষোভ ও পরিতাপের বিষয়, দাক্ষিণাত্যের দুই একটী পণ্ডিত ও বঙ্গের প্রত্নতত্ত্ববিদ্-রাজা রাজেন্দ্রলাল এবং বঙ্গের সাহিত্যরথী অক্ষয়কুমার ব্যতীত অধুনাতন কিঞ্চিৎকাল পূর্ব্ববর্ত্তী ভারতের কোন লব্ধ-প্রতিষ্ঠ সুধীব্যক্তি এই ঘোর বিবাদ-সঙ্কুল জটিল-ব্যাপারের স্থিরীকরণে আদৌ তাঁহার সচতুর মস্তিষ্ক পরিচালন করিয়াছেন বলিয়া বোধ হয় না, এ বিষয়ে তাঁহারা এক প্রকার নীরব। লাস্‌সেন্ ও কপ্, ডাউসন্ ও ম্যাক্স্‌মুলরের মতের সঙ্গে স্বদেশীয় পণ্ডিতদিগের মত প্রসঙ্গ না জানি আমাদের কি গৌরবেরই হইত!

আর্য্যজাতির আদি জ্ঞানেতিহাসে, সংস্কৃত ভাষা, যে কি অত্যুচ্চস্থান অধিকার করিয়াছে, মানবের মানস-চরিত্র ও মানসগতিতে সংস্কৃত ভাষা যে কি আশ্চর্য্য দৃষ্টান্ত পাইয়াছে—এবং আর্য্যদিগের অতীত গৌরব কাহিনীর যে কত শত সুন্দর নিদর্শন এই সংস্কৃত ভাষা

স্ববক্ষে ধারণ করিয়াছে, তাহা কোন্ ইতিহাস-পাঠকের অজ্ঞাত? আর্য্যগণ সুপ্রাচীন বৈদিককালের মন্ত্রযুগে নানাবিধ স্বর্ণ ও রৌপ্যের অলঙ্কার এবং বিবিধ বাদ্যযন্ত্র নির্ম্মাণ করিতেন। গজদন্তের বহুবিধ কারুকার্য্য ও প্রস্তরখচিত সুরম্যগৃহনির্ম্মাণে সবিশেষ নিপুণ ছিলেন—তাঁহারা সূচীকার্য্য ও ধাতু ব্যবহারে বিলক্ষণ পারদর্শী ছিলেন—সুক্ষ্ম-বস্ত্র ও মেষ লোমের বিবিধ বহুমূল্য বস্ত্র বয়ন করিতেন। এমন কি তখন যুক্তিবিষয়ে ক্রেতা ও বিক্রেতারা নিরূপিত নিয়মানুসারে চলিত। তাঁহাদের তৎকালে চিকিৎসাবিদ্যা, বিবিধ বৈজ্ঞানিকজ্ঞান এবং সভ্য সমাজের উচ্চ আদর্শও বিদ্যমান ছিল। কিন্তু, ঈদৃশ মহোচ্চসভ্যতারূঢ় সুতীক্ষ্ণজ্ঞানসম্পন্ন জাতি যে স্বকীয় পুরাবৃত্ত বিষয়ে কিঞ্চিন্মাত্রও মনোযোগ দেন নাই—বলিতে কি, অবহেলা-নিবন্ধন সামান্য কালনিরূপণ বিষয়েও যে জগতের অন্যান্য কয়েকজাতির নিকট আপনার অজ্ঞতা পরিচয় দিয়াছেন, তাহা নিতান্তই শোচনীয়। কিন্তু, যৎকালে জগতের তাবৎজাতি অজ্ঞানতমসাচ্ছন্ন হইয়া বন্য পশুর ন্যায় অসভ্যাবস্থায় কালযাপন করিতেছিল, যৎকালে বর্ণমালার সৃষ্টিবিষয়ে অন্যান্য জাতি কল্পনাও করেন নাই, তৎকালে আর্য্যজাতি সুগভীর চিন্তাসাগরে নিমগ্ন থাকিয়া রাশি রাশি গ্রন্থ প্রণয়ন করিয়াছিলেন এবং জ্ঞানগর্ভ দেবভাষার মধুর সৌরভে সুমেরু হইতে কুমেরু পর্য্যন্ত আমোদিত করিয়াছিলেন। কিন্তু, তথাপি আমাদিগকে দুঃখের সহিত স্বীকার করিতে হইবে যে, আমাদের পূর্ব্বপুরুষদিগের অবহেলানিবন্ধন আজ আমরা ভারতে লিপির কখন্ ও কোথায় উৎপত্তি হয়, তাহার যথাযথ উত্তরদানে অসমর্থ। তবে, আমরা যথাসাধ্য ভারতীয় লিপির প্রাচীনত্ব প্রতিপাদন করিতে চেষ্টা করিব।

য়ুরোপীয় পণ্ডিতেরা বলেন, বৌদ্ধসম্রাট্ অশোক বা প্রিয়দর্শীর ঘোষণাপত্রই ভারতে প্রাচীন-তম—অন্ততঃ প্রাচীনতম লিপি বলিয়া প্রখ্যাত। তাঁহারা বলেন, অশোকের পূর্ব্বে ভারতে কোন উৎকীর্ণ লিপি আবিষ্কৃত হয় নাই। কিন্তু, আমাদের ধারণা, এটী তাঁহাদের ভুল বিশ্বাস। কেন না, সেদিন পেপী কপিলবাস্তুর নিকট পিপ্রাও নামক স্থানে এক স্তূপ আবিষ্কার করিয়াছেন। তাহাতে বুদ্ধের (শাক্যমুনি) দেহাবশেষ ও একরূপ উৎকীর্ণ লিপি পাওয়া যায়। আবার, সাঞ্চী নামক স্থানে এক স্তূপমধ্যে দুইটী স্ফটিক-পাত্র পাওয়া যায়। সেই দুইটী পাত্রে বুদ্ধের প্রিয়তম শিষ্য সারিপুত্র ও মহামৌদ্গল্যায়নের অস্থি আবিষ্কৃত হইয়াছে। তাহার একটী পাত্রের আবরণের উপর "সারিপুতস" (সারিপুত্রস্য) এবং অন্যটীর উপর "মহামোগলানস" (মহামৌদ্গল্যায়নস্য) ক্ষোদিত থাকে। ইহাতেও একরূপ উৎকীর্ণ লিপি পাওয়া গিয়াছে। তথাপি পাশ্চাত্য পণ্ডিত মহাশয়েরা যে কেন অশোকলিপিকেই ভারতের আদিলিপি বলিয়াছেন, তাহা জানি না। আরও তাঁহারা বলেন, যে, অশোকলিপির পূর্ব্বে কোন লিপি উৎকীর্ণ হয় নাই বলিয়াই অশোকলিপিই ভারতের আদিলিপি। তাঁহাদের এ যুক্তি নিতান্তই অসার। কেন না, তাঁহারা কোন উৎকীর্ণ লিপি পান নাই বলিয়া যে পূর্ব্বতন ভারতবাসী লেখনপ্রণালী জানিতেন না, তাহার প্রমাণ কি?

উক্ত প্রত্নতত্ত্ববিদ্গণের মতে, অশোকের ঘোষণাপত্র সকল দুইটী বিভিন্ন বর্ণমালায় লিখিত।

তাঁহারা বলেন, ব্রাহ্মণেরা যে প্রকার লিপি ব্যবহার করিতেন, তাহা দেখিয়া তাঁহাদিগকে কখনই আদি লিপিপ্রবর্ত্তক বলিয়া অনুমিত হয় না। তাঁহারা এই সমস্ত লিপির গঠনপ্রণালী দেখিয়া স্থির করিয়াছেন যে, অশোকলিপির অর্দ্ধশতাব্দীপূর্ব্বে লিপিপ্রথা যৎসামান্যই উত্তরভারতে ব্যবহৃত হইয়াছিল। সুতরাং ২৫০ পূঃ খৃঃকে অশোকের শিলালিপি-কাল বলিয়া স্বীকার করিলে সম্ভবতঃ ৩০০ পূর্ব্ব-খৃষ্টাব্দে উত্তর ভারতে কিয়ৎপরিমাণে লিপিপ্রথা প্রচারিত ছিল, ইহা বলিতে হয়। কিন্তু আমরা বলি—অশোক যে নানাস্থানে শিলালিপি স্থাপন করিয়াছিলেন, তাহার এক বিশেষ কারণ ছিল। সেটী তাঁহার নিজ শাসন ভারতের অপর সাধারণকে জ্ঞাপন করিবার উদ্দেশ্য। কিন্তু, প্রাচীন আর্য্যযুগে শিক্ষাবিধি স্বতন্ত্র থাকায় শিলালিপি প্রভৃতি দ্বারা উপদেশাদি দানের কোন আবশ্যক হয় নাই। বৌদ্ধেরা যেমন রোগের অবস্থা-ব্যবস্থা সমস্তই প্রস্তর-স্তম্ভাদিতে লিখিয়া রাখিতেন—সেইরূপ তাঁহারাই আবার শিলালিপি ইত্যাদি স্থাপনের রীতি প্রবর্ত্তন করিয়া গিয়াছেন। সুতরাং যদি অশোকের পূর্ব্বে শিলালিপি ইত্যাদি নাই পাওয়া যায়, তাহাতে আমাদের লিখনপ্রণালীর অবিদ্যমানতা পক্ষে কোন ক্ষতি বৃদ্ধি নাই।

৩০০ পূঃ খৃঃ পূর্ব্বে লিখনপ্রণালী বিদ্যমান ছিল না, ইহা প্রতিপাদন করিবার জন্য কোন কোন পণ্ডিত বলেন যে, "Reliqua Arriani et Scriptorum de rebus Alexandri" (Frg. F. D. C. Muller, Paris, 1846. p. 46.) অর্থাৎ আর্য্যদিগের প্রাচীন সম্পত্তি ও আলেকসান্দারের "লিপি" নামক গ্রন্থপাঠে অবগত হওয়া যায় যে, ব্রাহ্মণ-স্মৃতি-ব্যবস্থা-সমূহ তৎকালে লিপি আকারে গ্রথিত ছিল না। নেয়ারখুস্ (Nearchus) রচিত এই পুস্তকখানির রচনা-কাল ৩২৫ পূঃ খৃঃ। কাজেই, য়ুরোপীয় মহাত্মাদিগের উক্ত সিদ্ধান্ত প্রকাশের যথেষ্টই সুবিধা হইয়াছিল। কিন্তু ঐ নেয়ারখুস্‌ই আবার গ্রন্থান্তরে (U. S. p 64. a) উল্লেখ করিয়াছেন যে, ভারতবাসীরা কার্পাস বস্ত্র বা কাগজে অক্ষর যোজনা করিত। সুতরাং য়ুরোপীয়দিগের দোহাই যে নিতান্ত অযৌক্তিক, তাহাতে আর সন্দেহ কি? তবে, নেয়ারখুসের কিয়ৎকাল পরে ৩০২ পূঃ খৃঃ মেগাস্থিনিস্ * উল্লেখ করেন যে ভারতবাসীদিগের কোন লিখিত পুস্তক ছিল না। তাহারা অক্ষর ও Grammata জানিত না, Sealও ব্যবহার করিত না। অধিকন্তু, তিনি এরূপও উল্লেখ করেন যে, হিন্দুগণ শাখাপথ (bye-road) ও তদন্তর্ব্বর্ত্তী স্থান-বিজ্ঞাপক ১০ ষ্টেডিয়ম্ (Stadium) দূরবর্ত্তী এক এক খানি দূরত্বনির্দ্দেশক প্রস্তর অর্থাৎ mile-stone রাখিতেন†। প্রতিবাদচ্ছলে যদি কেহ মেগাস্থিনিসের উক্তি উদ্ধার করেন, তদুত্তরে আমরা বলি যে, নেয়ারখুস্ ও মেগাস্থিনিস্ উভয়ের কেহই তাঁহাদের মন্তব্য প্রতিপাদক কোন যুক্তি দেখান নাই। অথচ, উভয়েই প্রায় সমকালবর্ত্তী। সুতরাং, আমরা নেয়ারখুসের উক্তির প্রতি অনাস্থা-প্রদর্শনের কোন কারণই দেখি না। আর মেগাস্থিনিস্

---

* Megesthenes Indica, Ed. Schwenbeck, frag xxvii (from Strabo xvi. 585)

† Meg. Ind. Frag xxxiv from the same source, p. 125-66.

বর্ণিত মাইলষ্টোন্‌গুলি যে প্রস্তরনির্ম্মিত ছিল, সে বিষয়ে কোন সন্দেহই হইতে পারে না। পরন্তু, সেই প্রস্তরসমূহে দূরত্বজ্ঞাপক কোন চিহ্নাদি ছিল কি না, তদ্বিষয়ে বিশেষ সন্দেহ বিদ্যমান। কেন না, পুরাতত্ত্ববিদ্ বর্ণেল্ সাক্ষ্য দিতেছেন যে অদ্যাপি তৎকালীন কোন মাইলষ্টোনই পাওয়া যায় নাই (S. I. P. p. 2)। তবে, অশোকের শিলালিপি দ্বারা এই মাত্র প্রমাণিত হইতে পারে, যে ২৫০ পূর্ব্ব খৃষ্টাব্দে ভারতে লিপিপ্রথা প্রচলিত ছিল এবং ইহা পূর্ব্ববর্ত্তী কোন লিপিপ্রথার ক্রমান্বয়। ইহা যে পূর্ব্ববর্ত্তী কোন লিপির ক্রমান্বয় তাহার বিশিষ্ট কারণ এই যে, সেই শিলালিপিতে সর্ব্বপ্রকার অনিয়ম দেখিতে পাওয়া যায়। স্পষ্ট বোধের জন্য দু'একটী উদাহরণও দেখান যাইতে পারে।

১। ৩য় শিলালিপিতে দেখা যায় "অনপিতম্"
　৪র্থ　„　„　"অনপরিসতি"
　৬ষ্ঠ　„　„　"আনাপিসতি"

২। যে যে স্থলে প্রত্যেক ব্যঞ্জনের পুনরুক্তি হওয়া উচিত, সেই সেই স্থলেই তাহার লোপ হইয়াছে, যথা—"পিয়স" "জনস" "আরভিসন্তে", "দুকরম্", "স্বগরম্" ইত্যাদি।

৩। আবার বর্ণ নির্ণয়ও এক প্রকারের নয়। ভারতের দক্ষিণ দেশীয় শিলালিপিতে দেখা যায়—"এতারিসম্" অপিচ "এতাদিসম্" ; পুনশ্চ দক্ষিণ শিলালিপিতে "অনথেসু" এবং কপুর্দ্দিগিরির উত্তর শিলালিপিতে "অণথেসু", অধিকন্তু, দক্ষিণ শিলালিপিতে "দসন' ও "দসণ" উভয় প্রয়োগই দেখিতে পাওয়া যায়।

৪। ব্যঞ্জনের পূর্ব্বে যদৃচ্ছাক্রমে অনুনাসিক প্রয়োগ দেখা যায়। প্রত্নতত্ত্বজ্ঞ বর্ণেলের অনুমান এই যে যখন মিস্ত্রীরা পর্ব্বতে অক্ষর ক্ষোদিত করিয়াছিল, তখন তাহাদের অনবধানতাতেই এরূপ পার্থক্য ঘটিয়াছে। অধ্যাপক বাসিলজিউ (Wassiljew) এই মতের পক্ষপাতী। তিনি আরও উল্লেখ করিয়াছেন যে, অনতিকাল বিলম্বে বৌদ্ধগণ তাহাদের ধর্ম্মশাস্ত্রগুলিকে "লিখিত" বলিয়া ইঙ্গিত করে (Der Budhisimus, p. 30 (28)। এক্ষণে দেখা যাউক, খৃষ্টপূর্ব্ব তৃতীয় শতাব্দীতে ভারতে ব্যবহৃত দুই প্রকার বর্ণমালা কোথা হইতে আসিল। বর্ণেল বলেন, ৩০০ পূর্ব্ব খৃষ্টাব্দের কয়েক শতাব্দী পূর্ব্বে পশ্চিমাঞ্চলে ও পারস্য দেশে তৎকালপ্রচলিত কতকগুলি বিভিন্ন প্রকারের লিপিপ্রণালী ভারতবাসীদিগের জানা ছিল। সলোমনের নিমিত্ত ফিনীসিয়গণ সম্ভবতঃ দক্ষিণ ভারতে আসিয়াছিল এবং তথায় "ময়ুর" লইয়া যায়। এ ঘটনা সত্য হইলে আমরা নিঃসন্দেহে ময়ুরার্থ হীব্রু "তুকি" (Tuki) শব্দকে তামিল "তোকাই" শব্দজাত বলিতে পারি (Dr Caldwell, Com. Gram, p. 66) পারসিকগণ দরায়ুসের অধিকারকালে ৫০০ পূঃ খৃষ্টাব্দে পঞ্জাব ও উত্তরভারত আক্রমণ করে এবং "পার্সিপলিস্" ও "নক্‌ষেরুস্তমের" শিলালিপিতে " ভারত" ২১শ ও ১৩শ বিভাগ বলিয়া ক্ষোদিত হইয়াছে।

ম্যাক্সমূলর উল্লেখ করেন যে, এইরূপে আলেক্‌জাণ্ডার্ কর্ত্তৃক ভারতাক্রমণের পূর্ব্বে অন্ত

জাতীয়দিগের নিকট হইতে লিপিপ্রণালী শিক্ষা করিবার পক্ষে অথবা স্বয়ং এই প্রণালী সৃষ্টি করিবার পক্ষে ভারতবাসীদিগের বিশেষ সুবিধা ঘটিয়াছিল। কেন না, ভারতবাসীদিগের এই পদ্ধতির উদ্ভাবন বা পোষণ-পক্ষে সামান্য মাত্রও চিহ্নাদি অদ্যাবধি দৃষ্ট হয় না। ইহারা যে অন্যকৃত লিপিপদ্ধতির অনুকরণ করিয়াছিলেন, তাহা অবশ্যই স্বীকার করিতে হইবে। এ দিকে অশোক-শিলালিপিতে যে দুই প্রকারের বর্ণমালার পরিচয় পাওয়া যায়, তন্মধ্যে উত্তর বর্ণমালার সহিত আরেমেক বর্ণমালার সাদৃশ্য পরিলক্ষিত হয় এবং দক্ষিণ প্রদেশস্থ বর্ণমালার কতকগুলিও যে সেই একই মূল হইতে উদ্ভূত হইয়াছে, ইহা স্পষ্টই অনুমান করা যায়। ইহাই ম্যাক্সমুলরের মত।

শুধু তাহা নহে,—অধিক দিনের কথা নয়,—বর্ণেল সাহেব সংবাদ দিয়াছেন যে দক্ষিণ ভারতে তৃতীয় এক প্রকারের বর্ণমালা দেখিতে পাওয়া যায়, তাহা প্রাচীন তামিল নামে বিখ্যাত, তাহাও সেই একই মূল হইতে উদ্ভূত হইয়াছে। এই বর্ণমালা যদিও অশোকের বর্ণমালার সহিত কতক সংস্রবযুক্ত, তথাপি অশোকের বর্ণমালা হইতে ইহা স্পষ্টতঃ উৎপন্ন নহে অথবা উক্ত বর্ণমালা এই তামিল-বর্ণমালা হইতে সমুৎপন্ন নয়। শেষোক্ত দুইটী বর্ণমালার সেমিটিক বর্ণমালা হইতে উদ্ভূত হওয়ার পক্ষে তাঁহাদের বিশিষ্ট প্রমাণ বোধ হয় এই—

উক্ত শিলালিপিতে শেষোক্ত দুইটী বর্ণমালাতেই স্বরবর্ণ-নিরূপণপক্ষে নিয়মের যথেষ্ট অসম্পূর্ণতা দেখিতে পাওয়া যায়। সেমিটিক বর্ণমালার ন্যায় এই দুই বর্ণমালার আদ্যবর্ণ আছে ; কিন্তু, শব্দের মধ্যে কোন ব্যঞ্জনবর্ণের পর ইহার উচ্চারণ হইয়া থাকে ; প্রাচীন তামিল বর্ণ-মালায় আদিবর্ণ "ই" ও "উ", ব্যঞ্জনবর্ণ "y" ও "v" হইতে সামান্যই পৃথক্। সমস্তই স্বীকার করিলাম। কিন্তু, কোন্ য়ুরোপীয় পণ্ডিত না বলিবেন যে, যে সমস্ত ভাষায় স্বরবর্ণ, ব্যঞ্জনের উপর নির্ভর করে, সেই সমস্ত ভাষার উপযোগিতার নিমিত্ত ফিনিসীয় বর্ণমালার উৎপত্তি ? সেমিটিক বা সাইরো-আরেবিকে সে নির্ভরতা আছে, তাই তাহা ফিনিসীয় হইতে উদ্ভূত বলিতে পারা যায়। কিন্তু সংস্কৃত বা দ্রাবিড়ীয় ভাষায় সে নির্ভরতা আছে কি ? তবে ইহাদিগকে কেন সেমিটিক বা ফিনিসীয় হইতে উৎপন্ন বলিতে যাইব ? ভারতীয় লিপিপ্রথা কখনই ফিনিসীয়-দিগের নিকট হইতে গৃহীত হইতে পারে না। কারণ, যদি খৃঃ পূঃ চতুর্থ বা তৃতীয় শতাব্দীতে ভারতে (অবশ্য য়ুরোপীয়দের মতে) লিপিপ্রথার আরম্ভ স্বীকার করা যায়, তাহা হইলে খৃঃ পূঃ নবম শতাব্দীর পর, যে ফিনিসীয়গণ ভারতবাসীদিগের সহিত বাণিজ্য-সম্বন্ধ-পরিহার করে, সেই ফিনিসীয়দিগের নিকট হইতে খৃঃ পূঃ চতুর্থ বা তৃতীয় শতাব্দীতে ভারতবাসীরা কখন লিপিপ্রথার অনুকরণ করিতে পারে না। যদি তাঁহারা অন্য কোন যুক্তি দ্বারা প্রমাণ করিতে চাহিতেন, তাহা হইলে তাঁহাদের মনস্কামনা কতক সিদ্ধ হইতে পারিত। এক্ষণে ফিনিসীয়দিগের বর্ণমালা হইতে ভারতীয় বর্ণমালার উৎপত্তি কল্পনা না করিলে ম্যাক্সমুলর মহাশয়ের বাক্যের যাথার্থ্য বোধগম্য হয় না। এদিকে আবার কপুর্দ্দিগিরিতে অশোকের যে উত্তর-শিলালিপি রক্ষিত আছে, য়ুরোপীয়গণ বলেন, তাহা অন্যান্য সেমিটিক বর্ণমালার ন্যায় দক্ষিণ হইতে আরম্ভ করিয়া

বামভাগে সমাপ্ত, (আমরা কিন্তু ইহাকে বাম হইতে আরম্ভ করিয়া দক্ষিণদিকে পাঠ করিয়াছি)। যাহা হউক, দক্ষিণ-শিলালিপির বর্ণমালা যদিও বিপরীত ভাবাপন্ন, তথাপি শিলালিপি পাঠে, তাঁহারা নাকি স্পষ্ট বুঝিয়াছেন, যে এক সময়ে এই বর্ণমালার আরম্ভ দক্ষিণদিকেই ছিল। ইহাই অধিকাংশ য়ুরোপীয় পণ্ডিতদিগের মত। তাঁহাদের মত এই যে, এই বর্ণমালার সহিত হিমীরাইটিক বর্ণমালার বিশেষ সাদৃশ্য আছে এবং ইহাও সেই বর্ণমালা হইতে উদ্ভূত। হিমীরাইটিক্‌দিগের নিকট ভারতীয়দের লিপিপ্রথা শিক্ষা বড় আশ্চর্য্যের বিষয়। কোন্ যুক্তিবলে ইহা স্থিরীকৃত হইতে পারে যে দক্ষিণ-পশ্চিম আরবের লোকেরা খৃষ্ট পূর্ব্ব চতুর্থ শতাব্দীতে ভারতকে বর্ণমালা-শিক্ষায় সহায়তা করিয়াছিল? বিদ্বন্মণ্ডলীর সকলেই বিদিত আছেন, সেদিন একজন ফরাসী পর্য্যটক যে বুট্রোফীডন্ হিমীরাইটিক্ (Boutrophedon Himyaritic) শিলালিপির আবিষ্কার করিয়াছেন, তাহার অক্ষর বামদিক হইতে দক্ষিণদিকে অবস্থিত (letter by von Maltzan in the Allg. Zeitung for March 1st 1871, pp. 10-11)। এ ক্ষেত্রে অশোক লিপি যাহা বিপরীত-ভাবাপন্ন, তাহা কিরূপে হিমীরাইটিক সম্ভূত হইতে পারে। প্রত্যুতঃ খৃঃ পূঃ চতুর্থ শতাব্দীতে হিমীরাইটিক সভ্যতা সম্পাদিত হইয়াছিল কি না তদ্বিষয়ে ঘোর সন্দেহ। মুসো হালেভি (Halévy) হিমীয়রাইটিক সভ্যতার কাল খৃষ্টপূর্ব্ব চতুর্থ শতাব্দী বলিয়া অনুমান করেন। অধিকন্তু, যে হিমীরাইটিক্‌দিগের স্বরবর্ণের আদৌ প্রয়োগ নাই—তাহারা কেমন করিয়া স্বরবিপুল সংস্কৃত পালি প্রভৃতি ভাষাপ্রয়োগকারী ভারতীয়গণকে লিপিমালা যোজনা করিতে শিখাইবে?

মহারাজ অশোকের লিপি পালিভাষায় লিখিত। ইহা সর্ব্বজন সম্মত। কিন্তু, আমরা পালী অক্ষরগুলি বিদেশী অক্ষরসম্ভূত, ইহা স্বীকার করিতে প্রস্তুত নই। আমাদের স্বপক্ষ সমর্থনের যথেষ্ট প্রমাণ আছে। আমাদের মতে, যদি পালী অক্ষর ফিনিসীয়, আরমীয় অথবা হিমরাইটিক ইত্যাদি কোন বর্ণমালা হইতে গঠিত হইত, তাহা হইলে য়ুরোপীয় পণ্ডিতজন-কল্পিত গান্ধারলিপির কোন মূল, পালীর আকার ও উচ্চারণগত কিছু না কিছু সাদৃশ্য দেখিতে পাওয়া যাইত। কিন্তু, দুঃখের বিষয় উক্ত ভাষার আকৃতি ও উচ্চারণের তুলনায় আমরা কিছুই সাদৃশ্য দেখিতে পাই না। পালির সহিত তুলনায় আমরা যাহা দেখিতে পাই, তাহা নিম্নে উল্লেখ করিলাম।

১। মিসরদেশের কোন একটী অক্ষর পালির সমোচ্চারণযুক্ত কোন একটী অক্ষরের সদৃশ নয়।

২। ফিনিসীয় বর্ণমালায় ২২টী অক্ষরের মধ্যে কেবল একটী মাত্র "গিমেল" অক্ষর পালির "গ"র সহিত কতকটা তুল্যাকারবিশিষ্ট।

৩। হিমরাইটিক অক্ষরগুলির সহিত পালির কেবল "দ" ও "ব" এই দুইটী অক্ষরের কথঞ্চিৎ ঐক্য আছে।

৪। আরমিয়ান অক্ষরগুলির মধ্যে একটী মাত্র অক্ষরও পালির সহিত মিলে না। তবে

যদি ইহার "শ"র স্থানাপন্ন অক্ষরকে উল্টা করিয়া দেখা যায়, তাহা হইলে ইহা পালির "শ"র সহিত কিঞ্চিৎ মিলিলেও মিলিতে পারে।

ইহা হইতে স্পষ্ট দেখা যাইতেছে যে ফিনিসীয় বর্ণমালার সহিত গান্ধার অক্ষরের যতটুকু সাদৃশ্য, পালির সহিত তাহাদের শতাংশের একাংশেরও সাদৃশ্য নাই। পালির সহিত ফিনিসীয় ইত্যাদি বর্ণমালা কণামাত্রও মিলে না। সকলেই জানেন, পালি ও গান্ধার লিপিতে পরস্পর ঐক্য নাই। সুতরাং ইহা হইতে প্রতিপন্ন হইতেছে যে দুইটী লিপি একটী লিপির শাখা নহে—অর্থাৎ গান্ধারলিপি সেমিটিক বর্ণাত্মক এবং পালিলিপি সেমিটিক হইতে পৃথক্।

ফিনিসীয় বর্ণমালা হইতে জাতভাষায় স্বরবর্ণ পৃথক্ হয় নাই। ইহাদের অক্ষর দ্বারাই স্বরের কার্য্য হয়। কিন্তু পালিতে ব্যঞ্জনের সহিত স্বরের চিহ্নমাত্রই অবস্থিত রহিয়াছে। গ্রীক, ইংরেজি, হিমরাইটিক, মিডিয়ান, ইথিয়পিক, আরবী, কুকী পহলুই, ইত্যাদি যে সমস্তলিপি ফিনিসীয় হইতে উৎপন্ন হইয়াছে তাহাদের ক্রম (অ-ব-গ দ-হ ইত্যাদি) ফিনিসীয় বর্ণমালার সহিত মিলে। কিন্তু, পালির বর্ণমালার ক্রম ঐরূপ নয়।

এই সকল কারণ হইতে প্রতীতি হইতেছে যে পালিলিপি ফিনিসীয় অথবা তজ্জাত কোন লিপি হইতে গঠিত হয় নাই। ইহা ভারতে আর্য্যগণ কর্ত্তৃক নির্ম্মিত স্বতন্ত্র একটী লিপি। ইহা হইতেই ভারতের বাহিরে সিংহল, যবদ্বীপ প্রভৃতির এবং তিব্বত হইতে মঙ্গোলিয়া পর্য্যন্ত মধ্য এসিয়ার লিপি-নিচয় গঠিত হইয়াছে। তবে ডাক্তার ঔফ্রেক্ট, মূলর, ডাক্তার ষ্টিভন্সন্, ডাক্তার গোল্ড্স্মিথ, লেনর্ম´ণ্ট্, বর্ণেল প্রভৃতি পালির উৎপত্তি সম্বন্ধে যে ভিন্ন ভিন্ন মত দিয়াছেন—তৎসমুদয় যে অযৌক্তিক, তাহা আমরা পূর্ব্বেই দেখাইয়াছি। পালি অক্ষরের সহিত যে আরমিয়ান অক্ষরের আদৌ মিল নাই, তাহা আইজাক্ টেলারও দেখাইয়াছেন।

ডাক্তার বুহ্লরের মতে প্রাচীন ভারতে দুই প্রকারের অক্ষর ব্যবহৃত হইত। তাহাদের নাম "খরোষ্ঠী" ও "ব্রাহ্মী"। খরোষ্ঠী খৃঃ পূঃ চতুর্থ শতাব্দী হইতে খৃষ্টীয় দ্বিতীয় শতাব্দী পর্য্যন্ত ব্যবহৃত হইত। ইহার ব্যবহার পূর্ব্বে আফগানিস্থান এবং উত্তর পঞ্জাবের মধ্যে সীমাবদ্ধ ছিল (৬৯° হইতে ৭৩° ৩০´ পূর্ব্বে এবং ৩৩ঃ হইতে ৩৫° উত্তরে) ইহা বাম হইতে আরম্ভ করিয়া দক্ষিণে সমাপ্ত হইত। কিন্তু অপর বর্ণমালা "ব্রাহ্মী"ই এতদুভয়ের মধ্যে প্রাচীনতর। ইহাই জাতীয় বর্ণমালা। ইহা হইতে অন্যান্য বর্ণমালার উৎপত্তি হইয়াছে। প্রথমতঃ ইহা দক্ষিণ হইতে আরম্ভ করিয়া বামে লিখিত হইত। ডাক্তার বুহ্লর বলেন যে ইহা ফিনিসীয় বর্ণমালার প্রাচীনতম কোন লিপি হইতে উৎপন্ন। তিনি এরূপ বলেন যে বর্ণমালা ভারতীয় বণিক্ সম্প্রদায় কর্ত্তৃক মেসোপোটেমিয়া হইতে ৮০০ পূর্ব্ব খৃষ্টাব্দে ভারতে আনীত হয়। ৫০০ খৃঃ পূঃ হইতে ২০০ খৃষ্টাব্দ পর্য্যন্ত শিলালিপিগুলি প্রাকৃতে অবস্থিত ছিল। সংস্কৃত শিলালিপির আরম্ভ ২০০ খৃষ্টাব্দ। সংস্কৃত ভাষায় যে সমস্ত প্রাচীনতম নাগরী শিলালিপি আছে, সেগুলির সময় ৭৫৪ খৃষ্টাব্দ। আর, এই বর্ণমালায় যে সমস্ত প্রাচীনতম পাণ্ডুলিপি পাওয়া যায়, তাহাদের মধ্যে কোনটীই খৃষ্টীয় একাদশ শতাব্দীর পূর্ব্ববর্ত্তী নয়। দ্বাদশ শতাব্দীতে নাগরীর প্রভাব পূর্ব্ব-

দিকে বহুল বিস্তৃত হইয়াছিল এবং কালক্রমে ইহা হইতে বাঙ্গালা বর্ণমালায় উৎপত্তি হইয়াছিল। কতকগুলি খরোষ্ঠী সংখ্যা দেখিয়া বোধ হয় যে, তাহারা আরামেক সমুৎপন্ন। বহু প্রাচীনকাল হইতে ৬০০ খৃষ্টাব্দ পর্য্যন্ত সংখ্যাগুলি অক্ষরের সাহায্যেই ব্যবহৃত হইত। এইগুলি প্রাচীন মিসর হইতে গৃহীত হইয়াছিল। এইরূপ ভাবে বুহ্লর নিজ মত লিপিবদ্ধ করিয়াছেন। তিনি এইরূপে বর্ণের উৎপত্তি দেখাইয়াছেন বটে, কিন্তু আমরা তাঁহার মতের পক্ষপাতী নহি। ডাক্তার বুহ্লরের ন্যায় ডাক্তার টেলর ইত্যাদি পণ্ডিতগণ ভারতীয় লিপির উৎপত্তি সম্বন্ধে তাঁহাদের নিজ নিজ মন্তব্য প্রকাশ করিয়াছেন। তৎসমুদয়ের আলোচনা করিতে গেলে একখানি বৃহৎ পুস্তক হইয়া পড়ে। কাজেই আমার এই ক্ষুদ্রকায় প্রবন্ধে বাহুল্য ভয়ে সেগুলির আলোচনায় বিরত রহিলাম।

আমরা পূর্ব্বে বলিয়াছি—লেখন-প্রণালী যে ভারতের বহিঃপ্রদেশে ব্যবহৃত হইত, হিন্দুরা তাহা জানিতেন। আমাদের এই সিদ্ধান্তের দৃষ্টান্ত পাণিনির ৪।১।৪৯ সূত্র হইতে বেশ বুঝা যায়। এই সূত্রে তিনি যবনানী-শব্দের ব্যুৎপত্তি শিক্ষা দিয়াছেন। য়ুরোপীয়দিগের মতানুসারে খৃঃ পূঃ দ্বিতীয় শতাব্দীতে রচিত পতঞ্জলিকৃত পাণিনির মহাভাষ্য অনুসারে, পাণিনি যবনদিগের লিপির বিষয় উল্লেখ করিয়াছেন। এখন, এই যবন শব্দের অর্থ কি, তাহাই বিবেচ্য। পাণিনির সূত্র ও মহাভাষ্য নিম্নে প্রকটিত হইল। সূত্র যথা—

"ইন্দ্র-বরুণ-ভব-শর্ব্ব-রুদ্র-মৃড়-হিমারণ্য-যব-যবন-মাতুলাসার্য্যাণাম্ আণুক্"

মহাভাষ্য যথা—

"হিমারণ্যয়োর্ মহত্ত্বে"। হিমারণ্যয়োর্ মহত্ব" ইতি বক্তব্যম্। মহদ্ধিমন্ হিমানী। মহদ্ অরণ্যম্ অরণ্যানী। "যাবদ্ দোষে" "যাবৎ দোষ" ইতি বক্তব্যম্। দোষো যবো যবানী। যবনাল্লিপ্যাম্। "যবনাল্ লিপ্যাম্" ইতি বক্তব্যম্। যবনানী লিপিঃ।" ইত্যাদি।

পতঞ্জলির পূর্ব্ববর্ত্তী পাণিনির বার্ত্তিককার কাত্যায়ন এবং পতঞ্জলি উভয়েই যবনানী অর্থে যবনলিপি বুঝিয়াছেন। ইহা হইতে স্পষ্টই অনুমিত হইতেছে যে, যবন শব্দটী যখন জাতি-ব্যঞ্জক, তখন যে নিশ্চয়ই পাণিনির পূর্ব্বে ভারতে প্রচলিত ছিল, তদ্বিষয়ে কোনই সন্দেহ নাই। কিন্তু পাণিনির পূর্ব্বে বলিলে কোন্ সময় বুঝায় তাহা স্থির করা বড় সহজ ব্যাপার নয়। প্রসিদ্ধ অধ্যাপক গোল্ডষ্টুকার তাঁহার "Panini's Place" নামক গ্রন্থের ২২৫—২২৭ পৃষ্ঠায় বলিয়াছেন যে, পাণিনি বুদ্ধদেবের আবির্ভাবের পূর্ব্বে জীবিত ছিলেন। এ সম্বন্ধে তাঁহার প্রধান যুক্তি এই যে "নির্ব্বাণো বাতে" এই অষ্টম (২৫০) সূত্র-বুদ্ধদেবের নির্ব্বাণার্থ বিজ্ঞাপক বা পোষক নহে। অতএব পাণিনি বুদ্ধদেবের পূর্ব্ববর্ত্তী। এই একই সূত্র আবার শাকটায়নের (৪।১।২৪৯) ব্যাকরণে প্রযুক্ত হইয়াছে এবং ভাষ্যকার যক্ষবর্ম্মন্ এরূপভাবে ব্যাখ্যা করিয়াছেন যেন গোল্ডষ্টুকারের ব্যাখ্যা নিতান্ত রূঢ় বলিয়া বোধ হয়।—"অবাতে কর্ত্তরি। নির্ব্বাণো মুনিঃ। নির্ব্বাণঃ প্রদীপঃ। অবাত ইতি কিম্। নির্ব্বাতো বাতঃ। নির্ব্বাতেণ বাতে।" আবার অধ্যাপক বেন্‌ফী (Geshichte d. Sprachwissenschaft p. 48 n. 1) পাণিনিকে প্রায়

৩২০ পূর্ব্ব-খৃষ্টাব্দের ব্যক্তি বলেন। অধুনাতন অধ্যাপক ঔফ্রেক্ট (Aufrecht)এর মতে, পাণিনি খৃঃ পূঃ চতুর্থ শতাব্দীর বৈয়াকরণ। লাস্‌সেনের মতে পাণিনি ৩২০ খৃঃ পূঃ জীবিত ছিলেন। কেহ কেহ আবার এমনও বলিয়া থাকেন যে, তিনি খৃঃ পূঃ দ্বিতীয় শতাব্দীর ব্যক্তি। কেবল একমাত্র ডাক্তার রাজেন্দ্রলাল মিত্র পাণিনিকে খৃঃ পূঃ দশম শতাব্দীর বৈয়াকরণ বলিয়াছেন। এক্ষণে পাণিনির আবির্ভাবকাল যাহাই হউক না কেন ইহা স্থির নিশ্চয়, তিনি পূঃ খৃঃ দ্বিতীয় শতাব্দীর বৈয়াকরণ নহেন। সে যাহাই হউক, পাণিনি যবন শব্দে এসিয়াটিক বা য়ুরোপীয় "গ্রীক" অর্থে কখনও প্রয়োগ করেন নাই। তিনি এ শব্দ আসিরীয় বা পারস্যদিগকে লক্ষ্য করিয়া প্রয়োগ করিয়াছিলেন। যবন শব্দটী হীব্রু Yavan শব্দের সহিত সম্পর্ক যুক্ত Homerএ Iaoves বলিয়া ব্যবহৃত হইয়াছে। পাণিনি ব্যাকরণের কাশিকা বৃত্তিতে "যবনাঃ শয়ানাঃ ভুঞ্জাতে" এই বাক্যটী প্রাপ্ত হওয়া যায়। "যবনগণ শয়নাবস্থায় আহার করে "এই পদ্ধতি হইতে স্পষ্টই বুঝা যায় যে এক সময়ে "যবন" শব্দদ্বারা এসিয়াটিক গ্রীকদিগকেই বুঝাইত। পরে ইহা আরব অর্থেও গৃহীত হইয়াছিল। রেনো (Renaud) ও বেবের যবন অর্থে গ্রীকই বুঝেন। এক্ষণে যবনানী অর্থে যে লিপি বুঝায়, তাহা নিঃসন্দেহ। কিন্তু পাণিনির কাল ৩৫০ খৃঃ পূঃ ধরিলে ইহা গোল্ডষ্টুকারের পারস্যলিপি বুঝায়, নতুবা বেবেরের মীমাংসা অনুসারে গ্রীক বা ফিউনিফরম্ লিপিও বুঝাইতে পারে। যাহা হউক পাণিনি-সূত্র সমুদায়দ্বারা স্পষ্টই প্রতীয়মান হয়, তাঁহার সময়ে ভারতে লিপিপ্রথা প্রচলিত ছিল। হৌগ বলেন, বিলুপ্ত প্রাচীন আর্য্য-সাহিত্যের নষ্টাংশে যাহা কিছু পাওয়া যায়, তাহাতে লিখনার্থ কোন ধাতু বা শব্দের ব্যবহার নাই। কিন্তু যখন লিপিপ্রথার সৃষ্টি হয় নাই, তখন বৃহৎ গদ্য বা বিজ্ঞানসঙ্গত গ্রন্থ কিরূপে রচিত হইত, তাহা আমরা সহজে বুঝিতে পারি না।

আমরা পূর্ব্বেই বলিয়াছি, প্রাচীন গ্রন্থে লিখন বিষয়ে কোনরূপ ইঙ্গিত না থাকিলেও থাকিতে পারে। বস্তুতঃ আমাদের বিশ্বাস, প্রাচীন ব্রাহ্মণেরা কোন পবিত্র বিষয় লিপিবদ্ধ করা ভয়ানক পাপ মনে করিতেন। আবার ম্যাক্সমুলারও বলিয়াছেন, "There are stronger arguments than those to prove that before the time of Panini or before the spread of Buddhism in India writing was absolutely unknown." তিনি এমনও বলিয়াছেন যে পুস্তক, মসি, কাগজ বা লিপি বুঝায়, এমন কোন শব্দ পাণিনির ব্যাকরণে নাই। তাঁহার এই মত নিতান্তই আশ্চর্য্য বলিয়া বোধ হয়। কেননা ব্যাকরণের ন্যায় এরূপ বিজ্ঞানসম্মত ব্যাপার যে কখন লিপিপ্রথার সাহায্য ব্যতীত রচিত হইতে পারে, ইহা আমরা ধারণাই করিতে পারি না। আমরা বুঝিতে পারি না, যখন লিপি কাহারও বিদিত ছিল না, তখন তাঁহারা কেমন করিয়া বিশুদ্ধ গদ্যে বৃহৎ বৃহৎ নীতি গ্রন্থ, প্রকাণ্ড প্রকাণ্ড বৃত্তি, ব্যাকরণ, কোষ ও ধর্ম্মগ্রন্থাদি রচনা করিতেন, তাহাদিগকে পৌর্ব্বাপর্য্যানুসারে সজ্জিত করিতেন, এবং কেমন করিয়া তাহাদিগকে অধ্যায়াদিতে বিভক্ত করিয়া তাহাদের সম্বন্ধ নির্ণয় করিতেন। অক্ষরজ্ঞান ব্যতীত কেমন করিয়া যে ব্যাকরণের সন্ধি-সূত্রাদির বিদ্যমানতা সম্ভবপর বলিয়া বোধ হয়, তাহা আমা-

দের ক্ষুদ্রবুদ্ধির অগম্য। আজও পর্য্যন্ত কত জ্যোতিষিক গণনার নিদর্শন রহিয়াছে, যাহাতে খৃঃ পূঃ দ্বাদশ ও ত্রয়োদশ শতাব্দীতে দেশান্তর (Latitude) ও দ্রাঘিমা রেখার (Longitude) অংশ দ্বারা নক্ষত্রের যথার্থ স্থান নির্ণীত হইত। কিন্তু এতৎ সমুদায় কি সংখ্যারাশির জ্ঞান ব্যতীত সম্পন্ন হইতে পারে? যদি তাহা হয়, তাহা হইলে আমাদিগকে বলিতে হয় যে, যাঁহাদের এরূপ উন্নত লিখিত অঙ্কশাস্ত্র ছিল, তাঁহারা বর্ণমালার জ্ঞানবিরহিত ছিলেন। ম্যাক্সমূলর পুরাতন সংস্কৃতগ্রন্থে লিপি বিজ্ঞাপক কোন শব্দের প্রয়োগ নাই বলিয়া নিতান্তই ভ্রান্তির পরিচয় দিয়াছেন। পাণিনির ব্যাকরণে বর্ণ, কার, কাণ্ড, পত্র, সূত্র, অধ্যায়, গ্রন্থ ইত্যাদি সংজ্ঞার প্রকৃত অর্থ বিজ্ঞাত হইলে প্রাচীন ভারতে লিপিপ্রণালী অজ্ঞাত ছিল এ কথা আমরা কখনই বলিতে পারি না। "গ্রন্থ" শব্দের অর্থ "একত্র করা।" ইহা তালপত্র সমুদায় বিদ্ধ করিয়া একত্র সমাবেশরূপ প্রাচীন হিন্দুপ্রথার দ্যোতক। তালপত্রের পুঁথি এখনও আমাদের এই অর্থের জাজ্জ্বল্য উদাহরণস্বরূপ বিদ্যমান। বন্ধন করা হয় বলিয়া জর্ম্মান্ ভাষাতে Band শব্দের অর্থ গ্রন্থ। বোটলিঙ্গ (Böhtlingk) এবং রোথ (Roth) বলেন, "গ্রন্থ শব্দের অর্থ লিখিত পুস্তক, ইহাতে অন্য কিছু বুঝায় না।" এইরূপ লাটিন Textus বলিলে লিখিত পুস্তক বুঝায়, অন্য কিছু বুঝায় না। "বর্ণ"শব্দের অর্থ চিহ্ন। "কার"শব্দে লিখিত ও উচ্চারিত চিহ্ন উভয়ই বুঝায়। "অক্ষর" ইংরেজি "Syllable"এর অর্থদ্যোতক। ইহা "বর্ণ" ও "কার" উভয়ের অর্থও বুঝায়। "অক্ষর" শব্দ সর্ব্বপ্রথম যজুঃসংহিতায় প্রযুক্ত হয়। ঋকের ইহার দুইবার প্রয়োগ দেখা যায়। যথা—

"গায়ত্রেণ প্রতি মিমীতে অর্কমর্কেণ সামত্রৈষ্টুভেন বাকং।

বাকেন বাকং দ্বিপদা চতুষ্পদাক্ষরেণ মিমতে সপ্ত বাণীঃ॥" ঋক্ ১ম, ১৬৪ সূ, ২৪।

পাণিনি "লিখন" অর্থব্যঞ্জক "লিপি" ও "লিবি" শব্দ তাঁহার অষ্টাধ্যায়ী গ্রন্থে ব্যবহার করিয়াছেন (দিবাবিভানিশা-প্রভাভাস্করান্তানন্তাদিবহুনান্দীকিং লিপিলিবিবলি (৩।২।২১)। আমরা পূর্ব্বে দেখাইয়াছি যে পাণিনি "যবনানী" শব্দও প্রয়োগ করিয়াছেন, কাত্যায়ন ও পতঞ্জলিও অর্থ করিয়াছেন যে "যবনানী" শব্দের অর্থ "যবনদিগের লিপি"। অতএব ইহা হইতে স্পষ্ট বোধ হইতেছে যে, পাণিনির সময়ে যবনদিগের লিপি বলিয়া একটী স্বতন্ত্রলিপি ছিল। পাণিনি—

"সমুদাঙ্ভ্যো যমোঽগ্রন্থে" (১।৩।৭৫)

"অধিকৃত্য কৃতে গ্রন্থে" (৪।৩।৮৭)

"কৃতে গ্রন্থে" (৪।৩।১১৬)

"কণ্টকানীকসরকমোদকচষকমস্তকপুস্তকং" (পুল্লিঙ্গ সূত্র ২৯)

"লিখ্ অক্ষরবিন্যাসে" (তুদাদিগণ)

"স্বরিতেনাধিকারঃ" (১।৩।১১)

এই সূত্রগুলিতে "গ্রন্থ" ও "পুস্তক" শব্দ এবং এমন কি "লিখ্" ধাতুও ব্যবহার করিয়াছেন।

পতঞ্জলি ও কাত্যায়ন প্রমাণ করিয়াছেন যে পাণিনি যে প্রকারে "অধিকার" পদের সংজ্ঞা দিয়াছেন, তাহা লিপিজ্ঞান স্বীকার ব্যতীত কখনই সম্ভবপর নয়। পাণিনি "রেফ্" প্রয়োগ করিয়াছেন এবং স্বরিত-চিহ্নেরও উল্লেখ করিয়াছেন। এমন কি কাত্যায়ন "রেফের" ব্যুৎপত্তি দেখাইতে গিয়া প্রমাণ করিয়াছেন যে "রেফ্" "র" বর্ণ ভিন্ন আর কিছুই নয়। অষ্টাধ্যায়ীর ষষ্ঠ অধ্যায়ের তৃতীয় পাদের ১১৫ সূত্র পাঠে জানা যায় যে, পাণিনির সময়ে "স্বস্তিক" আদি চিহ্ন ব্যবহৃত হইত। উক্ত গ্রন্থের "বাম্নপ্যাপিশলেঃ" (৬।১।৯২), "অবঙ্ স্ফোটায়নস্য" (৬।১।১২৩), "স্তুতো গার্গ্যস্য" (৮।৩।২০), "লোপঃ শাকল্যস্য" (৮।৩।১৯), "লঙঃ শাকটায়নস্যৈব" (৩।৪।১১১ মাদ্রাজ সংস্করণ), "ইকোহ্রস্বোহঙ্যোগালবস্য" (৬।৩।৬১), "ঋতোভারদ্বাজস্য" (৭।২।৬৩), "তৃষিমৃষিকৃশেঃ কাশ্যপস্য" (১।২।২৫) ইত্যাদি সূত্র হইতে স্পষ্টই জানা যায় যে পাণিনি, আপিশলি, স্ফোটায়ন, গার্গ্য, শাকল্য, শাকটায়ন, গালব, ভারদ্বাজ এবং কাশ্যপ-ব্যাকরণ জানিতেন। কেননা, পাণিনি ঐ সমস্ত ব্যাকরণ হইতে নিয়ম উদ্ধৃত করিয়াছেন। এই সমস্ত দেখিয়া কে না বলিবে, পাণিনির সময় যে লিপিপ্রণালী ছিল তাহাতে বিন্দুমাত্রও সন্দেহ নাই। পাণিনি তাঁহার ব্যাকরণে "গ্রন্থ"শব্দ চারিবার প্রয়োগ করিয়াছেন। আর তাঁহার ব্যাকরণে "রেফ্" বিদ্যমান থাকায় সহজেই প্রমাণিত হইতে পারে যে "গ্রন্থ"শব্দের অর্থ লিখিত পুস্তক ভিন্ন অন্য কিছুই হইতে পারে না। পাণিনি লোপের সংজ্ঞা দিয়াছেন, "লোপোঽদর্শনম্"। যদি তাঁহার সময় লিপিপ্রণালী না থাকিবে, তবে "লোপোঽশ্রবণম্" এ কথা কি তিনি প্রয়োগ করিতে পারিতেন না? আশ্বলায়নের শ্রৌতসূত্র ও ভিন্ন ভিন্ন বেদের প্রাতিশাখ্যে এইরূপ বিষয় সমস্ত উল্লিখিত আছে যে, লিখনপ্রণালীর বিদ্যমানতা অস্বীকার করিলে, সেই সমস্ত বিষয়ের ব্যাখ্যা আদৌ অসম্ভব হইয়া পড়ে। ডাক্তার রাজেন্দ্রলাল মিত্র পাণিনির কাল খৃঃ পূঃ নবম বা দশম শতাব্দী অনুমান করিয়া বলিয়াছেন যে, বুদ্ধদেবের আবির্ভাবকালের বহুপূর্ব্বে এবং কথিত সংস্কৃত গাথার ভাষায় পরিণত হইবার বহুপূর্ব্বে ত্রয়োদশ পূঃ খৃষ্টাব্দকে ভারতীয় লিপির উৎপত্তিকাল ধরা যাইতে পারে। অপিচ, ব্রাহ্মণগ্রন্থেও "কাণ্ড" ও "পটল" শব্দ পাওয়া যায়। ইহাদের "পুস্তক বিভাগ" শতপথব্রাহ্মণে লিখিত আছে যে, "এক বর্ষে যত মুহূর্ত্ত হয় তাহার দ্বিগুণ পঙ্‌ক্তি তিন বেদে আছে। এক বর্ষে ১০৮০০ (৩৬০ X ৩০) মুহূর্ত্ত দ্বিগুণ আছে। ইহা হইতে দেখা যাইতেছে, যদি তখন তিন বেদের লিখিত পুস্তক ছিল না, তাহা হইলে বেদের পঙ্‌ক্তি-গণনা কিরূপে সম্ভব হইতে পারে? পাণিনিও একটী সূত্র দিয়াছেন, "ছন্দস্যপি দৃশ্যতে" (৭।১।৭৬)। এই সূত্র পাণিনিকর্ত্তৃক প্রযুক্ত স্পষ্ট প্রমাণ করা যায় যে পাণিনি যদি লিখিত বেদ না দর্শন করিয়া থাকেন, তাহা হইলে তাঁহার "বেদেও দেখা যায়" এ কথা বলিবার তাৎপর্য্য বা প্রয়োজন কি? যাহা হউক, এইরূপ প্রয়োগাদি দেখিয়া আমাদের মনে হয় যে এই অমৃতময়ী দেবভাষার লিপি যে কতকাল হইতে রহিয়াছে, তাহা নিরূপণ করা দুঃসাধ্য। তবে এই পর্য্যন্ত মুক্তকণ্ঠে বলা যাইতে পারে যে অন্ততঃ খৃঃ পূঃ ষোড়শ কিংবা সপ্তদশ শতাব্দীর পরে কখনই লিপির উৎপত্তি হয় নাই। তবে, কেহ যেন না মনে করেন যে আমরা খৃঃ পূঃ ষোড়শ বা সপ্তদশ শতাব্দীকে

ভারতীয় লিপির সৃষ্টি স্বীকার করিতেছি। পাণিনি এবং তাঁহার পূর্ব্বপুরুষগণ যে লিপি ব্যবহার করিয়াছিলেন, তাহা কি প্রকারের লিপি এক্ষণে তাহাই আমাদের বিবেচ্য বিষয়ের মধ্যে গণ্য হইতে পারে। কিন্তু বিবেচ্য বিষয় হইলে কি হইবে, তাহা আমাদের জানিবার কোনও উপায় নাই। পরন্তু, তাই বলিয়া কি ভারতীয় লিপি বাক্ট্রীয় বা ফিনিসীয় অথবা হাইরিটিক লিপিসম্ভূত, ইহা আমরা কখনই স্বীকার করিতে পারিব না। আমাদের এ দেবভাষায় লিপি দেবকল্প ঋষি-সেবিত ভারতেই সঞ্জাত। অন্য কোন ভূমি ইহার জন্মভূমি হইতে পারে না। কারণ, সেই সুদূর সুপ্রাচীন অতীতে, ভারতবাসীদিগকে লিপি-প্রদান পক্ষে, যদি কোন জাতির কল্পনা করা যায়, তবে সেই জাতি হয় পারস্য, নয় ফিনিসীয় কি গ্রীক্। কিন্তু, যদি কেহ পালি অক্ষরগুলি পাশ্চাত্যলিপির সহিত তুলনা করিয়া দেখেন, তিনি দেখিবেন যে ইহার সংখ্যা কি আকৃতি কিছুতেই পাশ্চাত্য লিপির সাদৃশ্য হইবে না। আমরা পূর্ব্বেই আভাষ দিয়াছি যে পালির কি মাত্রা কি লিখিবার ধরণের সহিত পাশ্চাত্য কোন লিপির কণামাত্রও মিল নাই। সুতরাং ভারতীয় লিপির পাশ্চাত্য উদ্ভবের কথা যিনি যতই বলুন না কেন, তাহা কখনই গ্রাহ্য হইতে পারে না। প্রকৃত প্রস্তাবে বলিতে গেলে, তৎকালে চীনদিগেরও ভারতকে লিপিপ্রদান করিবার কিছুই ছিল না এবং সেই সময় ভারতের নিকটবর্ত্তী কোন দেশেই এমন কোন জাতিই ছিল না, যাহারা ভারতকে বর্ণপ্রদানের উপযুক্ত হইয়াছিল। সুতরাং ইহা অনায়াসেই অনুমিত হইতে পারে যে হিন্দুগণকর্ত্তৃকই পালির আকার ও গঠনপ্রণালী কল্পিত হইয়াছিল। তবে, এরূপ হইতে পারে যে তাঁহারা সেই সময় ভারতে প্রচলিত কোন দেশীয় আদর্শে তাহা গঠিত করিয়াছিলেন।

জগতে যাবতীয় বর্ণমালা আছে, তন্মধ্যে সংস্কৃত ভাষার বর্ণমালাই সর্ব্বাপেক্ষা বৈজ্ঞানিক বর্ণমালার নিকটবর্ত্তী। যে ফিনিসীয় বর্ণমালা সমগ্র য়ুরোপীয় বর্ণমালার মূল, তাহাতেও তাহার ক্রম, সংখ্যা ও মাত্রাদি বিষয়ে প্রকৃত বৈজ্ঞানিক বর্ণমালার প্রত্যেক উপাদানের অভাব পরিলক্ষিত হয়। এইরূপে ফিনিসীয় বর্ণোৎপন্ন সমস্ত সাইরো-আরেবিক ভাষায়, এমন কি গ্রীক্ ও লাটিনে পর্য্যন্ত বৈজ্ঞানিক বর্ণমালার উপাদানের অভাব রহিয়াছে। সহজেই প্রমাণ করা যাইতে পারে যে, ঐ সমস্ত বর্ণমালা সম্পূর্ণ শৃঙ্খলাবিহীন এবং অনাবশ্যক বর্ণের পুনরুল্লেখ দোষে দূষিত। হীব্রু ভাষায় পূর্ব্বে স্বরচিহ্ন ছিল না। জেসেনিয়স্ (১৮৩৭ খৃঃ) বলেন, অধুনা যে সমস্ত স্বরচিহ্ন দেখিতে পাওয়া যায় সেগুলি খৃষ্টীয় সপ্তম শতাব্দীতে সংযোজিত হইয়াছে। উচ্চারণ-পার্থক্য নাই অথচ "ক" উচ্চারণের জন্য হীব্রুভাষায় দুইটী অক্ষর আছে; যথা,—"কাপ্" এবং "কপ্"। ইহাদিগের মধ্যে একটী নিশ্চয়ই অনাবশ্যক। এইরূপ প্রাচীন গ্রীকে "কাপ্পা" ও "কপ্পা" নামে দুইটী বর্ণ দেখা যায়। অন্যান্য বহুবিধ দোষসত্ত্বেও য়ুরোপীয়-গণের মধ্যে কেহ কেহ যে কেন ভারতীয়লিপিকে বাক্ট্রীয় ও ফিনিসীয় বর্ণসম্ভূত বলেন, তাহা বলিতে পারি না। সংস্কৃত বর্ণমালার ন্যায় নৈসর্গিক সৌন্দর্য্য বিশিষ্টক্রম—যতদূর জানি, বলিতে পারি, জগতের কোন বর্ণমালায় নাই। বাগ্‌যন্ত্রের গঠনপ্রণালী অনুসারে সংস্কৃত বর্ণমালার ক্রম স্থিরীকৃত হইয়াছে। আশ্চর্য্য এই, ভাষার যতগুলি ধ্বনির আবশ্যক, ইহাতে

ঠিক ততগুলি অক্ষর সমাবেশিত হইয়াছে। ইহার একটী অক্ষর তুলিয়া লইলে ভাষার অঙ্গহানি হইবে, ক্রমের বিপর্য্যয় ঘটিবে। বাগ্‌যন্ত্রের স্থান বক্রগতি। কণ্ঠনালী ও জিহ্বামূলের সংযোগ স্থান হইতে ওষ্ঠপ্রান্ত পর্য্যন্ত বাগ্‌যন্ত্রের অধিকার। কণ্ঠনালী হইতে বক্রভাগে কিছু ঊর্দ্ধে গিয়াছে। ঊর্দ্ধভাগে যাইতে যাইতে ক্রমশঃ নিম্নভাগে আসিয়া অর্দ্ধবৃত্তাকার ধারণ করিয়াছে। কণ্ঠনালী হইতে উদানবায়ু চালিত হইয়া যখন এই অর্দ্ধবৃত্তাকারের মধ্য দিয়া বাহির হইতে যায়, তখন নানা "স্ফুটধ্বনি" উচ্চারিত হয়। সংস্কৃত ভাষায় এক একটী অক্ষর এক একটী ক্রমোৎপন্ন স্ফুটধ্বনিব্যঞ্জক। কণ্ঠনালী হইতে ওষ্ঠপ্রান্ত পর্য্যন্ত স্থানের মধ্য দিয়া উদানবায়ু যখন বহির্গত হইতে যায়, তখন বিভিন্ন স্থানে জিহ্বার সাহায্যে বাধাপ্রাপ্ত হইলে অভিহত হইয়া বিভিন্ন ধ্বনি উৎপাদন করে। এই অভিঘাত স্থান ৫টী। যথা—১ কণ্ঠ, ২ তালু, ৩ মূর্দ্ধা, ৪ দন্ত, ৫ ওষ্ঠ। এই ৫টী অভিঘাত স্থান হইতে ৫ জাতীয় যে স্ফুটধ্বনি, তাহাই আমাদের বর্ণ। আবার অভিঘাত স্থানে উদানবায়ুকে অভিঘাত স্থানসম্ভব মূর্ত্তি দিয়া যে স্বয়ং সিদ্ধধ্বনি উচ্চারণ করা যায়, তাহারাই নাম স্বর। আর অন্য একপ্রকার অভিঘাতে যে ধ্বনি সম্ভূত হয়, তাহা স্বরের সাহায্য ব্যতীত উচ্চারিত হয় না। স্বরসংযোগ করিবামাত্র অভিঘাত স্থানে আবদ্ধ ধ্বনি স্ফুট ভাবে শ্রুত হয়। ইহারই নাম ব্যঞ্জন। এই প্রকারে দেখান যাইতে পারে যে নৈসর্গিক ক্রমান্বয়ের অনুসারে প্রত্যেক বর্ণের উচ্চারণ স্থানে ক্রমানুযায়ী পৌর্ব্বাপর্য্য স্থির করা হইয়াছে। ব্যঞ্জনগুলিকে তাহাদের উচ্চারণানুসারে ও মাত্রা স্পর্শানুসারে ভিন্ন ভিন্ন বর্গে সংযোজিত করা হইয়াছে এবং প্রত্যেক বর্গের বর্ণকেও তাহার মাত্রাস্পর্শানুসারে পূর্ব্বে ও পরে স্থাপিত করা হইয়াছে। সংস্কৃত ভাষায় প্রত্যেক বর্ণ বিশুদ্ধ উচ্চারিত ধ্বনি প্রকাশ করে। এ বিশুদ্ধ ভাষায় উচ্চারণ অদ্বিতীয় অর্থাৎ এক বর্ণের উচ্চারণ অন্য বর্ণের উচ্চারণের সমতুল্য নয়। ইহাতে একটীও অপ্রয়োজনীয় অক্ষর নাই।

উপসংহারে বক্তব্য এই—যিনি ভারতীয় বিবিধ বর্ণমালা ও বৈদেশিক বর্ণমালা যত্নসহকারে ধীরভাবে আলোচনা করিবেন, তিনিই দেখিতে পাইবেন যে হিন্দুর বর্ণমালা হিন্দুর নিজ সম্পত্তি। দেখিবেন, হিন্দু যেমন ন্যায় ও দর্শন, শিল্প ও সাহিত্য, কাহারও নিকট হইতে গ্রহণ করেন নাই, সেইরূপ বর্ণমালাও হিন্দু কাহারও নিকট গ্রহণ করেন নাই। তিনি দেখিবেন, এ বিষয়েও হিন্দু সর্ব্বজাতির শীর্ষস্থান অধিকার করিয়াছেন। এক কথায় বলিতে গেলে, উড়িষ্যার শিল্পদর্শনে বঙ্কিমচন্দ্র যাহা বলিয়াছেন, হিন্দুর বর্ণমালার উদ্ভাবন বিষয়ে পুনরুক্তিস্থলে তাহার আভাষমাত্র দিয়া প্রবন্ধ সমাপ্ত করিব ;—

"তখন তাঁহার হিন্দুকে মনে পড়িবে। তখন মনে পড়িবে, উপনিষদ্, গীতা, রামায়ণ, মহাভারত, কুমারসম্ভব, শকুন্তলা, পাণিনি, কাত্যায়ন, সাংখ্য, পাতঞ্জল, বেদান্ত, বৈশেষিক,—এ সকলই হিন্দুর কীর্ত্তি;—তখন মনে পড়িবে হিন্দুকুলে জন্মগ্রহণ করিয়া জন্মসার্থক করিয়াছি।"

শ্রীঅমূল্যচরণ ঘোষ বিদ্যাভূষণ।

জীববিজ্ঞান-পরিভাষা।

দশম ভাগ প্রথম সংখ্যা "সাহিত্য-পরিষৎ-পত্রিকায়" প্রকাশিত "জীববিজ্ঞান-বিষয়ক পরিভাষা" পাঠ করিয়া তৎসম্বন্ধে আমার যাহা বক্তব্য নিবেদন করিতেছি।

১। Anatomy—শারীর সংস্থান।

"শারীর সংস্থান" না বলিয়া "অঙ্গবিনিশ্চয়" বলিলে কেমন হয়?

"ত্বক্ পর্য্যন্তস্য দেহস্য যোঽয়মঙ্গবিনিশ্চয়ঃ।
শল্যজ্ঞানাদৃতে নৈষ বর্ণ্যতেঽঙ্গেষু কেষুচিৎ॥
*　　*　　*　　*
তস্মান্নিঃসংশয়ং জ্ঞানং হর্ত্রা শল্যস্য বাঞ্ছতা।
শোধয়িত্বা মৃতং সম্যগ্ দ্রষ্টব্যোঽঙ্গবিনিশ্চয়ঃ॥"

(সংশ্রুত-সংহিতা পঞ্চম অধ্যায় শারীরস্থান)।

এই দুই স্থানের "অঙ্গবিনিশ্চয়" শব্দ পাঠ করিলে মনে হয়, ইহাই Anatomy শব্দের যথার্থ প্রতিশব্দ।

২। Inspiration—অন্তঃশ্বসন।
Expiration—বহিঃশ্বসন।

অন্তঃশ্বসনের পরিবর্ত্তে "উচ্ছাস" এবং বহিঃশ্বসনের স্থানে "নিশ্বাস" বলিলে হয় না কি? চরকসংহিতার সূত্রস্থানের অষ্টাদশ অধ্যায়ে—

"উৎসাহোচ্ছ্বাস-নিশ্বাস-চেষ্টা ধাতুগতিঃ সমা।
সমো মোক্ষো গতিমতাং বায়োঃ কর্ম্মাবিকারজম্।"

ইত্যাদি পাঠ করিলে ঐরূপই প্রতীতি জন্মে। শব্দদ্বয়ের অর্থও তাহাই। [শব্দকল্পদ্রুম দ্রষ্টব্য]

৩। Tendon—স্নায়ুরজ্জু।

প্রবন্ধলেখক স্থানান্তরে বলিয়াছেন—"দেখিতে পাই Ligament অর্থে স্নায়ু শব্দ ব্যবহৃত হইত" অথচ তিনি Ligamentএর প্রতিশব্দ "বন্ধনী" আর Tendonএর প্রতিশব্দ "স্নায়ুরজ্জু" লিখিয়াছেন! Ligament ও Tendon ভিন্ন জাতীয় শারীর-বস্তু। সুতরাং অসঙ্গতি দৃষ্ট হইতেছে।

সুশ্রুতসংহিতার শারীর-স্থানের পঞ্চম অধ্যায়ের "ষোড়শ কণ্ডরাঃ * * অক্ষিপিণ্ডাদীনাঞ্চ" এই কএক পংক্তি পাঠ করিলে বোধ হয় Tendon শব্দের প্রতিশব্দ "কণ্ডরা"।

ভাবপ্রকাশ বলেন,—"মহত্যঃ স্নায়বঃ প্রোক্তাঃ কণ্ডরাস্তাস্তু ষোড়শ।
প্রসারণাকুঞ্চনয়োর্দৃষ্টং তাসাং প্রয়োজনং।"

স্থানান্তরে কথিত হইয়াছে—

"বৃত্তাস্তু কণ্ডরাঃ সর্ব্বা বিজ্ঞেয়াঃ কুশলৈরিহ ॥" (সুশ্রুত শারীর স্থান ৫ম অঃ)

সুতরাং কণ্ডরার নামান্তর "বৃত্তস্নায়ু"। ইংরাজীতে যাহাকে "এপোনিউরোসিস্" বলে, তাহাকেও কণ্ডরার সংজ্ঞায় সংজ্ঞিত করা যায়। অতএব এপোনিউরোসিস বা টেণ্ডনের আয়ুর্ব্বেদ-সম্মত প্রতিশব্দ "কণ্ডরা" বা বৃত্তস্নায়ু"। বা "পৃথুলাশ্চ শিরস্যথ" এই বাক্যানুসারে এপোনিউরোসিস্‌কে "পৃথুলা স্নায়ু" বলা যায়।

৪। Bone—অস্থি, Muscle—পেশী।

প্রবন্ধলেখক বলিয়াছেন—"সুশ্রুতের কলল, কলা, জাল, সিরা, ধমনী প্রভৃতি শব্দ কোথাও বা অবিকল গ্রহণ করিতে পারা যায়, কোথাও বা অর্থের কিঞ্চিৎ প্রসারণ বা সঙ্কোচন করিয়া পাশ্চাত্যবিজ্ঞানের পারিভাষিক শব্দরূপে ব্যবহার করা যাইতে পারে"। সুতরাং Bone—অস্থি, Muscle—পেশী। নচেৎ সূক্ষ্মানুসূক্ষ্মরূপে বিচার করিয়া দেখিলে আয়ুর্ব্বেদের যাহা অস্থি, তাহা ইংরাজি কেবল Bone নহে, কিন্তু bones, ossified and calcified cartilages ও permanent cartilages. ক্বচিৎ বা Appendages of the skin. একথা জানা থাকিলে আর সুশ্রুতের "ত্রীণ্যস্থিশতানি" অর্থাৎ মানবদেহে ৩০০ শত হাড় আছে, এই সংখ্যাধিক্যের কারণ বুঝিতে বাকি থাকে না।

তারপর আয়ুর্ব্বেদে যাহা পেশী, ইংরাজির Muscle ঠিক তাহাই নহে। Anatomy ও আয়ুর্ব্বেদে কৃতশ্রম ব্যক্তি মাত্রেই জানেন যে, সুশ্রুত স্ত্রী-স্তনে ৫টী পেশী, যকৃতে ২টী এবং প্লীহায় ২টী পেশী আছে—স্বীকার করিয়াছেন। আর ইংরাজি Anatomy বলিতেছেন, "তন্ন তন্ন করিয়া দেখিয়াছি Liver ও Spleenএ Muscle এমন কি Muscle-fibreও নাই। স্ত্রী-স্তনেও তাই, তবে উহাতে Muscle-fibre কিঞ্চিৎ আছে।" যকৃৎ যে Liver এবং Spleen যে প্লীহা ইহাতে যদি কাহারও সন্দেহ হয়, তবে সুশ্রুতের 'তস্যাধো বামতঃ প্লীহা ফুপ্‌ফুসশ্চ দক্ষিণতো যকৃৎ ক্লোম চ' (শারীর ৪ অঃ) এই বচন দ্বারা নিরাকৃত হওয়া উচিত। অন্যত্রও এইরূপ বস্তু নির্দ্ধারণে বিভ্রাট ঘটিয়াছে। Tendon ও Muscle এক জাতীয় বস্তু, কিন্তু আয়ুর্ব্বেদ কণ্ডরাকে পেশীর মধ্যে না পূরিয়া স্নায়ু বলিয়াছেন।

৫। Nerve—বাতনাড়ী।

প্রবন্ধলেখক বলিয়াছেন, "তাহাতে বোধ হয় যে বায়ু বা বাত দ্বারা Nervous energy এবং বাতবহানাড়ী দ্বারা Nerves বুঝাইত। যদি এই অনুমান সত্য হয়, তাহা হইলে যে সকল কবিরাজ মহাশয়েরা স্নায়বিক দৌর্ব্বল্যের ঔষধের বিজ্ঞাপন দিয়া থাকেন, তাঁহারা ঠিক শব্দ প্রয়োগ করেন না।"

মুক্তকণ্ঠে স্বীকার করি, বিজ্ঞাপনদাতারা ঠিক শব্দ প্রয়োগ করেন না। "Nerve বাতবহানাড়ী" ইহা বিচারসহ কি না মীমাংসা করিবার পূর্ব্বে স্নায়ু যে Nerve নহে, ইহা ভাল করিয়া প্রমাণ করা প্রয়োজন। কেননা সেই ১৮২৫ সালের শ্রীরামপুরের কেরি সাহেবের প্রকাশিত

অভিধান হইতে আর আজ পর্য্যন্ত স্নায়ু শব্দের ইংরাজি প্রতিশব্দ লইয়া অনেক রকমের বিচিত্র কথা শুনিতেছি।

সুশ্রুত বলিয়াছেন—"স্নায়ুশ্চতুর্ব্বিধা বিদ্যাত্তাস্ত সর্ব্বা নিবোধ মে।
প্রতানবত্যো বৃত্তাশ্চ পৃথ্ব্যশ্চ শুষিরাস্তথা ॥
প্রতানবত্যঃ শাখাসু সর্ব্বসন্ধিষু চাপ্যথ।
বৃত্তাস্ত কণ্ডরাঃ সর্ব্বা বিজ্ঞেয়াঃ কুশলৈরিহ।
আমপক্বাশয়ান্তেষু বস্তৌ চ শুষিরাঃ খলু।
পার্শ্বোরসি তথা পৃষ্ঠে পৃথুলাশ্চ শিরস্যথ ॥" (শারীরস্থান ৫ম অঃ)

পূর্ব্বে বলিয়াছি, বৃত্তস্নায়ু Tendon এবং পৃথুলাস্নায়ু এপোনিউরোসিস্। উদ্ধৃত শ্লোক চিন্তাপূর্ব্বক পাঠ করিলে জানা যাইবে,যে প্রতানবত্তী স্নায়ু Ligament এবং শুষিরা স্নায়ু Duct, আমাশয়ান্ত শুষিরা স্নায়ু Cystic duct, Hepatic duct, Pancreatic duct ; আর পক্বাশয়ান্ত শুষিরা স্নায়ুকে Thoracic duct বলা যায়। অবশ্য "অন্ত" শব্দের অর্থ প্রসারণ করিতে হইবে। বস্তির সন্নিকটস্থিত শুষিরা স্নায়ু ২টী ureter। ৯ম অধ্যায়ে ইহাই মূত্রবহা স্রোতঃ বলিয়া কথিত। ৪ প্রকার স্নায়ুর ইংরাজি প্রতিশব্দ বলা হইল। এক্ষণে "বাতবহানাড়ী" ইংরাজি Nerve শব্দের আয়ুর্ব্বেদসম্মত প্রতিশব্দ কি না তাহাই দেখিতে হইবে।

প্রবন্ধলেখকের "বাতবহা নাড়ী" শব্দে কোন্ শারীর বস্তু বুঝাইতেছে বুঝা গেল না। কেননা আয়ুর্ব্বেদে শরীরের উপাদানীভূত যত বস্তুর নামোল্লেখ দেখা যায়, তন্মধ্যে বাতবহানাড়ী নামে পৃথক্ কোন শারীর বস্তুর উল্লেখ নাই। হয় শিরা নয় ধমনী, এই দুইটীই বায়ু বহন করিয়া থাকে বলিয়া অন্যান্য সংহিতাগ্রন্থে এবং শারীরতত্ত্বের প্রধান গ্রন্থে (সুশ্রুতসংহিতায়) উল্লিখিত আছে। তন্মধ্যে শিরাকে বাদ দিতে হয়, কেননা—

"নহি বাতং শিরাঃ কাশ্চিন্ন পিত্তং কেবলং তথা।
শ্লেষ্মাণং বা বহন্ত্যোতা অতঃ সর্ব্ববহাঃ স্মৃতাঃ ॥" (সুশ্রুত শারীর ৭ম অঃ)

যাহা বস্তুতঃ সর্ব্ববহা তাহাকে "বাতবহা" বলা সঙ্গত নয়। আর প্রবন্ধলেখক বোধ হয় বাতবহা সিরাকে Nerve বলিতে প্রস্তুতও নহেন। বাতবহানাড়ী শব্দে ধমনীকেও বুঝান কঠিন। সুশ্রুত শরীরের যাবতীয় ধমনীকে তিন ভাগ করিয়াছেন, উর্দ্ধগা, অধোগা ও তির্য্যগ্‌গা। তন্মধ্যে উর্দ্ধগা ও অধোগার বাতবহত্বের উল্লেখ আছে। (শারীর-স্থান ৯ম অধ্যায়।) কিন্তু তির্য্যগ্‌গার বাতবহত্বের উল্লেখ দেখা যায় না।—(শারীর—৯ম অধ্যায়)। তবে "বাতবহা-নাড়ী" কি? উর্দ্ধগা ও অধোগা ধমনীই বা কি?

৬। Alimentary (canal ?)—অন্ননালীমণ্ডল।

আমার বোধ হয় Alimentary canal শব্দের আয়ুর্ব্বেদ সম্মত প্রতিশব্দ "মহাস্রোতঃ"। বাগ্‌ভটের টীকাকার অরুণদত্ত "মহাস্রোতোঽনুশায়িনঃ" পাঠের টীকায় লিখিয়াছেন "মহাস্রোতঃ আমপক্বাশয়স্থানং" (বাগ্‌ভট নিদানস্থান ১১ অঃ।)

৭। Pharynx—শৃঙ্গাটক।

সুশ্রুত শারীরস্থানের ৬ষ্ঠ অধ্যায়ে আছে—

"ঘ্রাণাবাক্ষিজিহ্বাসন্তর্পণীনাং সিরাণাং মধ্যে সিরাসন্নিপাতঃ শৃঙ্গাটকানি তানি চত্বারি মর্ম্মাণি"। এতদ্দ্বারা জানা যায় ৪টী সিরামর্ম্মের নাম শৃঙ্গাটক। ইহা কিরূপে Pharynxএর প্রতিশব্দ হইবে? ভাবপ্রকাশকার মুখের প্রত্যঙ্গের বর্ণনায় বলেন—

"ওষ্ঠৌ চ দন্তমূলানি দন্তা জিহ্বা চ তালু চ।
গলো মুখাদি সকলং সপ্তাঙ্গং মুখমুচ্যতে॥"

Pharynx শব্দে "গল" বলিলে হয় না? বাগ্‌ভটে তালু শব্দের একটী বিশেষণ আছে। "জিহ্বাক্ষিনাসিকাশ্রোত্রখচতুষ্টয়-সঙ্গমে (তালুনি)" (শারীর ৪ অঃ) সুতরাং Pharynxকে তালু বলিতেই দোষ কি? ইংরাজি Soft ও heard palate ছাড়া আর খানিকটা স্থান ব্যাপিয়া আমাদের তালু-শব্দের সীমা।

৮। Gullet—অন্ননালী।

Gullet চলতি শব্দ। Œsophagus বৈজ্ঞানিক নাম। আমার বোধ হয় Œsophagus-এর আয়ুর্ব্বেদ সম্মত নাম "কণ্ঠনাড়ী"। বাগ্‌ভটের শারীর স্থানের তৃতীয় অধ্যায়ের ১৮ পৃষ্ঠায় (শ্রীযুক্ত বিজয়রত্ন সেন মহাশয়ের সংস্করণ) টীকাকার অরুণদত্ত লিখিয়াছেন—"তথা ভুক্তং স্বভাবহৃতং কণ্ঠনাড়ীলুঠিতং কায়স্ত মহানিম্নদেশং কোষ্ঠাখ্যং অবতীর্ণং গৃহীত্বা অবতিষ্ঠতে" ইহা পড়িলে কি মনে হয় না যে Œsophagusই কণ্ঠনাড়ী।

৯। Viscera—কোষ্ঠ

"কোষ্ঠ" ভাল না আশয় ভাল? আশয়ের অন্য অর্থ ঘটান যায় না। কোষ্ঠের কিন্তু Viscera ভিন্নার্থ আছে। "যকৃৎ সমন্তাৎ কোষ্ঠঞ্চ"—(সুশ্রুত শারীর—৪ অঃ)

১০। Auricle—কোষ্ঠ।

কোষ্ঠ না করিয়া পছন্দ মত অন্য কিছু করিলে ভাল হয়। আয়ুর্ব্বেদের কোনস্থানেই হৃদয়ের বিভিন্ন গুহা থাকার কথা পড়ি নাই। হৃদয় শুষির অর্থাৎ শূন্যগর্ভ এবং উহাতে "পেশী-চয়" আছে এই পর্য্যন্ত জানা যায়, সুতরাং ইহার আয়ুর্ব্বেদসম্মত শব্দান্বেষণ বৃথা। Cary সাহেবের Dictionary of the Bengalee Languageনামক গ্রন্থে Ventricle of the heart শব্দের অনুবাদ "হৃদুদর" করিয়াছেন। Auricleএর কৈ খুঁজিয়া পাইলাম না।

১১। Intestine small—তনু অন্ত্র।

Intestine large—পৃথু অন্ত্র।

শারীর স্থানের ৪র্থ অধ্যায়ের টীকায় (শ্রীযুক্ত বিজয়রত্ন সেন মহাশয়ের সংস্করণ অঃ ১১৩) অরুণ দত্ত বলিয়াছেন, "স্থূলান্ত্রসূক্ষ্মান্ত্রভেদাৎ দ্বিধা অন্ত্রং। তত্র স্থূলান্ত্রবদ্ধো গুদো নাম মর্ম্ম-বিশেষঃ"। সুতরাং তনু অন্ত্রের পরিবর্ত্তে সূক্ষ্মান্ত্র এবং পৃথু অন্ত্রের পরিবর্ত্তে স্থূলান্ত্র ব্যবহার করাই সঙ্গত।

১২। Pancreas—ক্লোম (?)

জিজ্ঞাসার চিহ্নেই বুঝা যাইতেছে শব্দটী প্রবন্ধলেখকের মনঃপূত হয় নাই। এই জন্য আমি প্রথমেই দেখাইতেছি, আয়ুর্ব্বেদোক্ত ক্লোম শব্দের যথার্থ ইংরাজি প্রতিশব্দ সম্ভবতঃ কি হইতে পারে।

নিম্নলিখিত কএকটী কারণে ক্লোমকে Right lung বলিয়া প্রতীতি জন্মে।

১। ক্লোমনিবদ্ধ এমন একটী নাড়ী আছে, যাহাতে ১৮টী অস্থিসন্ধি আছে। "নাড়ীষু হৃদয়ক্লোমনিবদ্ধাষ্টাদশ" (সুশ্রুত শারীরস্থান ৫ অঃ) কোন কোন গ্রন্থে "হৃদয়ক্লোম-ফুস্ফুসনিবদ্ধাষু" এই পাঠ আছে। এই পাঠ স্বীকার করিলে ইহাই এক বলবৎ প্রমাণ হইয়া পড়ে। (ভাবপ্রকাশ পূর্ব্বখণ্ড ১ম ভাগ) বিচার করিয়া দেখিলে সিদ্ধান্ত হইবে যে এই নাড়ী Trachea এবং ঐ অষ্টাদশ অস্থিসন্ধি, অঙ্গুরীয়কাকার Tracheaর Cartilagesগুলির সন্ধি হৃদয় পক্ষে নিবদ্ধ শব্দের অর্থ সংলগ্ন করিতে হইবে।

"সমানবায়ুপ্রধ্মাতাৎ রক্তাৎ দেহোষ্মপাচিতাৎ।
কিঞ্চিৎ উচ্ছ্রিতরূপস্তু জায়তে ক্লোমসংজ্ঞিতঃ॥"

(বাগ্‌ভট শারীরস্থান ৩য় অঃ অরুণদত্তকৃত পাঠ (শ্রীযুক্ত বিজয়রত্ন সেন মহাশয়ের সংস্করণ ৬২ অঃ)

যাহা সমানবায়ু কর্ত্তৃক প্রধ্মাত এবং দেহোষ্মপাচিত রক্ত দ্বারা উচ্ছ্রিতরূপ তাহা যে lung তাহাতে আর সন্দেহ আছে কি? Pancreas এতাদৃশ বিশেষণ সম্ভব কি?

"অধস্তু দক্ষিণে ভাগে হৃদয়াৎ ক্লোম তিষ্ঠতি" (ভাবপ্রকাশ পূর্ব্বখণ্ড প্রথমভাগ)

আর ফুস্ফুসের অবস্থান সম্বন্ধে——

"হৃদয়াৎ বামতোঽধশ্চ ফুস্ফুসঃ" (ভাবপ্রকাশ পূর্ব্বখণ্ড প্রথমভাগ)

ক্লোম, Pancreas হইলে এ অবস্থিতি-বর্ণনা মিথ্যা হয়; কারণ Pancreas ডিওডিনমের মোড় হইতে প্লীহা পর্য্যন্ত ব্যাপিয়া আছে; সুতরাং হৃদয়ের বামভাগে হইল।

"তস্যাধো বামতঃ প্লীহা ফুস্ফুসশ্চ, দক্ষিণতো যকৃৎ ক্লোম্ চ।" (সুশ্রুত শারীরস্থান ৪ অঃ)

উদ্ধৃত বাক্যে বর্ণনার ভঙ্গী দেখিলেই বোধ হয় ক্লোম lung ভিন্ন আর কিছুই নহে। অর্থাৎ ধন্বন্তরি ডায়েফ্রামের উপর ও নীচের হৃদয়সন্নিহিত প্রধান প্রধান আশয় (viscera) এতদ্দ্বারা বর্ণন করিয়াছেন। হৃদয়ের সন্নিহিত ডায়েফ্রামের উপরি বামদিকে ফুস্ফুস ও নীচে প্লীহা, আর দক্ষিণ দিকে উপরে ক্লোম আর নীচে যকৃৎ। Pancreas অর্থ করিলে এ পরিপাটী বজায় থাকে না।

১৩। Trachea—কণ্ঠনালী।

পূর্ব্বে বলিয়াছি, œsophagusকে কণ্ঠনাড়ী বলাই আয়ুর্ব্বেদের অভিমত। ক্লোম right lung, আবার এই সিদ্ধান্ত যদি নিরপবাদ হয়, তবে tracheaকে ক্লোমনাড়ী বলিলে

...। বা আর কিছু করুন। আয়ুর্ব্বেদে এক "অপস্তম্ভ" মর্ম্মের কথা আছে, আমার বোধ হয় উহা bronchi। ঠিক Trachear কোন শব্দ পাই নাই।

১৪। Kidney—মূত্রযন্ত্র বৃক্ক।

"বৃক্ক" কেন? বৃক বলুন। "বৃক্কৌ" প্রয়োগ আছে। আর উহা কটীসন্নিকটে স্থিতও বটে।

১৫। Sense, organ—ইন্দ্রিয়।

ইন্দ্রিয় না বলিয়া জ্ঞানেন্দ্রিয়াধিষ্ঠান বলিতে পারেন। ইন্দ্রিয় এবং ইন্দ্রিয়াধিষ্ঠান তো এক শব্দ। আয়ুর্ব্বেদ এবং দর্শনশাস্ত্র উভয়ের মতেই ইন্দ্রিয় চক্ষুর গোচর। চক্ষু দর্শনেন্দ্রিয়াধিষ্ঠান। আর অবলোকনী দর্শনেন্দ্রিয়াধিষ্ঠান। আর অবলোকনী শক্তি ও সিদ্ধান্ত বাক্য প্রমাণ আর কি দিব? তথাপি—"অতীন্দ্রিয়মিন্দ্রিয়ং ভ্রান্তানামধিষ্ঠানে" (সাংখ্যসূত্র দ্বিতীয়াধ্যায় ২৩ সূত্র)

১৬। Outer ear—বহিঃকর্ণ, কর্ণপত্র।

কর্ণপালী আয়ুর্ব্বেদসম্মত শব্দ (সুশ্রুত সূত্রস্থান ১৭ অঃ)

১৭। External auditory passage—কর্ণকূপ।

কর্ণশষ্কুলী বা কর্ণপত্রিকা বলিলে ঠিক হইত।

১৮। Larynx—স্বরযন্ত্র।

বাক্ একটি কর্ম্মেন্দ্রিয় বলিয়া শাস্ত্রে "বাক্পাণিপায়ুপাদোপস্থ" কথিত আছে। তাহা হইলে বাগিন্দ্রিয় বলুন না।

১৯। Clavical—কণ্ঠাস্থি।

সুশ্রুতসংহিতায় মানব শরীরের প্রত্যেক অস্থির এক একটি স্বতন্ত্র নাম নাই। অঙ্গের নামোল্লেখ পূর্ব্বক অস্থি গণনা করা হইয়াছে যথা—"জত্বায়াং দ্বে" ইত্যাদি। সুতরাং প্রবন্ধলেখক অস্থির যে সংজ্ঞারচনা করিয়াছেন, তদ্বিষয়ে আমার কোন বক্তব্য নাই। তবে এই মাত্র বক্তব্য যে clavical boneএর নাম সুশ্রুতে আছে। "দ্বে অক্ষকসংজ্ঞে" ইহা clavical boneএর নাম। সুতরাং কণ্ঠাস্থির পরিবর্ত্তে "অক্ষক' বলিলে ভাল হয়। (ক্রমশঃ)

শ্রীবিরজাচরণ গুপ্ত কবিভূষণ।

গোতমের প্রতিভা।

বিশ্ববাসীর প্রবৃত্তি ও নিবৃত্তি

ব্রহ্মাদিস্তম্বপর্য্যন্ত স্থাবরজঙ্গমাত্মক এ বিশ্বমণ্ডলের প্রত্যেক পদার্থই কখনও হীনতর অবস্থায় কখনও বা উচ্চতর অবস্থায় একবার নামিতেছে, একবার উঠিতেছে; কোন পদার্থই ঠিক থাকিতে পারিতেছে না। স্বভাব সকলকে নিজ নিয়মের অধীন রাখিয়া, যখন উচ্চতর অবস্থায় উঠাইবার জন্য প্রবর্ত্তিত করিতেছে, তখন উঠিতেছে; আবার যখন আকর্ষণ করিতেছে, তখন সকলেই নিম্নতর অবস্থায় নামিতেছে। যখন উঠিতেছে, তখন তাহার শোভা-বিস্তার হইতেছে; আর যখন নামিতেছে, তখন সে শোভার আর অস্তিত্ব রাখিয়া নামিতেছে না, সমস্তই নিজাঙ্গে মিশাইয়া নামিতেছে। স্নতরাং এ বিশ্ববাসীর প্রত্যেক-পদার্থের প্রাণে প্রাণে প্রবৃত্তি ও নিবৃত্তি গাঁথা রহিয়াছে। আহার করিবার প্রবৃত্তি হইলে হস্তপদাদির বাহ্য-ব্যাপার-দ্বারা আহার করা যায়, আবার সঙ্গে সঙ্গে আহারের নিবৃত্তিও হয়, এইরূপে প্রত্যেক ব্যাপারে একবার প্রবৃত্তি, একবার নিবৃত্তি, আবার প্রবৃত্তির পরেই নিবৃত্তির পরিচয় প্রায়ই সকলে পাইয়া থাকেন।

প্রবৃত্তি নিবৃত্তির অজ্ঞান

এই প্রবৃত্তি ও নিবৃত্তি কেন হয়, কিরূপে হয়, আর ইহার ফলই বা কিরূপ? এ বিষয় বোধ হয় নিবিষ্টচিত্তে কেহ ভাবেন না, অথবা ভাবিবার সামর্থ্যে কাহারও কুলায় না। বালক কি তাহার উৎপত্তির বিষয় ভাবিয়া স্থির করিতে পারে? হাঁ, স্থির করিতে পারে; তাহার জন্মের বিষয় প্রত্যক্ষরূপে অবগত যে পিতামাতা, তাঁহারা কথোপকথন-চ্ছলে বুঝাইয়া দিলে—স্থির করিতে পারে; সেইরূপে কেহ বুঝাইয়া দিলে সকলেই এই প্রবৃত্তি নিবৃত্তির সাধন, উপায়, ভেদ ও ফল, এ সমস্তই স্থির করিতে পারে।†

যে বুঝাইয়া দিবে, এ বিশ্বমণ্ডল যাঁহার নিকট উপস্থিত হইয়া বুঝিয়া লইবে, তিনি অবশ্য

---

* সাধারণতঃ বৃক্ষের দুটী ভাগ, একটী গোড়া ও একটী আগা। সকলে বলিয়া থাকে যে দিক্ ছাড়িয়া শাখা প্রশাখাদি বিস্তার করিতে করিতে উর্দ্ধে উঠে, সেই দিক্ গোড়া বা নিম্ন, আর যে দিকে উঠিতেছে, সে দিক্ উচ্চ বা আগা। এ ব্যবহারটী ভুল হইলেও সাধারণের পরিচিত বলিয়া এরূপ ব্যবহার করা গেল। ইহার বিপরীত ব্যবহারই সত্য, কারণ যে অংশ অগ্রে ছিল, সেই অংশই ত আগা বা উচ্চ অবস্থার, আর যে অংশে যাইয়া ফিরিতে হইবে, সেই বিকৃত অংশই নীচ বা অপকৃষ্ট। গীতায় এই জন্য "উর্দ্ধমূলমধঃশাখং" বলা হইয়াছে।

† সাধন—যেরূপে প্রবৃত্তি ও নিবৃত্তি হয়।
উপায়—যদ্দ্বারা প্রবৃত্তি ও নিবৃত্তি হয়।
ভেদ—প্রবৃত্তির আকার ও নিবৃত্তির প্রকার।
ফল—প্রবৃত্তি ও নিবৃত্তি দ্বারা যাহা হয়।

প্রবৃত্তি-নিবৃত্তির উপদেষ্টা—ঈশ্বর।

জ্ঞানিসমাজের সমাজপতি, জ্ঞানরাজ্যের সার্ব্বভৌম অধীশ্বর সম্রাট্। তাঁহাকে যে যে নামে ডাকিতে চাহে, সে সেই নামে ডাকিতে পারে। আমরা তাঁহাকে ঈশ্বর-নামে ডাকিতে চাহি; সুতরাং আমাদিগের নিকট তিনি ঈশ্বর-নামে পরিচিত।

তিনি যে ভাষায় বুঝাইয়া দিয়াছিলেন, আদি-অবস্থায় উৎপন্ন দেবর্ষিমহর্ষিগণ যে ভাষা শুনিয়া সেই প্রবৃত্তি-নিবৃত্তির ভাব বুঝিয়াছিলেন, শিষ্যপরম্পরায় আমরাও যখন সেই ভাষাই শুনিয়া আসিতেছি, তখন আমরা সে ভাষাকে শ্রুতিই বলিব। সেই শ্রুতিই এ বিশ্বমণ্ডলের দুটী ধর্ম্ম বলিয়াছেন:—একটী প্রবৃত্তি ও অন্যটী নিবৃত্তি। প্রবৃত্তিবশে বিশ্ববাসী ক্রমাভিব্যক্তি বা ক্রমবিকাশপথে অগ্রসর হয়, আর নিবৃত্তি-বশে ক্রমবিনাশপথের পথিক হয়। তন্মধ্যে এ বিশ্বমণ্ডল সৃষ্টির প্রবাহক্রমে চলিয়াছে বলিয়া ইহার প্রবৃত্তি অপেক্ষা নিবৃত্তি অতি অল্প; প্রবৃত্তি তিনগুণ, আর নিবৃত্তি একগুণ।

প্রবৃত্তি-নিবৃত্তির ফল।

প্রবৃত্তি-ধর্ম্ম তিন ভাগে বিভক্ত। সেই তিনভাগের প্রথম ধর্ম্ম, দ্বিতীয় অর্থ, তৃতীয় কাম। ধর্ম্মও আবার অনেক শাখাপ্রশাখায় বিভক্ত বলিয়া তাহায় শাসনকর্ত্রী ত্রয়ীবিদ্যা। ইহাই প্রথম প্রস্থান বলিয়া বিখ্যাত।* দ্বিতীয়ভাগ অর্থ, নানা কুটিল উপায়ের ফল; সুতরাং তাহার শাসনভার দণ্ডনীতি বা অর্থনীতির উপর ন্যস্ত হইয়াছে। ইহাই দ্বিতীয়-প্রস্থান-নামে প্রসিদ্ধ। তৃতীয়ভাগ কাম, যাহার সদ্ব্যয়ে সুখস্বাচ্ছন্দ্য ও অসদ্ব্যয়ে দুঃখকষ্ট, তাহার শাসন সাধারণলোকের উপর নির্ভর করিতেছে; অতএব লোকচরিত, সমাজচরিত প্রভৃতি ইতিবৃত্তকে তৃতীয়প্রস্থান বলা হইয়াছে। এই তিনভাগ লইয়া প্রবৃত্তিধর্ম্মের উজান-স্রোত সমাজ-প্রান্তরের উপর দিয়া বহিয়া যাইতেছে, ইহার প্রতিকূলে চলিতে পারিলে, তবে আবার সেই গোড়ায় যাওয়া যাইবে। যেখান হইতে ঐ উজান-স্রোতের সূচনা হইয়াছে, সেইস্থানে যাইতে হইলে † যাজ্ঞিকগণের সাহায্যে ত্রয়ীবিদ্যা এবং চিরপ্রচলিত দণ্ডনীতি, আর লোকানুযায়ী ইতিবৃত্তের জ্ঞান উপার্জ্জন করিয়া তাহার সহায়তায় শক্তি সঞ্চয় করিতে হইবে, পরে নিবৃত্তিমার্গের উপদেষ্টা অধ্যাত্ম-শাস্ত্রের উপদেশানুসারে ধীরপদসঞ্চালন করা শিখিতে হইবে। তাহা হইলে যেখান হইতে নামিয়া আসা হইয়াছে, আবার ঠিক সেইখানে যাওয়া যাইবে।

প্রবৃত্তি-ধর্ম্মের বিভাগ।

নিবৃত্তিমার্গের উপদেষ্টা অধ্যাত্মশাস্ত্র।

এইরূপ নিবৃত্তিধর্ম্মের উপদেশকারী অধ্যাত্মশাস্ত্র ছয়টী,—কপিলের সাংখ্য, কণাদের

---

* ন্যায়দর্শনের দ্বিতীয় সূত্রের ভাষ্য দ্রষ্টব্য।

"ত্রৈবিদ্যেভ্যঃ ত্রয়ীং বিদ্যাং দণ্ডনীতিঞ্চ শাশ্বতীং।
আন্বীক্ষিকীমাত্মবিদ্যাং বার্ত্তারম্ভাংশ্চ লোকতঃ॥" (মনু ৭।৪৩)

"ত্রৈবিদ্যা মাং সোমপাঃ পূতপাপা,
যজ্ঞৈরিষ্ট্বা স্বর্গতিং প্রার্থয়ন্তে।" (গীতা ৯ অঃ। ২০ শ্লোক)

"ত্রৈবিদ্যাঋগ্‌যজুঃ সামবিদো যাজ্ঞিকাঃ" (শাঙ্করভাষ্যম্)

বৈশেষিক, গোতমের ন্যায়, পতঞ্জলির যোগ, জৈমিনির পূর্ব্বমীমাংসা, ও বেদব্যাসের ব্রহ্মমীমাংসা বা বেদান্ত। তন্মধ্যে আমাদের আলোচ্য ন্যায়দর্শন। ন্যায়দর্শনকে ন্যায়বিদ্যা, ন্যায়শাস্ত্র ও আন্বীক্ষিকী নামে অভিহিত হইতে দেখা যায়। লিঙ্গানুশাসনে অমরসিংহ আন্বীক্ষিকীকে তর্কবিদ্যা বলিয়া অন্যান্য মীমাংসার ইঙ্গিত মাত্র করিয়াছেন।

অধ্যাত্মশাস্ত্র বা দর্শনশাস্ত্র ছয়টী।

তর্ক, ন্যায়, অন্বীক্ষা, পরীক্ষা, পরীক্ষণ, পরীষ্টি, বিচার ও মীমাংসা, এই শব্দগুলি প্রায় একার্থক; সুতরাং তন্নির্ব্বাহক-শাস্ত্রকে সেই সেই নামে অভিহিত করায় কোন আপত্তিই হইতে পারে না। আমার বোধ হয়, বেদার্থমীমাংসায় প্রবৃত্ত ষড়্‌দর্শনকে ঐ সকল নামে কীর্ত্তিত করিলে বড় দোষ হয় না; কেন না, প্রত্যেক-দর্শনই মুক্তকণ্ঠে স্বীকার করিতেছেন—মুক্তিলাভের একমাত্র উপায় তত্ত্বজ্ঞান। তবে তার মধ্যে প্রভেদ এইমাত্র যে, কেহ বলেন—পঞ্চবিংশতি-তত্ত্বজ্ঞানে মুক্তি, কেহ ষট্‌পদার্থ-তত্ত্বজ্ঞানে, কেহবা ষোড়শপদার্থের তত্ত্বজ্ঞানে, আর অন্য কেহ বলেন, কেবল আত্মতত্ত্বজ্ঞানে মুক্তি হয়। যাহাই হউক, তত্ত্বজ্ঞানে মুক্তি, এ অংশে সকলেই নির্ব্বিবাদ ও একমত। তদ্ভিন্ন দুঃখনিবৃত্তিই মুক্তি ও তাহাই বিচারের প্রয়োজন, ইহাও সর্ব্ববাদিসম্মত।

ষড়্‌দর্শনের একার্থতা ও বিবিধ নাম।

তবে ন্যায় ও বৈশেষিকদর্শন প্রথমাধিকারীর, সাংখ্য ও পাতঞ্জল মধ্যাধিকারীর, এবং বেদান্ত সর্ব্বোচ্চ উত্তমাধিকারীর বিচারপ্রণালী আবিষ্কার করিয়া মুক্তিমণ্ডপে উপনীত হইবার তিনটী সোপান ক্রম-উচ্চভাবে গাঁথিয়া দিয়াছেন বলিয়া বোধ হয় এক মীমাংসানামে বা আন্বীক্ষিকীনামে সকল দর্শনই কথিত হইতে পারে।*

অধিকারীর ভেদে ষড়্‌দর্শনের ত্রৈবিধ্য।

তন্মধ্যেও আবার দুইটী ভাগ আছে বলিয়া বোধ হয়, কারণ, মোক্ষধর্ম্মে কথিত হইয়াছে যে, পুঙ্খানুপুঙ্খরূপে পরা আন্বীক্ষিকী দেখিয়া নিঃশেষভাবে উপনিষদ্ মন্থন করিব।† ইহাদ্বারা যে অপরা আন্বীক্ষিকী বিদ্যা একটী নিম্নস্তরে আছে, এটী যেন একরূপ আসিয়াই যায়। এরূপ কেহ স্বীকার করিবেন কিনা জানি না; তবে বোধ হয় এরূপ স্বীকার করায় আপত্তি না হইতে পারে। এতদ্দ্বারা কেবল বেদান্তকে উচ্চাসনে বসাইয়া অন্য সকল দর্শনকে অধঃপতিত করার অভিযোগ উত্থাপন করিলে, তাহার উপর সন্তোষজনক উত্তর দিয়া তিষ্ঠিতে পারিব না বলিয়া সে কথার এই স্থানেই বিশ্রাম দেওয়া উচিত বোধ করিলাম।

প্রকারান্তরে দ্বৈবিধ্য।

যাহা হউক নৈয়ায়িকসম্প্রদায় বলিয়া থাকেন যে, আন্বীক্ষিকীবিদ্যা বলিলে ন্যায়বিদ্যা বা

---

* "আন্বীক্ষিকী—বিদ্যোদ্দেশে পরীক্ষিতা।" বাৎস্যায়নভাষ্য। অর্থাৎ আত্মবিদ্যার নামমাত্র গ্রহণ করিয়া এই ন্যায়বিদ্যা পরীক্ষিত হইয়াছে। তাহা হইলে ন্যায় ও বৈশেষিকে আত্মবিদ্যার উদ্দেশমাত্র করা হইয়াছে, সাংখ্য ও পাতঞ্জলে তাহার লক্ষণ করা হইয়াছে ও বেদান্তে তাহার শেষফল-প্রসবকারক-বিচার করা হইয়াছে; এইরূপ ভাষ্যকারের অভিপ্রায় বোধ হয় না কি?

† "তত্রোপনিষদং তাত! পরিশেষন্তু পার্থিব! মথ্নামি মনসা পার্থ! দৃষ্ট্বাচান্বীক্ষিকীং পরাং।" মোক্ষধর্ম্মে।

ন্যায়বিদ্যার নাম আন্বীক্ষিকী।

ন্যায়শাস্ত্রকেই বুঝিতে হইবে, নতুবা বোধ হয় কিছু দোষ দুষ্ট হইয়া পড়ে অথবা হয়ত ঐ শব্দটার উপর অভিসম্পাত দেওয়া আছে, সুতরাং উহার অন্য অর্থ বুঝাইবার আর শক্তি নাই।

আন্বীক্ষিকীর প্রয়োজন।

ভগবান্ বাৎস্যায়ন বলিয়াছেন—"ইমাস্তু চতস্রো বিদ্যাঃ পৃথক্-প্রস্থানাঃ প্রাণিনামনুগ্রহায় উপদিশ্যন্তে, যাসাং চতুর্থীয়মান্বীক্ষিকী ন্যায়বিদ্যা।" অর্থাৎ—প্রাণিগণের অনুগ্রহের জন্য পৃথক্ পৃথক্ পথ অবলম্বন করিয়া এই চারিটী বিদ্যা উপদিষ্ট হইয়াছে, যাহাদের মধ্যে চতুর্থী এই আন্বীক্ষিকী ন্যায়বিদ্যা।

আন্বীক্ষিকীশব্দের প্রকৃত অর্থ।

অপর স্থানে বলিয়াছেন,—"প্রমাণৈরর্থপরীক্ষণং ন্যায়ঃ প্রত্যক্ষাগমাশ্রিতমনুমানং সোঽন্বীক্ষা, প্রত্যক্ষাগমাভ্যামীক্ষিতস্য অনু ইক্ষণমন্বীক্ষা, তয়া প্রবর্ত্ততে ইত্যান্বীক্ষিকী ন্যায়বিদ্যা ন্যায়শাস্ত্রং।" অর্থাৎ—কতকগুলি প্রমাণদ্বারা পদার্থের পরীক্ষাই ন্যায়, প্রত্যক্ষ ও আগম প্রমাণের অনুমোদিত অনুমানই প্রকৃত ন্যায়শব্দের বাচ্য, তাহাই অন্বীক্ষা। প্রত্যক্ষ ও শব্দপ্রমাণদ্বারা পদার্থের জ্ঞান হওয়ার পরে যে জ্ঞান হয়, তাহাকে অন্বীক্ষা বলে; তাহাকে অবলম্বন করিয়া প্রবর্ত্তিত হইয়াছে, এই হেতু আন্বীক্ষিকী ন্যায়বিদ্যা বা ন্যায়শাস্ত্র। ইহা হইতেই বুঝিতে পারা যাইতেছে যে, গৌতম-সূত্র-সমষ্টিকে ন্যায়দর্শন-নামে কেন বলা হয়?*

গৌতমসূত্রের ন্যায়-নামের কারণ। অনুমানে শ্রেষ্ঠতাই হেতু।

আন্বীক্ষিকী দুই প্রকার।

ভগবান্ মনু আন্বীক্ষিকী শব্দে 'আত্মবিদ্যা' বিশেষণ দিয়া বিশেষিত করায় ও মোক্ষধর্ম্মে 'পরা' বিশেষণ দ্বারা নির্ব্বাচিত করিয়া দেওয়ায়, বোধ হয়, অনাত্ম-বিদ্যা অপরা আন্বীক্ষিকী আর একটী আছে, যাহাকে লোকে চলিত ভাষায় 'পৌরুষেয় বিদ্যা'-বিশেষ বলিয়া থাকে। হয়ত এই কারণেই সাংখ্য-পাতঞ্জলাদির ন্যায় জনসমাজে ন্যায়দর্শনের ততটা সুলভ প্রচার হয় নাই।

ন্যায়দর্শনের অপ্রচার হওয়ার কারণ।

তাই বলিয়া ন্যায়দর্শনটী একেবারে উড়াইয়া দিবার জিনিষ নহে; কারণ ন্যায়দর্শনের

---

* "ননু প্রমাণাদিষোড়শপদার্থে প্রতিপাদ্যমানে কথমিদং ন্যায়শাস্ত্রমিতি? সত্যং—তথাপি অসাধারণেন ব্যপদেশা ভবন্তীতি ন্যায়েন ন্যায়স্য পরার্থানুমানাপরপর্য্যায়স্য সকলবিদ্যানুগ্রাহকতয়া সর্ব্বকর্ম্মানুষ্ঠানসাধনতয়া প্রধানত্বেন তথা ব্যপদেশো যুজ্যতে। তথাহভাণি সর্ব্বজ্ঞেন, সোঽয়ং পরমো ন্যায়ঃ বিপ্রতিপন্নপুরুষ-প্রতিপাদকত্বাৎ তথা প্রবৃত্তি-হেতুত্বাচ্চেতি।" সর্ব্বদর্শনসংগ্রহে মাধবাচার্য্য বলিয়াছেন,—

'আচ্ছা, এই শাস্ত্রে ত প্রমাণাদি ষোড়শ পদার্থই প্রতিপাদিত হইয়াছে, তবে কি করিয়া ইহাকে কেবল ন্যায়-শাস্ত্রই বলা হয়? হাঁ, ইহা সত্য, তাহা হইলেও "ব্যবহারটা বিশেষভাবকে অবলম্বন করিয়াই হইয়া থাকে" এই ন্যায়ানুসারে পরার্থানুমান-নামক-ন্যায়টা সকল বিদ্যার সহায় ও সপ্তপ্রকার কর্ম্মানুষ্ঠানের উপায় বলিয়া প্রধান, সুতরাং তার নামেই শাস্ত্রের নামকরণ করিয়া ব্যবহার করা যুক্তিসঙ্গত। সর্ব্বজ্ঞ সে কথা বলিয়াছেন,—'সেই উৎকৃষ্ট প্রধান ন্যায় এই, কারণ সন্দিগ্ধপুরুষের সন্দেহাপনোদক ও সর্ব্বকর্ম্মে প্রবৃত্তি হওয়ার হেতু এই ন্যায়ই।'

ন্যায়দর্শনের বিশেষ আবশ্যক।

প্রধান প্রতিপাদ্যবিষয় ন্যায়—অবশ্য মুক্তির অপেক্ষায় বলিতে হইবে। সেই মুক্তি তত্ত্বজ্ঞান দ্বারা হয়, যোগানুষ্ঠানে সিদ্ধিলাভ হইলে তত্ত্বজ্ঞান হয়, যোগানুষ্ঠান করিতে হইলে ধারণাদির জন্য কোন কোন বিষয় বিশেষভাবে নির্ব্বাচিত হওয়া আবশ্যক, বিষয় নির্ব্বাচন করিতে হইলে, বেদের অবিরোধে প্রবর্ত্তিত তর্কোপকরণক অনুমানাদির আশ্রয় লইতে হয়, এবং তর্কসনাথ-অনুমানে ব্যুৎপত্তিলাভ করিতে হইলে এই ন্যায়দর্শনের হাতে আসিয়া পড়িতে হয়। যিনি ন্যায়শাস্ত্রের অনুগ্রহ-লাভে বঞ্চিত, তিনি নব নব বিষয়ের উদ্ভাবনে নিতান্ত অপরিপটু। মহানুভব মধুসূদন-সরস্বতী ন্যায়শাস্ত্রের কৃপার পাত্র ছিলেন বলিয়া অদ্বৈতসিদ্ধিপ্রভৃতি-গ্রন্থে মুনিমনোমোহন নূতন নূতন পদার্থ করামলকবৎ প্রত্যক্ষভাবে প্রতিপাদিত করিয়া গিয়াছেন।

ন্যায়-বিদ্যার ফল।

তবে যে কেহ কেহ বলিয়া থাকেন, প্রাচীন ন্যায় অপেক্ষা নব্যন্যায়ের ভাষা ইচ্ছাকৃত-জটিলতা ও দুরধিগম্যতা দোষে দূষিত; সেটী তাঁহাদের বুঝিবার দোষ, ইচ্ছাকৃতজটিলতা বা দুরধিগম্যতার দোষে নহে। কেননা ন্যায় যে পদার্থের উপর আধিপত্য বিস্তার করিয়া ছাড়িয়া দিবে, তাহার উপর অন্যায়ের ত্রস্ত দৃষ্টিও পতিত হইবে না; সুতরাং সাঁড়াশী দিয়া ধরার ন্যায় ন্যায়ভাষায় পদার্থকে ধরিতে হইবে। সাধারণ ভাষায় কোন একটী পদার্থকে বেশ বেড় দিয়া ধরিবার উপায় নাই। 'ঠারে ঠোরে' বুঝাইয়া দেওয়া যায় এইমাত্র, তাহার আর এক প্রকারেও ব্যবহার হইতে পারে, এক্ষেত্রে সেরূপে বেড় দিয়া পদার্থকে প্রগাঢ় আলিঙ্গনে আলিঙ্গিত না করিতে পারিলে, পদার্থনির্ব্বাচন কিরূপে হইবে? এইজন্য অবিচ্ছিন্নশৃঙ্খলের ন্যায় ন্যায়ের ভাষা প্রণয়ন করিতে হইয়াছে।

ন্যায়ের ভাষা ইচ্ছাকৃত-জটিল নহে।

সাধারণ ভাষা দ্ব্যর্থ ত্র্যর্থাদি হইতে পারে। ন্যায়ের ভাষা সেরূপ হইলে পদার্থ-নির্ব্বাচন হওয়া অসম্ভব।

আমার বোধ হয়, যদি ন্যায়ের কিছু গৌরব থাকে, তবে সেই অভেদ্যভাষায় বা দুরধিগম্য-প্রকারতা প্রতিযোগিতা অবচ্ছেদকতা প্রভৃতি দুর্ভেদ্য অকাট্য উৎকট শব্দে ও তাহার বহুল প্রচারকারী মহানুভব মুনিকল্প ব্যক্তিবর্গের লেখনিমুখে এবং ন্যায়সাম্প্রদায়িকের কুটিল অধ্যবসায়েই সেই গৌরব প্রতিভাত।

ভাষামাত্রই কতকগুলি সাঙ্কেতিক শব্দমাত্র। সে সঙ্কেত জানিলে তাহার রস পাওয়া যায়; কিন্তু যে জানে না, সে কি করিয়া তাহার রস পাইবে? তাহাকে অগত্যা দ্রাক্ষাপ্রার্থী হতাশ্বাস শৃগালের ন্যায় অতি উপাদেয় পদার্থেও দোষারোপ করিয়া ফিরিতে হয়। সঙ্গীত যাহার প্রিয় নয়, সে লোক নাই বলিলে অত্যুক্তি হয় না; অথচ সা-রি-গা মা-য় লিখিত কোন একটী গান পড়িয়া কেহই আনন্দিত হইতে পারিবে না। আমরা স্বরলিপি জানি না বা বুঝিতে পারি না, তাই স্বরলিপির আবিষ্কারক ভয়ঙ্কর কুটিল ছিলেন বলিতে হইবে? সেইরূপ ইংরাজি, জর্ম্মাণ, ফরাসি ও রুষভাষা আমরা জানি না বা বুঝিতে পারি না, তাই বলিয়া কি ঐ ঐ ভাষায়

প্রত্যেক ভাষাই কতকগুলি সাঙ্কেতিক শব্দমাত্র।

সৃষ্টিকর্ত্তা ইচ্ছাকৃত দুর্ব্বোধকারিতাদোষে দূষিত? পক্ষান্তরে তাহাদের নিকট আমাদের ভাষার সৃষ্টিকর্ত্তাও ঐ দোষের হাত ছাড়াইবেন কি করিয়া? ও ভাষাটা কঠিন, কি না, আমি ও ভাষাটা জানি না, অর্থাৎ—আমি ও ভাষাটায় নিতান্তই হস্তিমূর্খ, এ একই কথা।

ন্যায়-বিদ্যা ও ইক্ষুযষ্টি বেশী পীড়াপীড়ি না করিলে সমস্ত রস দেয় না।

ন্যায়বিদ্যা, ইক্ষুযষ্টি ও তন্বী-যুবতী, এই তিনজন প্রায় সমান। মন্দাক্রান্ত হইলে ইহার মধ্যে কেহই সমগ্র রস বিতরণ করেন না। এস্থলে একটী উদ্ভটকবিতার প্রাসঙ্গিক কথা উত্থাপন করা নিতান্ত রস-ভঙ্গের কারণ হইবে না। একটী নবীনা বয়স্যা তার সহচরীর স্বামীকে বলিয়াছিল—

"তন্বী শ্যামা মৃদুতনুরিয়ং ত্যজ্যতামত্র শঙ্কা, কাচিদ্দৃষ্টা ভ্রমরভরতো মঞ্জরী ভিদ্যমানা?
তস্মাদেষা রহসি সময়ে নির্দ্দয়ং পীড়নীয়া, মন্দাক্রান্তা বিতরতি রসং নেক্ষুযষ্টিঃ সমগ্রং॥"

আমরাও সেইরূপ বয়স্যের স্থানে দাঁড়াইয়া আমাদিগের সহচরের 'হেডম্যান'কে বলি—মন্দাক্রান্তা বিতরতি রসং ন্যায়বিদ্যা সমগ্রং?

রসোপভোগ করিতে হয়, উৎকট পরিশ্রম করিয়া শিক্ষা করিতে হইবে। রসগোল্লার ন্যায় পদার্থ-নির্ব্বাচন করিতে পারিলে বড় ভালই হইত, কিন্তু পদার্থনির্ব্বাচনের পাক চড়াইবার সময় ন্যায়পাচকগণ যখন অত্যন্ত ভ্রম করিয়াছেন, তখন আর উপায় কি? বাধ্য হইয়া চালভাজা চর্ব্বণের ন্যায় ন্যায়ভাষা চর্ব্বণ করিতে হইবে।

ন্যায় অত্যাজ্য।

ন্যায়ের চর্চ্চা পরিত্যাগ করিতে হইলে, সংসার হইতে ন্যায় অন্যায় কথা আগে উঠাইতে হয়, ন্যায় ও অন্যায় ব্যবহারও ছাড়িতে হয়; সুতরাং ন্যায়চর্চ্চা বাধ্য হইয়া করিতে হইবে। ন্যায় মানুষকে ন্যায্যপথ দেখাইয়া অন্যায়ের দিকে যাইতে দেয় না, ন্যায়ের পথেই প্রবর্ত্তিত করে; প্রত্যেক বিষয়ের দোষগুণ সম্মুখে উপস্থিত করিয়া দেয়; তখন মানব পদে না চলিয়া চক্ষুতে ভর দিয়া চলিতে থাকে। পদে চলিলে পতন অবশ্যম্ভাবী; কিন্তু চক্ষুতে ভর দিয়া চলিলে পতনের সম্ভাবনা থাকে না। গোতম চক্ষুতে ভর দিয়া চলিয়াছিলেন বলিয়া তাঁহার পতন হয় নাই, আর পতন হয় নাই বলিয়া 'বেদব্যাসের' ন্যায় তিনিও 'অক্ষপাদ' উপাধি দ্বারা বিভূষিত হইয়াছিলেন।

গোতমের অক্ষপাদ-উপাধিলাভের কারণ নির্দ্দেশ।

গোতমের কলঙ্ক।

তিনি উপাধিভূষিত হইলেও অন্যসাপ্রদায়িকের নিকট তাঁহার অর্দ্ধশক্তি লক্ষ্যভ্রষ্ট হইয়া ব্যভিচারদোষে দূষিত হইয়াছিল বলিয়া তৎকালে প্রসিদ্ধি হইয়াছিল। ইন্দ্র বা আত্মা সেই ব্যভিচারের কর্ত্তা, অর্দ্ধশক্তি অহল্যা সেই ব্যভিচারের আশ্রয়, গোতমের তপশ্চর্য্যার কাল সেই ব্যভিচারের সময়, আর অর্দ্ধশক্তির সতীধর্ম্মে কলঙ্কারোপ সেই ব্যভিচারের গৌণফল এবং সেই অর্দ্ধশক্তির জড়ত্বই মুখ্যফল। আবার যখন পূর্ণব্রহ্ম সনাতন শ্রীরামচন্দ্রের পাদস্পর্শ তখন সেই জড়তার

কলঙ্কভঞ্জন।

তিরোধান; এগুলি মহামুনি-গোতমের জীবনগগনে ব্যবহারঝঞ্ঝা-বায়ুর বিকটক্রীড়া। ইহাদ্বারা বোধ হয়—শ্রীরামচন্দ্রের সাক্ষাৎকার-লাভের পর মহামুনি গোতম নূতন ভাব-রাজ্যে উপনীত হইয়াছিলেন ও আত্মার জড়ত্ববাদ ভুলিয়া চিন্ময়বাদে উপস্থিত হইয়াছিলেন, বোধ হয়, সেই সময়েই

সংহিতা-রচনার কারণ।

অর্দ্ধশক্তির অকারণ অপব্যয় দেখিয়া স্মৃতিসংহিতা প্রণয়ন করেন ও তাহার রাজব্যবহারাধ্যায়ে নিজকৃত আন্বীক্ষিকীর উপযোগ দেখাইয়া দেন।*

বাস্তবিক অনাত্মবিচারপ্রবণ-আন্বীক্ষিকী-বিদ্যার গ্রহণ-বিষয়ে মনুযাজ্ঞবল্ক্যাদি মহর্ষিগণ বলিয়াছেন, উহাতে রাজারই বিশেষ আবশ্যক, † কেন না, ন্যায্য-

অনাত্মবিদ্যা আন্বীক্ষিকীতে রাজার অধিকার।

বিচার করিতে রাজাই সমধিক দায়ী। তবে অধ্যাত্মবিদ্যাও রাজার নিতান্ত পরিহার্য্য নহে বলিয়া ভগবান্ মনু "আত্মবিদ্যা আন্বীক্ষিকীও" এইরূপ অর্দ্ধোক্তি করিয়াছেন।

এই আন্বীক্ষিকী শব্দটী অতিপ্রাচীন মনুসংহিতায় আছে দেখিয়া কেহ কেহ অনুমান করেন, গোতমের পূর্ব্বেও ন্যায়দর্শন প্রচলিত ছিল। তাঁহাদের

গোতমের কাল-নির্ণয়।

এবম্বিধ অনুমান নিন্দনীয় না হইলেও প্রশংসীয় নহে, কেননা, কোন মত বা আবিষ্কার এই প্রথম হইল, এ কথা বলিবার উপায় নাই; যেহেতু বেদ সর্ব্বজ্ঞানের আকর, বেদমধ্যে নাই এরূপ মত, বা তাহার খণ্ডনপ্রণালী, কিম্বা

বেদে সকল মতই আছে।

কোন আবিষ্কার, বোধ হয় কেহই দেখাইতে পারিবেন না। আর্য্যমতই বল, আর অনার্য্যমতই বল, সমস্তই বেদমধ্যে আছে ও তাহাই অবলম্বন করিয়া আর্য্যগণ দলবিচ্যুত, প্রশস্তপথপরিভ্রষ্ট ও স্বতন্ত্রমতাবলম্বী বলিয়া বিখ্যাত হইয়াছেন। ক্রমশঃ সেই মতগুলি লইয়া যখন যিনি প্রবল 'তোল্‌পাড়্' করিয়া নাম

সে মত ব্যক্তিবিশেষের হইবার কারণ।

পাড়িতে পারিয়াছেন, তিনিই নিজনামে সেই মত চালাইয়া গিয়াছেন বা চলিয়াছে। সুতরাং গোতমের কালনির্ণয় করিতে যাইয়া তৎকৃতসূত্রমধ্যে অনার্য্যমতবাদ দেখিয়া নাসিকাকুঞ্চনপূর্ব্বক তাঁহার নবীনত্ব স্থির করিতে যাওয়ায় অজ্ঞতাই প্রকাশ হইয়া পড়ে। আবার মনু যে অত প্রাচীন তাহাতে আন্বীক্ষিকীর নাম দেখিয়া গোতমকে অতিপ্রাচীন মনে করাও

আন্বীক্ষিকী প্রাচীন শব্দ।

নিতান্ত কম বিড়ম্বনার বিষয় নহে। যাঁহারা এই উভয় দেখিয়া গোতমের কাল নির্ণয় করিতে 'প্রয়াসবাহুল্য স্বীকার করা বৃথা' মনে করেন, তাঁহারা নিশ্চয়ই

---

* "রাজা সর্ব্বস্যেষ্টে ব্রাহ্মণবর্জ্জং, সাধুকারীস্যাৎ সাধুবাদী, ত্রয্যাং আন্বীক্ষিক্যাঞ্চাভিবিনীতঃ।" গোঃ সং ১১ অঃ।

† "স্বরাষ্ট্রগোপ্তান্বীক্ষিক্যাং দণ্ডনীত্যাং তথৈব চ।
বিনীতস্ত্বথ বার্ত্তায়াং ত্রয্যাঞ্চৈব নরাধিপঃ॥" ১।৩১০ যাজ্ঞবল্ক্য।
"ত্রৈবিদ্যেভ্যস্ত্রয়ীং বিদ্যাং" ইত্যাদি। মনু ৭।৪৩।

ভারতাদি প্রমাণ নহে।

অনার্য্য ম্লেচ্ছমতের পক্ষপাতী বা আপ্তোপদেশে বীতশ্রদ্ধ। রামায়ণ ও মহাভারতে গোতমের কালনির্ণায়ক যথেষ্ট প্রমাণ পাওয়া যায়, বোধ হয় সেগুলিকে তাঁহারা প্রমাণ বলিয়া মনে করেন না। তাঁহাদের নিকট সেগুলি প্রমাণরূপে গৃহীত হইলে, তাঁহারা এ সন্দেহে পতিত হইবেন কেন? অবশ্য হইতে পারে, যে অতি সামান্য পড়িয়াছে, সে কিছুই প্রমাণ বলিয়া মানিবে না; কিন্তু যে অতিবিস্তর পড়িয়াছে বলিয়া নিজ মর্য্যাদার সীমা আছে স্বীকার করে না ও করিতে দেয় না, সে কোন্ মুখে সেই সকল মহা প্রামাণিক অপূর্ব্ব গ্রন্থগুলিকে উপেক্ষা করিতে চাহে বুঝিতে পারি না।

ত্রেতার গোতম।

রামায়ণে ও মহাভারতে শ্রীরামচন্দ্রের সমসাময়িক বলিয়া গোতমমুনিকে আমরা ত্রেতাযুগে দেখিতে পাই। শ্রীরামচন্দ্রের সাক্ষাৎকারলাভই যে গোতমের মত পরিবর্ত্তনের হেতু, তাহা আমি পূর্ব্বেই উল্লেখ করিয়াছি।* অতএব আমরা নিঃসংশয়ে স্থির করিতে পারি যে, গোতম ত্রেতা-যুগের অবতার শ্রীরামচন্দ্রের সমসাময়িক লোক।

সাহেবের মত।

জন ডেভিস্ সাহেবও ন্যায়ের সংক্ষিপ্ত বিবরণমধ্যে সেইরূপ অভিমত প্রকাশ করিয়াছেন। অধিকন্তু বলিয়াছেন, অহল্যা ব্রহ্মকন্যা ছিলেন, তিনি যখন গোতমের প্রণয়িনী, তখন অন্য কথা বাদ দিলেও গোতম যে নিশ্চয় ব্রাহ্মণ ছিলেন, একথা বলিতে পারা যায় ও সে অনুমান নিতান্ত ভ্রান্তিসঙ্কুল হইতে পারে না। (?)

সংহিতাকার গোতম ও গোত্র-প্রবর্ত্তক গোতম এক।

তাহার পর কেহ কেহ বলেন, গোত্রপ্রবর্ত্তক গোতম ও সংহিতাকার গোতম এক নহে। জিজ্ঞাসা করি—কেন এক নহে? মনুসংহিতা-প্রণেতা ভৃগুর মতাবলম্বী লোকগণ ভৃগুগোত্রে, কাত্যায়নসংহিতা-প্রণেতা কাত্যায়নের অধীন মানবগণ কাত্যায়নগোত্রে, পরাশরসংহিতা-প্রণয়নকারী পরাশরমুনির বশীভূত সকলে পরাশরগোত্রে ও বশিষ্ঠসংহিতার রচয়িতা বশিষ্ঠ-দেবের পক্ষপাতী লোকেরা সেই বশিষ্ঠগোত্রে পরিচিত হইতে পারিল, আর গোতমসংহিতার রচয়িতা গোতম এমন কি অপরাধ করিয়াছিলেন যে সকলেই তাঁহার উপর চটিয়া তাঁহাকে গোত্রপ্রবর্ত্তক বলিয়া স্বীকার করিল না? বশিষ্ঠ ও ভরদ্বাজ শ্রীরামচন্দ্রের সমসাময়িক, ভৃগু কিছু প্রাচীন; ইঁহাদিগের এক একটী দল ছিল, যে দল ইঁহাদিগের "দোহাই" দিয়া সকল স্থানেই

---

* যেমন দেহের গুণ জরবিকারাদি, সেইরূপ জ্ঞান ও চৈতন্য আত্মার ধর্ম্ম বা গুণ, গোতম প্রথমে ইহা স্বীকার করিয়া ন্যায়দর্শন প্রণয়ন করেন। পরে তিনি বর দিয়া অর্দ্ধশক্তি অহল্যার জড়ত্ব লোপ করিয়া দেন; অর্থাৎ জ্ঞান ও চৈতন্য আত্মধর্ম্ম নহে, আত্মা জ্ঞানময় চৈতন্যস্বরূপ, এরূপ স্বীকার করেন। শ্রীরামচন্দ্রের সহিত গোতমের বিচার সম্বন্ধে প্রায় সকলেই অভিজ্ঞ আছেন। ঐরূপ স্বীকার করা সেই বিচারের ফল বলিয়া বোধ হয়। পুরাণের এ গুলি গূঢ়ার্থ।

পরিচিত হইতে পারিত ; আর গোতম যে প্রতিভাবলে ন্যায়দর্শন ও স্মৃতিসংহিতা প্রণয়ন করিয়াছিলেন, সেই প্রতিভাবলে যে তিনিও একটী দল বাঁধিয়াছিলেন এবং সে দল তাঁহার নামেই যে পরিচিত হইয়াছিল, ইহা ভাবিয়া স্থির করিতে যাইলে কি মহাপাতকের দায়ী হইতে হইবে, না,—সত্যানুসন্ধানের পুণ্যফলে প্রশংসার পাত্র হইতে হইবে ?

গোতমদল।

সে যাহাই হউক, ত্রেতাযুগে মহর্ষি গোতম ন্যায়দর্শন প্রণয়ন করিয়া অক্ষপাদ উপাধিদ্বারা ভূষিত হইয়াছিলেন এবং সংহিতা রচনা করিয়া যাহাদিগকে সমাজ-বন্ধনে বাঁধিয়াছিলেন, তাহাদিগের নিকট অতি প্রতিভাবান্ গোত্রের—পর্ব্বতের ন্যায় প্রতীয়মান হইয়া সকলদেশে সকলের নিকটেই প্রাধান্যলাভ করিয়াছিলেন, পরিশেষে তিনিই সর্ব্বস্থলে গোত্রকাররূপে পরিচিত হইয়াছিলেন, ইহাই স্বাভাবিক বিশ্বাস ও উক্তপ্রমাণের কঠোরশাসনের দুষ্পরিহার্য্য ফল।

ফলিতার্থ।

সুতরাং মহর্ষি অক্ষপাদ গোতম ভারতের যে কোন অংশের লোক, তাহার নির্ণয় নিতান্ত দুরূহ নহে। কারণ রামায়ণ ও মহাভারত পাঠ করিলে জানিতে পারা যায়, বর্ত্তমান ছাপরা জেলার মধ্যে একটী অরণ্যকল্পস্থানে ভগবান্ গোতমের আশ্রম ছিল। এখনও সে দেশে প্রবাদ-পরম্পরায় চলিয়া আসিতেছে যে, মহর্ষি গোতম ঐ স্থানে থাকিয়া ন্যায়দর্শন রচনা করিয়াছিলেন। অতএব এই প্রবাদটী ঐতিহ্য প্রমাণ, ইহার সাহায্যকারী উক্ত রামায়ণ মহাভারত ; তারপর ঐ স্থানে বর্ষে বর্ষে গোতমের নামে একটী মেলা বসিয়া থাকে, কতকগুলি ভদ্রলোক মিলিয়া অনধিক ৪০ বৎসর হইল তথায় একটী মঠ নির্ম্মাণ করিয়া দিয়াছেন, তথায় একজন নৈয়ায়িক পণ্ডিত এবং কতিপয় ছাত্র বৃত্তি পাইয়া অধ্যয়ন ও অধ্যাপনা করিতেছেন।

গোতমের বাসভূমি।

আর্য্যধর্ম্মাভিমান বজায় রাখিতে হইলে শ্রীরামচন্দ্রকে ত্রেতার অবতার বলিয়া মানিতে হইবে ও শ্রীরামচন্দ্রের সমসাময়িক মহর্ষি অক্ষপাদ-গোতম পূর্ব্বোক্ত স্থানে বাস করিতেন, ইহাও মানিতে হইবে। আর সেই সময়ে বা তাহার কিছু পূর্ব্বে যে গোতম ন্যায়দর্শন রচনা করিয়াছিলেন, ইহাও মানিতে হইবে। সেই গোতমই গোত্রপ্রবর্ত্তক ও সংহিতাকার বলিয়া প্রসিদ্ধ। তৎপ্রণীত ন্যায়দর্শন কতকগুলি সূত্রের সমষ্টিমাত্র।

ন্যায়দর্শন-রচনার কালনির্ণয়।

বর্ত্তমানসময়ে আমরা সেই সূত্রসমষ্টির যে ভাষ্যগ্রন্থের পঠনপাঠন করিয়া থাকি, তাহা বাৎস্যায়ন প্রণীত। ইনিই চাণক্য পণ্ডিত নামে খ্যাত। বিশাখদত্ত বিরচিত মুদ্রারাক্ষস নাটকে বাৎস্যায়নের যথেষ্ট পরিচয় পাওয়া যায়। তথায় ইহাকে কখনও কখনও মল্লনাগ, কৌটিল্য, চণকাত্মজ, চাণক্য, দ্রমিল, পক্ষিলস্বামী, বিষ্ণুগুপ্ত ও অঙ্গুল নামে নির্দ্দেশ করা হইয়াছে। সর্ব্বদর্শন-টীকাকার বাচস্পতিমিশ্র তাৎপর্য্যটীকায় স্থানে স্থানে 'পক্ষিল

ভাষ্যকার বাৎস্যায়ন

বাৎস্যায়নের আট নাম।

স্বামী ইহা বলিয়াছেন' বলিয়া ইঁহার কথা তুলিয়াছেন। মাধবাচার্য্যও স্থানে স্থানে সর্ব্বদর্শন-সংগ্রহ মধ্যে 'পক্ষিল স্বামীও তাহাই বলেন' বলিয়া ভাষ্যের কথা প্রমাণরূপে ব্যবহার করিয়াছেন। সুতরাং পক্ষিল-স্বামী বাৎস্যায়নের অপর একটী নাম, ইহা নিশ্চয় প্রতিপন্ন হইতে পারে। এই মহাত্মাই হিতোপদেশের বিষ্ণুশর্ম্মা ও শব্দশাস্ত্রের কৌটিল্য বলিয়া প্রসিদ্ধ। ইনিই প্রাচীন নন্দবংশের ধ্বংস করিয়া মৌর্য্যবংশীয় চন্দ্রগুপ্তকে নন্দবংশের সিংহাসনে অধিরূঢ় করেন। বিষ্ণুপুরাণাদির মতে ইনি প্রায় ২৪০০ দুই হাজার চারিশত বৎসর পূর্ব্বের লোক। মগধদেশ বাৎস্যায়নের জন্মভূমি, পিতার নাম চণকদেব, জাতি ব্রাহ্মণ, বাৎস্য গোত্র।

২৪০০ বৎসর পূর্ব্বের লোক বাৎস্যায়ন।

বাৎস্যায়নভাষ্যের বার্ত্তিকরচয়িতা উদ্যোতকর মিশ্র। ইনি প্রায় ১৭০০ একহাজার সাতশত বৎসর পূর্ব্বে মিথিলামণ্ডলে আবির্ভূত হন। উদ্যোতকরের ন্যায়বার্ত্তিক ইতঃপূর্ব্বে দুষ্প্রাপ্যতর ছিল, কিন্তু পণ্ডিতবর বিন্ধ্যেশ্বরীপ্রসাদ দ্বিবেদী মহোদয়ের যত্ন ও অনুসন্ধানের ফলে তাহা সুপ্রাপ্যতম হইয়াছে। বৌদ্ধমতাবলম্বী, দুষ্টব্যাখ্যানকার, কুতার্কিক দিঙ্‌নাগের অজ্ঞান-নিবৃত্তির জন্য উদ্যোতকর মিশ্র এই বার্ত্তিক-নিবন্ধ রচনা করেন। মহামহোপাধ্যায় বাচস্পতি মিশ্র উক্ত বার্ত্তিকের—

বার্ত্তিককার উদ্যোতকর মিশ্র।

বৌদ্ধ দিঙ্‌নাগ।

"যদক্ষপাদঃ প্রবরো মুনীনাং, শমায় শাস্ত্রং জগতো জগাদ।
কুতার্কিকাজ্ঞাননিবৃত্তি-হেতোঃ, করিষ্যতে তস্য ময়া নিবন্ধঃ॥"

এই শ্লোকটীর ব্যাখ্যাকালে বলিয়াছেন—'মুনিপ্রবর অক্ষপাদ গোতম জগতের শান্তির জন্য যে শাস্ত্র রচনা করিয়াছিলেন, কূটবুদ্ধি দিঙ্‌নাগ তাহার দুষ্টব্যাখ্যা প্রচারিত করিয়া সাধারণের সহিত নিজেও প্রতারিত হইতেছে, সুতরাং সেই কুতার্কিকের অজ্ঞাননিবৃত্তির জন্য উদ্যোতকর এই নিবন্ধপ্রণয়ন করেন'। এতদ্দ্বারা বুঝিতে পারা যায়, উদ্যোতকর ও দিঙ্‌নাগ এক সময়ের লোক। নতুবা 'কুতার্কিকের অজ্ঞান নিবৃত্তির জন্য' একথা বলা চলে না। কারণ জীবিতের অজ্ঞাননিবৃত্তির জন্য প্রবন্ধ লেখা যায় বটে; কিন্তু মৃতের অজ্ঞাননাশের জন্য প্রবন্ধ লেখা নিতান্তই অসম্ভব। মৃতের অজ্ঞাননাশের জন্য কোন নিবন্ধাদি লিখিত হইলে, সেই নিবন্ধ ও নিবন্ধলেখক, এই উভয়কে যমের বাড়ী যাইয়া মৃত প্রতিপক্ষকে সেই নিবন্ধ দেখাইয়া আসিবার প্রয়োজন হয়। অতএব "মৈথিল উদ্যোতকর ১৭০০ বৎসরের কিছুকাল পরে মিথিলা জনপদে প্রাদুর্ভূত হন" একথা ঠিক নহে; বরং ইহা ঠিক যে দিঙ্‌নাগের সময়ে মৈথিল উদ্যোতকর তাহার দুর্ব্যাখ্যার প্রচার দেখিয়া প্রতিপক্ষ হইয়া দাঁড়াইয়াছিলেন, এবং সভাসমিতিতে সামান্যসময়ের জন্য কেবল শূন্যসার-শব্দময়-বিচার-দ্বারা সে প্রতিপক্ষতা পর্য্যাপ্ত হয় নাই, অনন্তকালের জন্য নিবন্ধাকারে প্রতিষ্ঠাপিত হইয়াছিল।

উদ্যোতকর ও দিঙ্‌নাগ সমসাময়িক লোক।

সমসাময়িকতার কারণ নির্দ্দেশ।

উদ্যোতকরের বাক্যদ্বারা প্রকাশ হইতেছে যে, বার্ত্তিক-নিবন্ধ-রচনার হেতু ঐ কুতার্কিকের

বার্ত্তিক-রচনার কারণ।

অজ্ঞাননিবৃত্তি করা মাত্র। একটী লোকের অজ্ঞান নিবৃত্তি করিবার জন্য এত প্রয়াস স্বীকার করা কখন হইতে পারে? না,—যখন বাদবিসম্বাদ চরমসীমায় পৌঁছায়। এহেতু আমাদিগের বোধ হয় উদ্যোতকর, দিঙ্‌নাগের জীবিতাবস্থায় তাঁহার অজ্ঞাননাশের জন্য বার্ত্তিক-নিবন্ধ লিখিয়াছিলেন, সেই ভঙ্গীই বাচস্পতিমিশ্র তাৎপর্য্যটীকায় অভিব্যক্ত করিয়াছেন যথা :—

বার্ত্তিকরচনার ফল।

"অথ ভগবতা অক্ষপাদেন নিঃশ্রেয়সহেতৌ শাস্ত্রে প্রণীতে ব্যুৎপাদিতে চ ভগবতা পক্ষিলস্বামিনা কিমপরমবশিষ্যতে? যদর্থং বার্ত্তিকারম্ভ ইতি শঙ্কাং নিরাচিকীর্ষুঃ সূত্রকারোক্তপ্রয়োজনানুবাদপূর্ব্বকং বার্ত্তিকারম্ভপ্রয়োজনং দর্শয়তি যদক্ষপাদ ইতি। যদ্যপি ভাষ্যকৃতা কৃতব্যুৎপাদনমেতৎ, তথাপি দিঙ্‌নাগপ্রভৃতিভিরর্ব্বাচীনৈঃ কুহেতুঃ-সন্তমস-সমুত্থাপদেনাচ্ছাদিতং শাস্ত্রং ন তত্ত্বনির্ণয়ায় পর্য্যাপ্তমিত্যুদ্যোতকরঃ স্বনিবন্ধোদ্যোতেন তদপনীয়তে ইতি প্রয়োজনবানয়মারম্ভ ইতি।"

(অর্ব্বাচীন শব্দটা গালাগালির পর্য্যায়ক, যেমন—সেটা বড় অর্ব্বাচীন ত!)

এ দিঙ্‌নাগ কালিদাসের প্রতিপক্ষ দিঙ্‌নাগ হইতে ভিন্ন লোক। সে দিঙ্‌নাগ এতদপেক্ষা ২৬২ দুইশত বাষট্টি বৎসর পূর্ব্বে উজ্জয়িনীমণ্ডলে প্রাদুর্ভূত হইয়াছিলেন। কালিদাসের প্রতিপক্ষ দিঙ্‌নাগ ১৯৬২ একহাজার নয়শত বাষট্টি বৎসর পূর্ব্বের, আর উদ্যোতকরের প্রতিপক্ষ দিঙ্‌নাগ ১৭০০ একহাজার সাতশত বৎসর পূর্ব্বের।

দিঙ্‌নাগ-দ্বয়

মহামহোপাধ্যায় বাচস্পতি মিশ্র উক্ত বার্ত্তিকের তাৎপর্য্যটীকানামে একটী টীকা রচনা করেন। মিথিলামণ্ডলান্তর্গত মকরন্দ-নামক গ্রামে বাচস্পতি মিশ্র প্রাদুর্ভূত হন। ভামতীনিবন্ধের শেষে একটী কবিতায় নিজের আবির্ভাবকাল বিজ্ঞাপনের জন্য লিখিয়াছেন—

তাৎপর্য্য-টীকাকার বাচস্পতি মিশ্র।

"নরেশ্বরা যচ্চরিতানুকারং ইচ্ছন্তি কর্ত্তুং ন চ পারয়ন্তি।
তস্মিন্মহীপে মহনীয়কীর্ত্তৌ, শ্রীমন্নৃগেঽকারি ময়া নিবন্ধঃ॥" ৬।

মহারাজ শ্রীমান্ নৃগ যে সময়ে পৃথিবীপালন করেন, আমি সে সময়ে নিবন্ধ রচনা করিয়াছি। ইহাদ্বারা বুঝিতে পারা যাইতেছে, মহারাজ নৃগেরই সমসাময়িক লোক বাচস্পতি মিশ্র। মহারাজ-নৃগ প্রায় সহস্রাধিকবৎসর পূর্ব্বে মিথিলানগরীর শোভাসম্পাদন করিয়া রাজ্যশাসন করিয়াছিলেন। অতএব মহাত্মা বাচস্পতি মিশ্র প্রায় সহস্রাধিক বর্ষ পূর্ব্বে এই তাৎপর্য্যটীকা রচনা করিয়াছিলেন। বাচস্পতি মিশ্রের দার্শনিক-কীর্ত্তি সাতটী। প্রথম মীমাংসার ন্যায়কণিকা, দ্বিতীয় ব্রহ্মতত্ত্বসমীক্ষা বেদান্তের প্রকরণ, তৃতীয় বৈশেষিকের তত্ত্ববিন্দু, চতুর্থ ন্যায়ের তাৎপর্য্যটীকা, পঞ্চম সাংখ্যের তত্ত্বকৌমুদী, ষষ্ঠ যোগের তত্ত্ববৈশারদী ও সপ্তম বেদান্তের ভামতীনিবন্ধ। ভামতী শেষে বাচস্পতি লিখিয়াছেন—

বাচস্পতির আবির্ভাব কাল।

বাচস্পতির দার্শনিক কীর্ত্তি সাতটী।

"যন্ন্যায়কণিকা-তত্ত্বসমীক্ষা-তত্ত্ববিন্দুভিঃ।
যন্ন্যায়-সাংখ্য-যোগানাং বেদান্তানাং নিবন্ধনৈঃ ॥ ৩ ॥
সমচৈষং মহৎ পুণ্যং তৎফলং পুষ্কলং ময়া।
সমর্পিতমথৈতেন প্রীয়তাম্ পরমেশ্বরঃ ॥ ৪ ॥

'ন্যায়কণিকা, তত্ত্বসমীক্ষা, তত্ত্ববিন্দু, ন্যায়, সাংখ্য ও যোগের নিবন্ধন, আর গৌরবকর, বেদান্তের নিবন্ধন দ্বারা যে যে মহৎ পুণ্য সঞ্চয় করিয়াছি, অতঃপর তাহার ফলভার আমি সমর্পণ করিলাম, ইহা দ্বারা পরমেশ্বর প্রীত হউন।'

প্রণয়নক্রমেই এরূপ লিখিত হইয়াছে, ইহা বেশ বুঝিতে পারা যায়। আর যাঁহারা এ সাতখানা গ্রন্থই পড়িয়াছেন, তাঁহারা 'উপপাদিতং ন্যায়কণিকায়াম্' ইত্যাদি "বরাত দেওয়া' দেখিয়াই ইহা হৃদয়ঙ্গম করিতে পারেন।

বাচস্পতির স্বীয়মত।

বাচস্পতি ব্রহ্মবাদী ছিলেন, তাহাও ঐ ভামতীর শেষে লিখিত কবিতা হইতে জানিতে পারা যায়, যথাঃ—"অজ্ঞানসাগরং তীর্ত্বা ব্রহ্মতত্ত্বমভীপ্সতাং।
নীতিনৌকর্ণধারেণ ময়াঽপূরি মনোরথঃ ॥২॥"

'অজ্ঞানসাগর উত্তীর্ণ করিয়া যাহারা ব্রহ্মতত্ত্ব লাভের ইচ্ছা করে, তাহাদিগের নীতিনৌকার কর্ণধার হইয়া আমি মনোরথ পূর্ণ করিয়াছি।' আবার—

"ভঙ্‌ক্ত্বা বাগ্বসুরেন্দ্র-বৃন্দমখিলাঽবিদ্যোপধানাতিগং,
যেনাম্নায়-পয়োনিধে র্ময়মথা ব্রহ্মামৃতং প্রাপ্যতে।
সোঽয়ং শাঙ্করভাষ্যজাত-বিষয়ো বাচস্পতেঃ সাদরং,
সন্দর্ভঃ পরিভাব্যতাং সুমতয়ঃ স্বার্থেষু কো মৎসরঃ ॥ ১ ॥"

আবার বলিয়াছেন—

"নাভ্যর্থ্যা ইহ সন্তঃ স্বয়ম্প্রবৃত্তা নচেতরে শক্যাঃ।
মৎসর-পিত্তনিবন্ধনম্ অচিকিৎস্যমরোচকং যেষাম্।"

'এ তত্ত্ব বুঝিবার জন্য সাধুগণের অভ্যর্থনা করিতে হইবে না, কারণ তাঁহারা আপনারাই আসিবেন, আর মাৎসর্য্যরূপ পিত্ত দোষে যাহাদিগের অচিকিৎস্য অরোচক-রোগ জন্মিয়াছে, সে ইতরেরা অভ্যর্থনীয় নহে, তাহারা আসিতেও সমর্থ নহে।'

ইহা ব্যতীত অন্য কোন স্থানে বাচস্পতি মন খুলিয়া ভাবচিত্র দেখান নাই, কেবল ভামতী নিবন্ধের শেষেই এইরূপ ভাব অভিব্যক্ত করিয়াছেন। তথাপি সে দিন সাহিত্য-পরিষৎ-সভায় শ্রীযুক্ত সতীশচন্দ্র বিদ্যাভূষণ মহাশয় মুক্তকণ্ঠে বলিয়াছেন, 'বাচস্পতির যে কি মত, তাহা বুঝিবার যো নাই।' আবার লোকে কি করিয়া নিজের মত বলিয়া থাকে, জানি না। যে কেহ মনোযোগ পূর্ব্বক উক্ত কয়টী কথা পাঠ করিলেই অনেকটা বুঝিতে পারিবেন, সন্দেহ নাই।

যাহাই হউক, বাচস্পতি যে ব্রহ্মবাদী ছিলেন, তাহা নিশ্চয় করিবার জন্য অধিক দূর যাইতে

ফলিতার্থ।

হয় না। তাঁহার গ্রন্থ-পর্য্যালোচনা, লিপিভঙ্গী ও কণ্ঠোক্তি দ্বারা প্রকাশিত হইয়া পড়ে।

প্রবাদ।

প্রথিত আছে, একদা শাঙ্করভাষ্য-প্রণয়নকালে রাত্রে প্রদীপ নির্ব্বাণ হইয়া যায়, তখন হৃদয়স্থ কল্পনাগুলি চিত্রিত হয় নাই বলিয়া সেই প্রদীপ জ্বালিবার জন্য বাড়ীর ভিতর যাইয়া বহ্নিতৃণাদির চেষ্টা করিতেছেন দেখিয়া তদীয় পত্নী ভামতীদেবী স্বামীর সহিত আজ নির্জ্জনে সাক্ষাৎ করিবার অভিপ্রায়ে অতি ব্যগ্রতা সহকারে আসিয়া প্রদীপ জ্বালিয়া দিলেন। বাচস্পতি ভামতীদেবীর বড় বিশেষ পরিচয় রাখিতেন না বা আর কখনও ভামতীর সহিত নির্জ্জনে মিলিত হন নাই; সুতরাং অপরিচিতের ন্যায় জিজ্ঞাসা করিলেন, তুমি কে?

ভাঃ—সকলে বলে আমি বাচস্পতি মিশ্রের ধর্ম্মপত্নী।

বাঃ—কি রকম, তুমি কি জান না?

ভাঃ—কি করিয়া জানিব?

বাঃ—কেন, অন্যেরা কি করিয়া জানিতে পারে?

ভাঃ—তাদের স্বামী তাদের নাম থাকিবার কাজ করে বলিয়া তারা জানিতে পারে।

বাঃ—তুমি কি তোমার নাম থাকিবার কাজ চাও?

ভাঃ—আর এখন কি আমার সে বয়স ফিরিয়া আসিবে?

বাঃ—আচ্ছা যাহাতে তোমার নাম থাকে, আমি তাহা করিব।

এই কথা বলিয়া বাচস্পতি বাহিরে আসিলেন, এবং সেই শাঙ্করভাষ্যের টীকা শ্রীমতী ভামতীদেবীর নামে উৎসর্গ করিলেন ও ভামতী নামেই তাহার নামকরণ করিলেন।

বাচস্পতির পত্নীর নাম ভামতী।

এই আখ্যানটী সত্য হইলে বাচস্পতির পত্নীর নাম ভামতী; ইহা পাওয়া যাইতে পারে।

উদয়নের তাৎপর্য্য টীকা।

বাচস্পতিকৃত-তাৎপর্য্য-টীকার তাৎপর্য্যপরিশুদ্ধি-নামে একটী টীকা আছে। কেহ কেহ বলেন, মহানুভব উদয়নাচার্য্য ৯৫০ সাড়েনয়শত-বৎসর-পূর্ব্বে মিথিলা প্রদেশস্থ করিবনগ্রামে প্রাদুর্ভূত হইয়া ঐ তাৎপর্য্যপরিশুদ্ধি ব্যাখ্যা লিপিবদ্ধ করেন। সম্বন্ধনির্ণয়াদিগ্রন্থে দেখিতে পাওয়া যায়, বারেন্দ্রবংশাবলীর পরিচয়প্রদানকালে উদয়নের নামোল্লেখ আছে।

উদয়ন সম্বন্ধে মতভেদ।

তাহাতেই আবার ন্যায়কুসুমাঞ্জলি, কিরণাবলী, বৌদ্ধাধিকার প্রভৃতি প্রসিদ্ধ প্রসিদ্ধ গ্রন্থের প্রণেতা সেই উদয়ন, ইহাও দেখিতে পাওয়া যায়। অধিকন্তু মনুর টীকাকর্ত্তা কুল্লুকভট্টও ঐ উদয়নের বংশেই প্রাদুর্ভূত, ইহাও ঘটক পদ্ধতি হইতে উদ্ধৃত-প্রমাণ-দ্বারা একরূপ প্রতিপন্ন করা হইয়াছে দেখিতে পাই। সুতরাং পূর্ব্বমত অপেক্ষা এ মতে প্রসিদ্ধ প্রমাণ পাওয়া যাইতেছে বলিয়া এইটী বেশী নিশ্চিত যে উদয়নাচার্য্য বারেন্দ্রপঙ্কজকুলের উজ্জ্বল গৌরবরবি। কিন্তু তাহা হইলে উদয়নাচার্য্য শ্রীহর্ষের পরবর্ত্তী হইয়া পড়েন, অথচ শ্রীহর্ষ তাঁহার কথা লইয়া

ব্যঙ্গাদি করিয়াছেন, ইহা খণ্ডনখণ্ডখাদ্যে দেখিতে পাই। সুতরাং উদয়নাচার্য্য প্রায় সহস্র-বর্ষের লোক বলিয়া অনুমিত হয়। তাহা হইলে উদয়নভাদুড়ী অন্য; ইনি ৮০৭ পূর্ব্বে জীবিত-বল্লালসেন দেবেরও পরবর্ত্তী।

ইহার পর আর কেহ অনেক দিন যাবৎ মূলসূত্রের উপর কোনরূপে হাত দেন নাই।

মহাত্মা গঙ্গেশ উপাধ্যায়।

তবে ঐ মূলসূত্রের প্রমাণ-ভাগ লইয়া মহাত্মা গঙ্গেশ-উপাধ্যায় চিন্তামণি-নামে একখানি প্রকরণ-গ্রন্থ রচনা করেন। উক্ত গ্রন্থের প্রতিপাদ্য প্রমাণ চতুষ্টয়ের নামেই প্রত্যক্ষ, অনুমান, উপমান ও শব্দ খণ্ডের নামকরণ হয়। এই চারিখণ্ডে প্রমাণ সম্বন্ধে যাহা কিছু জ্ঞাতব্য ছিল, সেগুলি উত্তমরূপেও প্রতিপন্ন করা হইয়াছে। এই সময় হইতেই গোতমের যথার্থ প্রতিভা বিস্তার হইতে আরম্ভ হয়। গঙ্গেশ মৈথিল ছিলেন। ইনি প্রায় ৫২৯ পাঁচশত ঊনত্রিশবর্ষ পূর্ব্বে মিথিলা প্রদেশে আবির্ভূত হন।

গঙ্গেশের পুত্র বর্দ্ধমান উপাধ্যায়ের প্রকাশ টীকা।

গঙ্গেশ উপাধ্যায়ের পুত্র বর্দ্ধমান উপাধ্যায় পিতৃপদাঙ্কানুসারী ছিলেন। তিনি চিন্তামণির প্রকাশ-নামে এক টীকা রচনা করেন। ইহার প্রাদুর্ভাবকাল ৪৯৫ বা ৪৯৬ বৎসর হইবে। তারপর চতুর্ব্বেদের ভাষ্য-কর্ত্তা নানাশাস্ত্র-সংগ্রহীতা মহাবৈদিক বিদ্যারণ্য মুনীশ্বর মাধবাচার্য্য ৪৭৯ চারিশত ঊনআশী বৎসর পূর্ব্বে মলবার দেশে আবির্ভূত হন। ইনি বিজয়-নগরের রাজমন্ত্রী ছিলেন। প্রসিদ্ধ সর্ব্বদর্শন-সংগ্রহ ইহারই একটী কীর্ত্তি বিঘোষিত করিতেছে। ইনি সর্ব্বদর্শনসংগ্রহে অক্ষপাদদর্শন নামে ন্যায়সংগ্রহ রচনা করেন। ইঁহার আবির্ভাব কাল-সম্বন্ধে সকলে এক-মত হইতে পারেন নাই। চন্দ্রশেখর বসু বলিয়াছেন ৪৫০। ভারতবর্ষের ইতিহাসের (১০১ পৃঃ) রমেশচন্দ্র দত্ত লিখিয়াছেন ১৩৩৪ খৃঃ অব্দে কর্ণাটরাজ বুক্করায় বিজয়নগরের রাজধানী স্থাপন করেন। মাধবাচার্য্য তাঁহার মন্ত্রী ছিলেন। তাহা হইলে দত্তজের মতে ৫৬০। মহারাজ কৃষ্ণদেবের মন্ত্রী হেমাদ্রির রাজপ্রশস্তি-অনুসারে কতকগুলি সংগ্রহ কালমাধব-নামক-গ্রন্থমধ্যে ব্যবস্থাপনকালে হেমাদ্রির নামোল্লেখ করায় হেমাদ্রি অপেক্ষা মাধবাচার্য্য পরবর্ত্তী লোক স্থির করিয়া কাশীস্থ সংস্কৃতকলেজের সাহিত্য-শাস্ত্রাধ্যাপক রামমিশ্র-শাস্ত্রী কল্পতরু-মুদ্রণকালে ইঁহার আবির্ভাবকাল ১৩১৩ শক বা ১৩৯২ খৃঃ অঃ স্থির করিয়াছেন। তাহা হইলে ৬১৬ বৎসর পূর্ব্বে মাধবের আবির্ভাব স্থির করিতে হয়। ইহার মধ্যে রমেশচন্দ্র দত্ত মহোদয়ের মতই সমীচীন বলিয়া বোধ হয়, কারণ তিনি একজন প্রসিদ্ধ ঐতিহাসিক বলিয়া বিখ্যাত। তিনি যাহা বলিয়াছেন, তাহার মূলে কিছু দৃঢ় প্রমাণ আছে বলিয়া আমাদিগের বিশ্বাস হয়। তাহা হইলে মাধবাচার্য্য গঙ্গেশের পূর্ব্ববর্ত্তী ও উদয়নের পরবর্ত্তী ইহাই স্থির করিতে হয়। ইঁহার মাতার নাম মাধবী দেবী ছিল।

বিদ্যারণ্য মুনীশ্বর মাধবাচার্য্য।

ইহার আবির্ভাব লইয়া মতভেদ।

বর্দ্ধমান উপাধ্যায়ের পর পক্ষধর মিশ্র চিন্তামণির আলোকনামে একটী টীকা প্রণয়ন

জয়দেব বা পক্ষধর মিশ্র।

করেন। তাঁহার প্রকৃত নাম জয়দেব। তিনি একপক্ষের দিন-পঞ্জিকা মুখে মুখে বলিতে পারিতেন বলিয়া পক্ষধর নামে খ্যাত। ৪১৯ চারিশত-উনিশ-বর্ষ-পূর্ব্বে মিথিলাপ্রদেশের অন্তর্গত দ্বারভাঙ্গা হইতে প্রায় ৮ ক্রোশ দূরবর্ত্তী সর্যপ-নামক-গ্রামে পক্ষধর জন্মপরিগ্রহ করেন।

বঙ্গের গৌরবরবি রঘুনাথ শিরোমণি।

এই সময়ে বঙ্গমণ্ডলে রঘুনাথ শিরোমণি অভ্যুত্থিত হন। যদিও রঘুনাথ বাসুদেব সার্ব্বভৌমের নিকট ন্যায়শাস্ত্র অধ্যয়ন করিয়াছিলেন, তথাপি তৎকালের প্রচলিত-রীতি-অনুসারে পাঠ-সমাপ্তির জন্য পক্ষধরের নিকট যাইয়া কিছুদিন অধ্যয়ন করিয়াছিলেন। কিম্বদন্তী আছে, রঘুনাথ পক্ষধরের চতুষ্পাঠী-

প্রবাদ।

শালায় উপস্থিত হইয়া দেখিলেন, পক্ষধর নিম্নশ্রেণীর ছাত্র হইতে উচ্চশ্রেণীর ছাত্রগণ দ্বারা ক্রমোচ্চভাবে সোপানপরম্পরা নির্ম্মাণ করিয়া আপনি সর্ব্বোচ্চ সোপানের অধিষ্ঠাতা হইয়া উচ্চপাঠী ছাত্রদিগের অধ্যাপনায় নিযুক্ত আছেন। রঘুনাথকে উপস্থিত হইতে দেখিয়া নিম্নসোপানে বসিবার অনুমতি করিলেন। রঘুনাথ তথায় বসিয়া নিম্নপাঠীদিগের সহিত শাস্ত্রীয় আলাপচ্ছলে পক্ষধরের দু'একটী মতের উপর নিজমন্তব্য প্রকাশ করিতে লাগিলেন। পক্ষধর উচ্চপাঠী ছাত্রদিগকে পাঠ দিতেছিলেন বটে, কিন্তু নবাগত রঘুনাথের প্রতি লক্ষ্য থাকায় বেশ বুঝিতে পারিলেন যে, এ লোকটী নিতান্ত তাঁহার দেশীয়-ছাত্রদিগের ন্যায় নহে। তখন তিনি রঘুনাথকে সাদরে নিকটে উঠাইয়া আনিলেন ও রঘুনাথের বিদ্যাবুদ্ধির পরিচয় লইয়া বিশেষ-পরিচয়-লাভের জন্য ব্যস্তভাবে জিজ্ঞাসা করিলেন,—

পরিহাস।

সহস্রাক্ষঃ স্মৃতঃ শক্রঃ শঙ্করস্তু ত্রিলোচনঃ।
অন্যে দ্বিলোচনাঃ সর্ব্বে কো ভবানেকলোচনঃ ?

এরূপ পরিহাসকর-বাক্য শুনিয়াও অক্ষুব্ধভাবে বিনয়পূর্ব্বক আত্মপরিচয় প্রদান করিলেন ও যে জন্য আসিয়াছেন, তাহাও জানাইলেন। পক্ষধর তাহাতে সম্মত হইয়া সাগ্রহে রঘুনাথকে পড়াইতে লাগিলেন। স্থানে স্থানে অসঙ্গত ও ইচ্ছাকৃত-অনুপপত্তির মীমাংসায় রঘুনাথ সন্তুষ্ট হইতে না পারায় বিচার করিয়া তাহার খণ্ডন করিতে ক্রটী করিতেন না। এ সময় অন্যান্য ছাত্রের পাঠ প্রায় বন্ধ হইয়াই যাইত।

পক্ষধরের মত-খণ্ডন।

একদা প্রত্যক্ষের কারণ বিবৃত করিবার সময় পক্ষধর 'যোগজ-সন্নিকর্ষ-ব্যতীত আরও দুটী সন্নিকর্ষের কথা উত্থাপন করিলে রঘুনাথ স্বীয়-প্রতিভাবলে তাহার মধ্যে অন্যতর সামান্য-লক্ষণারূপ-সন্নিকর্ষ না হইলে চলে; এরূপ প্রতিপন্ন করিলেন। পক্ষধর তাঁহার বিচারপ্রণালীর বিরোধে চলিতে না পারিয়া বলিলেন যে,—

"বক্ষোজপানকৃৎ কাণ! সংশয়ে জাগ্রতি স্ফুটম্।
সামান্যলক্ষণা কস্মাদকস্মাদবলুপ্যতে॥"

ইহার অর্থ করিতে হইলে একটু পশ্চাৎপদ হইতে হইবে :—

বালককে বৃদ্ধ উপদেশ করিলেন, "আগুন তপ্ত, হাত দিলে পুড়ে যায়। বালক জানিয়া রাখিল, "আগুন তপ্ত, হাত দিলে পুড়ে যায়।" দশদিন পরে সেই বালককে আগুন আনিতে বলিলে, সে হাতে করিয়া আগুন আনিতে স্বীকার করে না কেন? না :—বৃদ্ধের উপদেশাধীন বালকের একটা সামান্যতঃ জ্ঞান হইয়া গিয়াছে, 'আগুনে হাত পোড়ে।' এ আগুনটাও আগুন, সে আগুনটাও আগুন, তাতেও হাত পুড়িতে পারিত, এতেও হাত পুড়িতে পারে; দুটাই সমান।' এইরূপ জ্ঞান হওয়ায় বালক হাতে করিয়া আগুন আনিতে চাহে না।

আপ্তোপদেশ দ্বারা শিশুর শক্তিগ্রহ।

হয়ত বৃদ্ধ দীপশিখায় হাত দিতে নিষেধ করিবার ছলে সেই উপদেশ করিয়াছিলেন, আর হয়ত বালক হাতে করিয়া যে আগুন আনিতে অসম্মত, সেটা কয়লার; এ দুইএ পরস্পর অবশ্যই ভেদ আছে। তথাপি দীপশিখার ও কয়লার আগুনের কতকগুলি গুণ সমান, যেমন প্রকাশ, দাহ ইত্যাদি। এইরূপ কতকগুলি গুণ উভয়েরই এক। এক ও সমান, একতা ও সামান্য এককথা। এই সামান্য-জ্ঞান থাকায় বালক হাতে করিয়া কয়লার আগুন আনিতে চাহে না।

এই সামান্য=সমানতা বা সমানভাবকে জাতি বলা যায়। বিকট ভাষায় ইহাকে 'অগ্নিত্ব' বলা হয়। এই সামান্যের জ্ঞানকে সামান্যবিষয়ক-জ্ঞান, সামান্যলক্ষণ-প্রত্যাসত্তি বা সামান্যলক্ষণ-সন্নিকর্ষ বলে।

সামান্যলক্ষণ-সন্নিকর্ষ।

এইরূপ সামান্যজ্ঞান-দ্বারা নানাপ্রকার নূতন নূতন বিষয়ের জ্ঞান হইয়া থাকে। যেমন মানুষের কতকগুলি সমানগুণ জানা থাকায় আফ্রিকাবাসী ও আমেরিকাবাসী লোককেও আমরা দেখিলেই মানুষ বলিয়া জানিতে পারি। সেইরূপ সমানগুণ জানা থাকায় বন্য জন্তুবিশেষকেও বনমানুষ বলিয়া থাকি। সুতরাং এই সামান্যজ্ঞান বা সামান্যলক্ষণ-সন্নিকর্ষ-দ্বারা বিষয়বিশেষের জ্ঞান হয়। ইহাদ্বারা জ্ঞানের প্রত্যক্ষতা হয় না। জ্ঞানের প্রত্যক্ষতার প্রতি কারণ ইন্দ্রিয়জন্যতা, অর্থাৎ ইন্দ্রিয় জন্য জ্ঞানকেই প্রত্যক্ষ বলা যায় সামান্য লক্ষণা জন্য-জ্ঞানকে প্রত্যক্ষ বলা হয় না। তা'হ'লে অনুমেয়বহ্নির জ্ঞানও প্রত্যক্ষ হইয়া পড়ে; কারণ সে বহ্নিজ্ঞানের পূর্ব্বেও বহ্নিসামান্য জ্ঞান হইয়া থাকে। কোন একটী বিশেষ-জ্ঞান হইবার পূর্ব্বেই তাহার সামান্যতঃ জ্ঞান না থাকিলে বিশেষজ্ঞান হইতে পারে না। এই হেতু,—"সামান্যলক্ষণাজন্য জ্ঞানের প্রত্যক্ষতা স্বীকার না করিলেও জ্ঞানলক্ষণাজন্য জ্ঞানের প্রত্যক্ষতার অপলাপ দুরূহ। কিন্তু তাদৃশ স্থলেও জ্ঞানের সন্নিকর্ষঘটকতা অপরিহার্য্য কি না তদ্বিষয়ে মতভেদের অবকাশ আছে।"* এ কথাটা যে রায় রাজেন্দ্রচন্দ্র শাস্ত্রী বাহাদুর কি বলিয়াছেন, আমরা ত কিছুই বুঝিতে পারিলাম না।

সামান্যলক্ষণার ফল।

* তৎপ্রকাশিত ও অনূদিত ভাষাপরিচ্ছেদের ভূমিকা দ্রষ্টব্য।

জ্ঞানের প্রত্যক্ষতা কি সামান্যলক্ষণা জন্য হয়? কৈ এ কথাত কেহই স্বীকার করেন না। পক্ষান্তরে সামান্যলক্ষণাজন্য যে জ্ঞান উৎপন্ন হয়, তাহার মধ্যে যে জ্ঞান ইন্দ্রিয়সন্নিকর্ষ জন্য, সেই প্রত্যক্ষ; ইহাও ত খণ্ডন করিবার যো নাই। সুতরাং ঐ কথাটার অর্থই হয় না।

তার পর রায়বাহাদুর বলিয়াছেন, "জ্ঞানলক্ষণাজন্য জ্ঞানের প্রত্যক্ষতার অপলাপ দুরূহ।" তাহা হইলে কি জানিতে হইবে, জ্ঞানটা জ্ঞানলক্ষণাজন্য বলিয়াই প্রত্যক্ষপদবাচ্য? তাহা ত কেহই স্বীকার করিতে পারিবেন না। পক্ষান্তরে জ্ঞানলক্ষণাজন্য যে জ্ঞান উৎপন্ন হয়, তাহার প্রত্যক্ষতাই বা সকল স্থলে কে স্বীকার করিবে?

জ্ঞানলক্ষণ-সন্নিকর্ষ ও তাহার ব্যবহারের স্থল বিশেষ।

যেমন 'সুরভিচন্দনং' এস্থলে চন্দনখণ্ডের সহিত চক্ষুর সম্বন্ধ হওয়ায় চন্দনখণ্ড প্রত্যক্ষ হইয়াছে, সে জ্ঞানটা ইন্দ্রিয়-সন্নিকর্ষাধীন হইয়াছে বলিয়া প্রত্যক্ষ পদবাচ্য। কিন্তু সুরভি বা তাহার সদ্‌গন্ধের সহিত ত চক্ষুর সম্বন্ধ হইতে পারে না, নাকের সম্বন্ধ হইতে পারে, তাহা হয় নাই; তবে সে সুরভিজ্ঞান কি করিয়া হইবে? এইজন্য বলিতে হয়, সৌরভসামান্যের জ্ঞানরূপ সম্বন্ধ হওয়ায় সুরভির জ্ঞানও হইয়াছে।* ভাল, চক্ষুদ্বারা চন্দনের, সুরভিসামান্য দ্বারা সুরভিরও না হয় জ্ঞান হইতে পারিল; কিন্তু সৌরভত্ব বা সৌরভে যে কতকগুলি সমানভাব আছে, সেই সৌরভ-সামান্যেরই জ্ঞান হইবার উপায় কি? অথচ সৌরভসামান্য জ্ঞান ব্যতীত সৌরভজ্ঞান হইতে পারে না। সুতরাং ঐ স্থলে ঐ সৌরভসামান্যের জ্ঞানকে স্বয়ং-সম্বন্ধরূপে কল্পনা করা যায়। এস্থলে ঐ সৌরভ-সামান্যের জ্ঞান কি প্রত্যক্ষ বলিয়া কেহ স্বীকার করিবেন? অতএব "জ্ঞানলক্ষণাজন্য জ্ঞানের প্রত্যক্ষতার অপলাপ দুরূহ।" এ কথাটার অর্থ হওয়াই যে নিতান্ত দুরূহ।

তার পর, "জ্ঞানলক্ষণা প্রত্যাসত্তি না স্বীকার করিলেও বরং 'কষ্টে সৃষ্টে' চলিতে পারে, কিন্তু সামান্যলক্ষণা প্রত্যাসত্তি না স্বীকার করিলে, কোন একটা নূতন বিষয়বিশেষের জ্ঞান হওয়াই যে একরূপ অসম্ভব। অথচ রায় বাহাদুর বলিলেন, "সামান্যলক্ষণা জন্য জ্ঞানের প্রত্যক্ষত্ব স্বীকার না করিলেও জ্ঞানলক্ষণাজন্য জ্ঞানের প্রত্যক্ষতার অপলাপ দুরূহ।"

আবার বলিয়াছেন, "কিন্তু তাদৃশ স্থলেও জ্ঞানের সন্নিকর্ষঘটকতা অপরিহার্য্য কি না, তদ্বিষয়ে মতভেদ আছে।" কি আশ্চর্য্য! তাদৃশস্থলে, কীদৃশস্থলে? জ্ঞানের সন্নিকর্ষঘটকতা, জ্ঞান কি সন্নিকর্ষের ঘটক? না:—জ্ঞানই সন্নিকর্ষ? যেমন বুঝিয়াছেন, তেমন বোঝাইয়াছেন বা বোঝা চাপাইয়াছেন। আমরা কিন্তু এ বোঝা লইতে অসমর্থ।

সামান্যলক্ষণ সন্নিকর্ষ স্বীকার করিবার আবশ্যক।

বাস্তবিক সামান্যলক্ষণসন্নিকর্ষ না স্বীকার করিলে, যেখানে ধূম দেখিয়া বহ্নির অনুমিতি হয়, সেখানে ধূমসামান্যের বা বহ্নিসামান্যের জ্ঞান না হওয়ায় কালান্তরীয় বা দেশান্তরীয় বহ্নির সহিত কালান্তরীয় বা দেশান্তরীয় ধূমের পাকাপাকি সম্বন্ধ একটা আছে কি না, জানিবার উপায় থাকে না; সুতরাং

---

* ভাষাপরিচ্ছেদীয় সামান্যলক্ষণসন্নিকর্ষের মুক্তাবলী দ্রষ্টব্য।

"ধূমমাত্রেই বহ্নিসম্বন্ধীয় কি না? এরূপ একটী সন্দেহ হইতে পারে না। অথচ ধূমদ্বারা বহ্নির অনুমিতি স্থলে "ধূমমাত্রেই বহ্নিসম্বন্ধীয় কি না? ইত্যাকার একটী সংশয় জাগিয়াই থাকে। অতএব ঐ সংশয় উপপন্ন করিতে হইলে সামান্যলক্ষণা প্রত্যাসত্তি স্বীকার করিতে হইবে—অর্থাৎ পর্ব্বতাদি স্থলে ধূম দেখিবামাত্র ধূমসামান্যেরও জ্ঞান হয় এবং বহ্নির জ্ঞান হইবামাত্র সঙ্গে সঙ্গে বহ্নিসামান্যেরও জ্ঞান হয়। তখন বিষয়গুলি—অর্থাৎ ধূম ও বহ্নি এ উভয় সামান্যাকার জ্ঞানে প্রতিভাত হওয়ায় "ধূমমাত্রই বহ্নিসম্বন্ধীয় কি না?" এরূপ সংশয় আসিয়া উপস্থিত হয়।

উহার ফল সংশয়।

সেই সংশয় নিবারণ জন্য তর্কের আবশ্যক, যথা :—যদি বহ্নি হইতেই ধূম উৎপন্ন না হয়, তবে বহ্নি না থাকিলেও ধূমের থাকা উচিত। এরূপ তর্কে দেখা যায় যে, বহ্নি না থাকিলে ধূম উৎপন্ন হইতেই পারে না, সুতরাং ধূমের সহিত বহ্নির পিতৃপুত্রভাব বা জন্যজনকভাব সম্বন্ধ একেবারে পাকাপাকি আছে। এই পাকাপাকি সম্বন্ধই ব্যাপ্তিপদবাচ্য। ইহাকে সেই বিকষ্টভাষায় অব্যভিচরিতসম্বন্ধ, অবিনাভাবসম্বন্ধ বা ব্যাপ্তি বলা হয়। যেমন পাকা দেখা বিবাহের নিশ্চায়ক, সেইরূপ পাকা দেখাও অনুমানের নিশ্চায়ক। কোনস্থলে যেরূপ পাকা দেখার পরেও বিবাহ ভাঙ্গিয়া যায়, সেইরূপ কোনস্থলে পাকা দেখার পরেও অনুমান ভুল হয়। তাহার কারণ, ঠিক পাকা দেখা হয় নাই, আর কি। ঐ স্থলের উল্লেখ করিয়াই পক্ষধর বলিয়াছিলেন :—

"বক্ষোজপানকৃৎ কাণ! সংশয়ে জাগ্রতি স্ফুটং।
সামান্যলক্ষণা কস্মাদকস্মাদবলুপ্যতে?"

'ঐ রূপ সংশয় জাগিয়া থাকিতে সামান্যলক্ষণার অপলাপ কি করিয়া সম্ভবে? তুমি এখনও এতই শিশু যে এখনও স্তন্য পান করিয়া থাক,—অর্থাৎ এখনও তুমি ছাত্র, শিক্ষিতেছ মাত্র, তোমার শিখিবার বিষয় এখনও অনেক ও অনেক দূরে।'

এইরূপ মধ্যে মধ্যে পক্ষধর বড়ই বিপন্ন হইতেন; কারণ রঘুনাথ কোন কথা নির্যৌক্তিক বুঝিলে ছাড়িয়া দিবার পাত্র ছিলেন না। তথাপি মিশ্রমহোদয় পুত্রাধিক-প্রিয়নির্ব্বিশেষে নিজের 'থলি ঝাড়িয়া' শিক্ষাদান করিয়া বিদায়কালে জিজ্ঞাসা করিয়াছিলেন, রঘুনাথ কোন্ স্থানে পাঠের বিশেষ সুবিধা পাইয়াছেন, বাসুদেব সার্ব্বভৌমের নিকটে কি পক্ষধরের নিকটে?—

বিদায় সূচনা।

অপি দিবসমনৈষীঃ পদ্মিনী-সদ্মনিস্থো, রজনিষু রমিতোঽভূঃ কৌমুদিন্যাং রমণ্যাম্।
কথয় কথয় ভৃঙ্গ! স্বচ্ছভাবেন তাবৎ, সুখমধিকমবাপ্সীরত্র বা তত্র বেতি? ॥

ইহার উত্তরে রঘুনাথ বলিয়াছিলেন, পাঠ উভয়ত্রই প্রায় সমভাবেই হইয়া থাকে, তবে বিচারের চিক্কণতা ও মাধুর্য্য লাভ করা আপনার নিকট অসম্ভব।

"ত্বং পীযূষ! দিবোঽপি ভূষণমসি, দ্রাক্ষে! পরীক্ষেত কঃ,
মাধুর্য্যং তব বিশ্বতো হি বিদিতং সাধ্বী চ মাধ্বীকতা।

কিম্বেকস্ত পরস্বরুন্তদমপি ভ্রমো ন চেৎ কুপ্যসে,

যঃ কান্তাধর-পল্লবে মধুরিমা নান্যত্র কুত্রাপি সঃ ॥"

রঘুনাথ পাঠসমাপনান্তে চিন্তামণির দীধিতি নামে এক টীকা রচনা করিয়াছিলেন। কথিত আছে, ছাত্রগণ পাঠসমাপনান্তে দেশে ফিরিয়া যাইবার সময় পুস্তকগুলি প্রত্যর্পণ করিয়া যাইতে বাধ্য হইত। রঘুনাথ এতই ধীশক্তিসম্পন্ন ছিলেন যে সমগ্র ন্যায়শাস্ত্রটী কণ্ঠস্থ করিয়া লইয়া দেশে আসিয়াছিলেন। ইনি প্রায় ৪১৯ বৎসর পূর্ব্বে নবদ্বীপে আবির্ভূত হন। প্রসিদ্ধ গৌরাঙ্গদেব ও স্মার্ত্তচূড়ামণি রঘুনন্দন রঘুনাথের সমসাময়িক। প্রকৃতির নিয়মও যেন সেইরূপই বলিয়া বোধ হয়। যখন সৌরভ বিস্তারের সময় উপস্থিত হয়, তখন হইতে কিছু দিন পর্য্যন্ত সে সৌরভে দিগ্‌দিগন্ত প্রতিনিয়তই আমোদিত হইতে থাকে। বঙ্গের সৌরভ চারিদিকে ছুটিবার সময় হইল, আর বঙ্গে ন্যায়শাস্ত্রে রঘুনাথ, বাসুদেব, বিশ্বনাথ প্রভৃতি; স্মৃতিশাস্ত্রে রঘুনন্দন, বুড়ীপঞ্চানন প্রভৃতি ও মুক্তিমার্গে গৌরাঙ্গ, নিত্যানন্দ, অদ্বৈত প্রভৃতি স্বর্গীয় মহাত্মা সকল যুক্তি করিয়াই যেন অবতীর্ণ হইয়াছিলেন।

রঘুনাথের দীধিতিটীকা।

বঙ্গের সুরভিকুসুমচয়।

এই সময়েই নবদ্বীপমণ্ডলে প্রসিদ্ধ বিদ্যানিবাস-দেবের ঔরসে মহানুভব বিশ্বনাথ ন্যায়পঞ্চানন জন্মপরিগ্রহ করেন। ইনি ন্যায়সূত্রের বৃত্তি-রচনা করিয়া অসাধারণ-পাণ্ডিত্য প্রকাশ করেন। বিশ্বনাথ বৃত্তিশেষে লিখিয়াছেন—

বিশ্বনাথ ন্যায়পঞ্চানন ও ন্যায়সূত্রবৃত্তি।

"এষা মুনি প্রবর-গোতম-সূত্রবৃত্তিঃ, শ্রীবিশ্বনাথ-কৃতিনা সুগমাল্পবর্ণা।

শ্রীকৃষ্ণচন্দ্রচরণাম্বুজ-চঞ্চরীক-শ্রীমচ্ছিরোমণি-বচঃপ্রচয়ৈরকারি ॥"

শ্রীকৃষ্ণচন্দ্রের পাদপদ্মে ভৃঙ্গ-স্বরূপ শ্রীমান্ শিরোমণি মহোদয়ের কতকগুলি বাক্য একত্র করিয়া আমি এই গোতমসূত্রের বৃত্তি রচনা করিয়াছি।

ঠিক্ তাহাই করিয়াছেন। কুত্রাপি পরবর্ত্তী মথুরানাথাদির নির্ব্বাচন অবলম্বন করেন নাই। যদি ন্যায়পঞ্চানন-মহোদয় মথুরানাথাদির পরবর্ত্তী লোক হইতেন, তবে তাঁহাদিগের সেই নির্ব্বাচনের আভাস না দিয়া কিছুতেই স্থির থাকিতে পারিতেন না।

বিশ্বনাথের কালনির্ণয়।

পক্ষান্তরে নিজ-নামে ও শিরোমণির নামে শ্রীযোগ করিয়া দেখাইয়াছেন যে, তখনও শিরোমণি বিশ্রী হন নাই এবং তিনিও জীবিত, বিশ্রী নন।

শিরোমণি যে শ্রীকৃষ্ণদেবেরই পরম ভক্ত ছিলেন, তাহাই বা বিশ্বনাথ নিশ্চয়রূপে কি করিয়া জানিলেন? সমসাময়িক হইলে খ্যাতনামা ব্যক্তির গুণাবলীর সকলগুলি যথাযথ জানিতে পারা যায়; কিন্তু বিষম-কালিকের সকল গুণগুলি নিঃসন্দিগ্ধভাবে জানা নিতান্ত অসম্ভব ইতিহাসাকারে লিখিত থাকিলে জানিতে পারা যায় বটে, কিন্তু তাহা ত ছিল না।

বিশ্বনাথ বৃত্তিপ্রারম্ভে বলিয়াছেন—

"অলসমতিরপীদং বিস্তৃতং ন্যায়শাস্ত্রং, বিরহিত বহুযত্নো লীলয়া বেত্তু বিজ্ঞঃ।
ইতি-বিনিহিতচেতাঃ কৌশলং কর্ত্তুকামো, গুরুচরণ-রজোহহং কর্ণধারী করোমি ॥৫॥"

'অধিক যত্নহীন অলসমতি মূর্খ এবং বিজ্ঞ পণ্ডিতও বিস্তৃত-ন্যায়শাস্ত্র লীলাচ্ছলে দেখুন, এইরূপ মনে ভাবিয়া দক্ষতা-প্রকাশের কামনায় শিক্ষা-গুরুর পদধূলিকে আমি কর্ণধার করিলাম।

'শিক্ষাগুরুর পদধূলিকে কর্ণধার করিলাম' অর্থাৎ যে পদধূলি আমার কর্ণধার=কিনা, কাণ ধরিয়া শিক্ষা দান করিয়াছে, এখন সেই পদধূলি কর্ণধার=কিনা, কাণ্ডারী ; কৌশলে ন্যায়সাগর পার হইয়া যাইবার শিক্ষা-নৌকার মাঝি স্বরূপ।

শ্লিষ্টশব্দে মনের ভাব ব্যক্ত করা বিশ্বনাথের এটী নূতন নহে। অন্যস্থলেও যথেষ্ট শ্লিষ্টশব্দ ব্যবহার করিয়াছেন। মুক্তাবলীর "সদ্দ্রব্যাগুণগুম্ফিতা" ইত্যাদি ৩য় শ্লোক দ্রষ্টব্য। এবং এই বৃত্তিতেও দেখাইতেছি। যথা—

"তাতং বিশ্ব-বিসারিচারুযশসং বিদ্যানিবাসং নুমঃ।"

ইহার দুটী অর্থ, একটী এই :—সর্ববিদ্যার আধার বলিয়া যাঁহার মনোহর-যশঃ বিশ্বব্যাপ্ত, সেই বিদ্যানিবাস নামক পিতাকে নমস্কার করি।

আর একটী অর্থ এই :—বিদ্যানিবাস নাম হইলেও যাঁহার মনোহর যশঃ বিশ্বনাথ নামকপুত্র দ্বারাই চারিদিকে বিকীর্ণ হইয়াছে, সেই পিতাকে আমি নমস্কার করি। এস্থলে 'নুমঃ' এই পদটী দ্বারা বিশ্বনাথ নিজের গৌরব প্রকাশ করিয়াছেন, কারণ 'আমার গৌরবেই পিতার যশঃ' এইরূপ মনে করিয়া বিশ্বনাথের ঐ 'নু' ধাতুর উত্তর গৌরবে বহুবচন প্রয়োগ দেখিতে পাওয়া যাইতেছে। একমাত্র বিশ্বনাথই নমস্কার করিতেছেন, অন্য কেহত নমস্কার করিতেছে না। এস্থলে যেমন বিশ্বপদটী শ্লিষ্ট, অর্থাৎ একবার জগৎ অর্থে, অন্যবার পুত্র অর্থে ব্যবহার করা হইয়াছে, সেইরূপ 'কর্ণধারী করোমি' এস্থলেও বুঝিতে হইবে।

বৃত্তিপ্রারম্ভে যাঁহার পদধূলিকে কর্ণধার বলিয়া আভাস দিয়াছেন, বৃত্তিশেষেও আবার তাঁহার নাম গ্রহণ না করিয়া প্রসিদ্ধ উপাধিটী ধরিয়া বলিয়াছেন, 'শ্রীমচ্ছিরোমণিবচঃ-প্রচয়ৈরকারি' শ্রীমান্ শিরোমণির বাক্যগুলি একত্র করিয়া এই বৃত্তি করিয়াছি। ছাত্র একথা বলিতে পারে ; ছাত্র যাহা কিছু বলিবে, সে সকল-কথাই গুরুর। গুরু যে কথাগুলি শিখাইবেন, ছাত্র তাহারই ব্যবহার করিয়া থাকে। গুরু যাহা বলেন নাই, ছাত্র তাহা কোথায় পাইবে ? সুতরাং বিশ্বনাথ যে কথাগুলি অবলম্বন করিয়া বৃত্তি রচিয়াছেন, সে কথাগুলি তাঁহার গুরুর ; বিশ্বনাথ শিরোমণির কথাগুলি সাজাইয়া বৃত্তি রচিয়াছেন ; শিরোমণি বিশ্বনাথের গুরু, =কিনা শিরোমণির নিকট পড়িয়াছিলেন।

একজনের মতে দু'চারিটী কথা বলিলেই কি সে গুরু হইয়া যাইবে ? তাহার নিকট পড়িয়াছিল, ইহা কোথা হইতে পাওয়া যাইতেছে ?

ঠিক কথা, সে গুরু হইবে কেন ? প্রাচীন মত লইয়া কে না লিখিয়া থাকে ? মত লইয়া

লিখিলেই সে গুরু হয় না। কথা লইয়া লিখিলে, সে গুরু হয়, অর্থাৎ আমি যে কথাগুলি লিখিলাম, ইহা আমার নহে অন্যের, একথা বলিলে, সেই অন্যকে গুরু বলিতে আপত্তি কি ?

প্রথমে যাঁহার পদধূলিকে কর্ণধার বলা হইয়াছে, শেষে যাঁহার কথা লইয়া 'এই বৃত্তি রচিয়াছি' বলা হইয়াছে, তাঁহাকে শিক্ষাগুরু বলিতে কোনরূপ বাধাই দেখিতে পাই না। তার পর নামগ্রহণ না করিয়া কেবল উপাধির উল্লেখ করিবার কারণ শাস্ত্রানুসারে গুরুর নামোল্লেখ করিতে নাই,—

গুরুর নামগ্রহণ করিতে নাই।

"আত্মনাম গুরোর্নাম, নামাতিকৃপণস্য চ।
আয়ুষ্কামো ন গৃহ্লীয়াৎ জ্যেষ্ঠাপত্য-কলত্রয়োঃ॥"

এই জন্যই ভগবান্ শঙ্করাচার্য্যের প্রশিষ্য সর্ব্বজ্ঞাত্ম-মুনি সংক্ষেপশারীরকের প্রথমে গুরুর জয়কীর্ত্তনকালে 'সুরেশ্বর' নামটী উল্লিখিত না করিয়া 'দেবেশ্বর' নামের ব্যবহার করিয়াছেন।

গুরুর নামগ্রহণ না করার দৃষ্টান্ত।

"যদীয়-সম্পর্কমবাপ্য কেবলং, বয়ং কৃতার্থা নিরবদ্যকীর্ত্তয়ঃ।
জগৎসু তে তারিত-শিষ্যপঙ্ক্তয়ো, জয়ন্তি দেবেশ্বর-পাদরেণবঃ॥"

এই শ্লোকের টীকায় মধুসূদন সরস্বতী বলিয়াছেন—

"সুরপদস্থানে দেবপদপ্রয়োগঃ সাক্ষাদ্‌গুরুনামাগ্রহণায় "গুরোর্নাম ন গৃহ্লীয়াৎ" ইতি স্মৃতেঃ।"

ব্যবহারেও দেখা যায়—শ্যামাপদস্থলে ধামাপদ, জয়কৃষ্ণস্থলে ফয়কৃষ্ণ ইত্যাদি। এটী স্ত্রীসম্প্রদায়েই বেশী বেশী দেখিতে পাওয়া যায়। আর নিবন্ধকারের ব্যবহারেরও বটে।

গুরুদেবের নামগ্রহণ না করার ব্যবহার।

অতএব বিশ্বনাথ গুরুর নামগ্রহণ না করিয়া, মাত্র উপাধিগ্রহণ করিয়া দেখাইয়াছেন যে, শাস্ত্রানুসারে নামগ্রহণ নিষেধ আছে বলিয়া গুরুর নামগ্রহণ করিতে পারি নাই। নৈয়ায়িক সম্প্রদায়ের মধ্যে শিরোমণি বলিয়া প্রসিদ্ধ একমাত্র আমাদিগের সেই রঘুনাথ; সুতরাং শিরোমণি বলায় অন্যরূপে তাঁহাকেই প্রায় নামতঃ উল্লিখিত করা হইয়াছে। তিনিই আমার শিক্ষাগুরু এই জন্য ইঁহার আবির্ভাবকাল স্বতন্ত্র নির্ণয় করিবার প্রয়োজন নাই। ৪১৯ বৎসর পূর্ব্বেই বিশ্বনাথ আবির্ভূত। ইঁহার জন্মভূমি নবদ্বীপ।

বিশ্বনাথের আবির্ভাবকাল।

ইহার অর্দ্ধশতাব্দী পরে মথুরানাথ ন্যায়শাস্ত্রে অসাধারণ ব্যুৎপন্ন হইয়াছিলেন, এবং চিন্তামণির এক টীকা প্রস্তুত করিয়াছিলেন। কথিত আছে,—মথুরানাথ মিথিলার পরীক্ষাচ্ছলে মৈথিল-গোকুলনাথের নিকট পরীক্ষা দিতে গিয়াছিলেন। তাহাতে বঙ্গের প্রাধান্য ব্যবস্থাপন করিয়া আসা হইয়াছিল। গোকুলনাথ চিন্তামণির খণ্ডত্রয়ের টীকা স্বরূপ "পদবাক্যরত্নাকর" প্রভৃতি অনেক গ্রন্থ রচনা করিয়াছিলেন।

মথুরানাথ।

গোকুলনাথ।

এই সময়েই জগদীশতর্কালঙ্কার ও গদাধরভট্টাচার্য্যও প্রতিভাত হইয়া উঠিয়াছিলেন।

জগদীশ ও গদাধর।

সেই প্রতিভারাশি মৈথিল-গোকুলনাথকে অতীব বিস্মিত ও স্তম্ভিত করিয়াছিল। জগদীশ দীধিতির টীকা, শব্দশক্তিপ্রকাশিকাদি অনেক গ্রন্থ রচনা করেন। গদাধর চতুঃষষ্টিবাদগ্রন্থ রচিয়াছিলেন। অদ্যাপি সেগুলি উজ্জ্বল-প্রভায় আলোকিত। ইঁহার প্রণীত একখানি টীকা আলোকের উপরেও আছে।

নবদ্বীপে মধুসূদন সরস্বতীর বিচার।

ইঁহার বেশ প্রতিষ্ঠিত হইলে, ইঁহাদিগের স্বীকৃত-পদার্থবাদ পরীক্ষার জন্য মুনিবর মধুসূদন সরস্বতী নবদ্বীপে উপস্থিত হন। তাৎকালিক অবস্থার বিষয় অতিসংক্ষেপে কতকগুলি কবিতার আকারে লিখিত আছে।* তাহার একটী উদ্ধৃত করিলেই প্রতীত হইবে যে, সে সময়ে কিরূপ ভয়ঙ্কর ব্যাপার উপস্থিত হইয়াছিল। মধুসূদন সরস্বতী অতি-প্রাচীন-বিধায় প্রথমেই মথুরানাথের সহিত বিচার করিতে আসনপরিগ্রহ করেন; কিন্তু যখন মথুরানাথ হীনপ্রভ হইয়াছেন বলিয়া জগদীশ ও গদাধর শুনিলেন, তখন তাঁহারা বাস্তবিকই অতিম্লান হইয়া পড়িয়াছিলেন।

"মথুরায়াং সমায়াতে, মধুসূদনপণ্ডিতে।
অনীশো জগদীশোঽভূৎ, ন জগর্দ্দ গদাধরঃ॥"

পরিশেষে গদাধরভট্টাচার্য্যই নবদ্বীপের উজ্জ্বলমুখ আরও উজ্জ্বলতর করিয়াছিলেন। মধুসূদন সরস্বতী নবদ্বীপত্যাগকালে সর্ব্বসমক্ষে বলিয়া যান—

"গদাধরসমঃ কশ্চিন্ন ভূতো ন ভবিষ্যতি॥"

নৈয়ায়িকের করুণা।

যাহাই হউক, ইঁহাদিগের দ্বারা গোতমের স্বীকৃত ষোড়শ পদার্থের সকলগুলিই বিশেষ মার্জ্জিত আকার ধারণ করিয়াছে। ন্যায়শাস্ত্রের প্রকৃত উদ্দেশ্য পূর্ণমাত্রায় পরিস্ফুট হইয়াছে। আমি বোধ করি, ইঁহাদিগের ন্যায় মহাকারুণিক লোক আর এ যাবৎ ইহ জগতে কেহই আবির্ভূত হন নাই। কারণ ন্যায়ের প্রকৃতপথ-প্রদর্শক-পদার্থগুলি এ যাবৎ কেবল গুরুপরম্পরায় চলিয়া আসায়, তাহার প্রাপ্তি-স্থানের একটী নির্দ্দিষ্ট-গণ্ডী কেবল মিথিলাভূমির চতুঃসীমা পরিবেষ্টন করিয়াছিল; কিন্তু এই সকল মহাত্মাদিগের কৃপায় তাহা আজিও আমরা অনায়াসে পাইতেছি। কেবল ইহাই নহে, সেই পদার্থগুলি স্থূলতঃ ও বিকীর্ণভাবে কেবল গুরুমুখেই পাওয়া যাইত, আর এখন তাহা গ্রন্থগত এবং অতিচিক্কণ ও সুসম্বদ্ধরূপে সূক্ষ্মতমভাবাপন্ন, ইহা নিতান্ত স্বল্পকরুণার ফল নহে। এই জন্যই ন্যায়বিদ্যার মাতৃভূমি মিথিলা আজি তাহারই জন্য বঙ্গভূমিকে মাতৃসম্বোধন করিয়া

নবদ্বীপের গৌরব।

কত গৌরব, কত-সম্মান দেখাইতেছে। আজি নবদ্বীপের নাম শুনিলে সকলেরই যে মস্তক অবনত হয়, ইহা কিসের জন্য? সেই মহামুনিকল্প রঘুনাথ, ঋষিদেশ্য রঘুনন্দন ও দেবদেশীয় গৌরাঙ্গের জন্য নহে কি? আর

---

* ৺কাশীধামে পাঠকালে, সহাধ্যায়ী শ্রীযুক্ত ভানুমূর্ত্তি শাস্ত্রীর (তর্কতীর্থ) নিকট সেগুলি আমরা বহুবার শুনিয়াছি। ইহা সময়ান্তরে মুদ্রিত করিব।

তাঁহাদিগের সেই 'প্রকারতাবচ্ছেদকাবচ্ছিন্নত্বাদি' বিকটভাষার জন্য কি নহে? স্মৃতিতত্ত্বের বাদবিচার ও প্রকৃততত্ত্বজ্ঞানের জন্য নহে কি?

গৌতমের প্রতিভা।

প্রকৃতপ্রস্তাবে এই পর্য্যন্তই গৌতমের প্রভূতপ্রতিভার কিরণজাল আলোকিত; জানি না ইহার পরের অংশ আলোকিত হইবার উপযুক্ত কি, না? গৌতমের প্রতিভার সীমা অন্বেষণ করিতে আমরা বহুদূরেই স্খলিত হইয়া পড়িয়াছি; সুতরাং ইতঃপর সাবধান হইয়া আমরা সেই ত্রেতাযুগের ন্যায়দর্শনের সংক্ষিপ্ত পর্য্যালোচনা করিবার চেষ্টা করিব। ন্যায়দর্শনে ব্যুৎপত্তি-লাভ করিতে হইলে এগুলি বিশেষ করিয়া জানিতে হয়। যথা—

ত্রেতার ন্যায়দর্শন।

ব্যুৎপাদক বিষয়।

প্রকৃতি ও প্রত্যয়যোগে একটী পদ হয়; সেইরূপ কতকগুলি পদ প্রয়োজনবশে মিলিত হইলে একটী বাক্য বিরচিত হয়; সেইরূপ কতকগুলি বাক্য বিশেষ কোন উদ্দেশ্যসিদ্ধির জন্য সূত্ররূপে গ্রথিত হইয়া থাকে; আবার তাদৃশ একাধিক সূত্রসকল এক একটী বিষয়ের নির্ণয়ার্থে পরস্পর সম্বদ্ধ হইয়া এক একটী প্রস্তাবের সমাপ্তি করে; সেই প্রস্তাবকে প্রকরণ বলা যায়; সেই সেই প্রকরণপুঞ্জে এক একটী আহ্নিক ও তাদৃশ আহ্নিকদ্বয়ে এক একটী অধ্যায় বিরচিত, এবং তাদৃশ পাঁচটী অধ্যায়ে এই ন্যায়দর্শন পরিসমাপ্ত হইয়াছে।

ন্যায়দর্শনের প্রবৃত্তিপ্রকার।

এস্থলে মনে রাখিতে হইবে, পদার্থের যথার্থজ্ঞান উৎপাদনের জন্য ন্যায়সূত্রের অবতারণা। সুতরাং কেবল এক একটী পদার্থের নাম শুনিলে তত্ত্বজ্ঞান উৎপন্ন হইবে না, তজ্জন্য যেমন পদার্থের সংজ্ঞাশ্রবণ করা আবশ্যক, তেমনই তাহার প্রকৃতভাব ও সেই প্রকৃতভাব অন্যরূপে দাঁড়াইতে পারে কি না, তাহার বিশেষ বিচারও একান্ত প্রয়োজন।

উদ্দেশ, লক্ষণ ও পরীক্ষার কর্ত্তব্যতা,—ফলিতার্থ।

অতএব পদার্থের যথার্থজ্ঞান উপার্জ্জন করিতে হইলে উদ্দেশ, লক্ষণ ও পরীক্ষা, এই তিনটী প্রণালীর অবলম্বন করিতে হয়। এই ন্যায়দর্শনে সেই তিনটী প্রণালীর অবলম্বন করা হইয়াছে।

১ উদ্দেশ। পরে যে পদার্থের লক্ষণ ও পরীক্ষা করা যাইবে, পূর্ব্বেই তাহার নাম কীর্ত্তন করা।*

---

* শিষ্যগণ সহজে বুঝিতে পারিবে বলিয়া আর্য্য ঋষিগণ তাঁহাদিগের স্বীকৃত বিষয়ের একটী সংক্ষিপ্ত তালিকা গ্রন্থের প্রথমেই দিয়া থাকেন। তাহাকে উদ্দেশ বলে। নব্য ও পাশ্চাত্য পণ্ডিতগণ বোধ হয় শ্রোতার এই সুবিধার বিষয় চিন্তায় স্থান দেন না। সেটী গুণের কি দোষের, তাহা তাঁহারাই বলিতে পারেন। তবে আমাদিগের বোধ হয় এ রীতিটী গ্রন্থকারের স্থির-জ্ঞানের পরিচয়কর; কেন না, লেখনী গ্রন্থকারকে টানিয়া লইয়া কুস্থানে উপস্থিত করাইতে অবসর পায় না, গ্রন্থকারই লেখনীকে সংযত রাখিয়া গন্তব্য স্থানে উপস্থিত হইতে পারেন। এ রীতিটী দেখিয়া বোধ হয় যে, গ্রন্থকার অনেক তর্কবিতর্কের পর যাহা সিদ্ধান্ত করিতে সমর্থ হন, তাহাই সূত্রে গ্রথিত করিয়া শিষ্যগণকে স্নেহোপহারস্বরূপ প্রদান করেন, কেবল ঈর্ষ্যা বা দুরাকাঙ্ক্ষার সম্পূরণার্থ নহে।

২ লক্ষণ। পদার্থের প্রকৃতভাব=অর্থাৎ যে কোন পদার্থের যে কোন একটী ধর্ম্ম, গুণ বা ক্রিয়ার উল্লেখ করিলে, তদ্দ্বারা অন্য কোন পদার্থকে না বুঝাইয়া কেবল যে তন্মাত্র পদার্থকে বুঝায়, সেই ধর্ম্ম গুণ বা ক্রিয়া।

৩ পরীক্ষা। সেই লক্ষণ তাহার নির্ণয়কল্পে ঠিক হইয়াছে কি না, প্রমাণ দ্বারা সেই সন্দেহ অপনয়ন করিবার জন্য একতর নিশ্চায়ক বিচার।

সূত্রার্থ বিভাগকালে ভাষ্যকার বাৎস্যায়ন গোতমের স্বীকৃত-সমস্ত-পদার্থকে চারিভাগে বিভক্ত করিয়াছেন, যথা :—প্রমাতা, প্রমাণ, প্রমেয় ও প্রমিতি।

১ প্রমাতা। বিষয়ের প্রাপ্তি ও পরিহারের ইচ্ছায় যে প্রবর্ত্তিত হয়।

২ প্রমাণ। প্রমাতা যদ্দ্বারা জানিতে সমর্থ হয়।

৩ প্রমেয়। যাহাকে জানিতে পারা যায়।

৪ প্রমিতি। বিষয়কে জানা।

এই গুলিই আবার প্রকারান্তরে চারিভাগে বিভক্ত; যথা :—হেয়, তন্নির্বর্ত্তক, আত্যন্তিক হান ও তদুপায়।

১ হেয়। দুঃখ ও দুঃখের কারণ, একবিংশতি প্রকার।

২ তন্নির্বর্ত্তক। মিথ্যাজ্ঞান। ইহাকে ভ্রান্তি বা অজ্ঞান বলা যাইতে পারে।

৩ আত্যন্তিকহান। নিশ্চয় সমূলে নিবৃত্তি।

৪ তদুপায়। আত্মাদি পদার্থের তত্ত্বজ্ঞান।

এস্থলে এইরূপ-ক্রমে বুঝিতে হইবে। আত্মাদি-পদার্থের তত্ত্বজ্ঞান হইলে, মিথ্যাজ্ঞানের নিবৃত্তি হয়; তদ্দ্বারা রাগ-দ্বেষ মোহের নাশ, তদ্দ্বারা ধর্ম্মাধর্ম্মের, অনুৎপত্তি, ধর্ম্মাধর্ম্ম না থাকিলে জন্মান্তরগ্রহণ করিতে হয় না সুতরাং একবিংশতিপ্রকার দুঃখের নিশ্চয় সমূলে নিবৃত্তি হয়। শরীর, মন, শ্রবণ, ত্বক্, চক্ষুঃ, নাসিকা, জিহ্বা, ষড়্‌বিধ বিষয়, ষড়্‌বিধ জ্ঞান, সুখ ও দুঃখ, এই একুশ প্রকারকেই দুঃখ বলা যায়।

মুক্তির ক্রম বা দ্বিতীয় সূত্রের অর্থ।

একবিংশতিপ্রকার দুঃখ।

সতের সদ্‌ভাব ও অসতের অসদ্‌ভাবই তত্ত্ব। সৎ যদি সংরূপে গৃহীত হয়, অসৎ যদি

---

* "যথা চিকিৎসাশাস্ত্রং চতুর্ব্যূহং,—রোগঃ আরোগ্যং রোগহেতুঃ, ভৈষজ্যম্ ইতি, এবমিদমপি শাস্ত্রং চতুর্ব্যূহমেব, তদ্যথা—সংসারঃ, সংসারহেতুঃ মোক্ষঃ, মোক্ষোপায় ইতি।"

পাতঞ্জলদর্শনম্, সাধনপাদীয় ১৬ সূত্রস্থ ব্যাসভাষ্যম্

"দুঃখ-সমুদায়-নিরোধ-মার্গাশ্চত্বার আর্য্যস্য বুদ্ধাভিমতানি তত্ত্বানীতি॥"

বৌদ্ধদর্শনম্, সৌত্রান্তিকমতমেতৎ।

"হেয়ং, তস্য নির্ব্বর্ত্তকং, হানমাত্যন্তিকং, তস্যোপায়োঽধিগন্তব্যঃ।
ইত্যেতানি চত্বারি অর্থপদানি সম্যগ্‌বুদ্ধা নিঃশ্রেয়সমধিগচ্ছন্তি।" ইতি

ন্যায়দর্শনম্, প্রথমসূত্রীয়ম্, বাৎস্যায়নভাষ্যমেতৎ।

যথাশ্রুত অসৎ রূপেই গৃহীত হয়, তবেই সতের তত্ত্ব ও অসতের তত্ত্ব জানা হইল।

তত্ত্বপায় বা তত্ত্বজ্ঞান। যে যাহা, তাহাকে তাহা জানা; যে যেরূপ, তাহাকে সেই-রূপে জানাই তত্ত্বজ্ঞান। সাধুকে সাধু বলিয়া জানা, চোরকে চোর বলিয়া জানা, বিষকে বিষ, অমৃতকে অমৃত, ভালকে ভাল, এবং মন্দকে মন্দ বলিয়া জানাই তত্ত্বজ্ঞান। ইহার বিপরীত-জ্ঞানই মিথ্যাজ্ঞান। সেই মিথ্যাজ্ঞান-নাশের জন্য তত্ত্বজ্ঞান জানা আবশ্যক।

তত্ত্বজ্ঞান লাভ করিতে হইলে ন্যায়চর্চ্চা করিতে হইবে। প্রমাণ ব্যতীত ন্যায়চর্চ্চা অসম্ভব,

ষোড়শ পদার্থের ক্রম স্বীকারহেতু। স্তরাং প্রমাণ চাই। প্রমাণ কাহাকে লইয়া ব্যবহার করিবে? এজন্য প্রমেয়-পদার্থ আবশ্যক। সন্দেহ না হইলে ন্যায়চর্চ্চার প্রয়োজন হয় না, সুতরাং সংশয় থাকা প্রয়োজন। অবশ্য নিষ্প্রয়োজনে বিচার আসিবে কেন? এহেতু প্রয়োজন একটী মানিতে হয়। দৃষ্টান্ত না দেখাইলে পরে বুঝিবে কেন? অতএব দৃষ্টান্ত আবশ্যক। ফাজিল তর্কে কে যাইবে? এজন্য সিদ্ধান্ত অপরিহার্য্য। বিচারের প্রণালী না জানিলে, কি করিয়া বিচার করিবে? তজ্জন্য পাঁচটী অবয়ব নিরূপণ করিতে হইয়াছে। তর্ক ভিন্ন বিচার হয় না বলিয়া তর্ক স্বীকার আবশ্যক। তর্কের ফল নির্ণয় একান্ত প্রয়োজন। কি কি প্রণালীতে কথা বলা যাইতে পারে? তজ্জন্য বাদ, জল্প ও বিতণ্ডার কীর্ত্তন করিতে হইবে। বাদি-বিজয়ার্থে ও ভ্রমপ্রমাদহীন অনুমান করিতে হইলে, হেত্বাভাস, ছল, জাতি ও নিগ্রহস্থানের জ্ঞান নিতান্ত দুষ্পরিহার্য্য।

সেই জন্যই মহর্ষি গোতম তৎপ্রণীত ন্যায়দর্শনের প্রথমে তাঁহার স্বীকৃত পদার্থের এইরূপ একটি তালিকা দিয়াছেন।

প্রমাণ, প্রমেয়, সংশয়, প্রয়োজন, দৃষ্টান্ত, সিদ্ধান্ত, অবয়ব, তর্ক, নির্ণয়,

প্রথম সূত্রার্থ। বাদ, জল্প, বিতণ্ডা, হেত্বাভাস, ছল, জাতি এবং নিগ্রহস্থান, এই ষোড়শ পদার্থের তত্ত্বজ্ঞান হইলে নিঃশ্রেয়স লাভ হয়।

প্রমাণ চারি প্রকার। প্রত্যক্ষ, অনুমান, উপমান ও শব্দ। তন্মধ্যে ষড়িন্দ্রিয়ভেদে

প্রমাণ। প্রত্যক্ষ ছয় প্রকার। মানস, শ্রাবণ, ত্বাচ, চাক্ষুষ, ঘ্রাণ ও রাসন। অনুমান তিন প্রকার। পূর্ব্ববৎ, শেষবৎ ও সামান্যতো দৃষ্ট। উপমান এক প্রকার। শব্দ দুই প্রকার; দৃষ্টার্থ ও অদৃষ্টার্থ।

প্রমেয় দ্বাদশ প্রকার,—আত্মা, শরীর, ইন্দ্রিয়, অর্থ, বুদ্ধি, মনঃ, প্রবৃত্তি, দোষ, জন্মান্তর,

প্রমেয়। ফল, দুঃখ ও অপবর্গ বা মুক্তি। তন্মধ্যে আত্মা দুইপ্রকার; জীবাত্মা ও পরমাত্মা। জীবাত্মা বহু ও পরমাত্মা বা ঈশ্বর এক। শরীর চারি প্রকার; পার্থিব, জলীয়, তৈজস ও বায়বীয়। ইন্দ্রিয় পাঁচপ্রকার। অর্থও পাঁচপ্রকার; পার্থিবগন্ধ, জলীয়রস, তৈজসরূপ, বায়বীয়স্পর্শ ও আকাশীয় শব্দ। বুদ্ধি ও জ্ঞান একার্থক শব্দ। মনঃ বা অন্তঃকরণ। প্রবৃত্তি দ্বিবিধ; পাপ ও পুণ্য; দোষ ত্রিবিধ; রাগ, দ্বেষ ও মোহ। জন্মান্তর, এতজ্জন্মাতিরিক্ত পুনরুৎপত্তি, এ জগতে আবার আসা। ফল দ্বিবিধ,

সংশয়। সুখভোগ ও দুঃখভোগ। দুঃখ, বাধনা, পীড়া, তাপ, ব্যথা, একার্থক শব্দ। অপবর্গ—নির্ম্মূল-দুঃখনিবৃত্তি। একটি পদার্থ অবলম্বন করিয়া যে বিরুদ্ধ-অনেক প্রকার জ্ঞান উপস্থিত হয়, তাহাকে সংশয় বা সন্দেহ বলে।

প্রয়োজন। যাহা পাইবার জন্য পুরুষ প্রবর্ত্তিত হয়, তাহাই প্রয়োজন, তাহা দুই প্রকার মুখ্য ও গৌণ, সুখ ও দুঃখনিবৃত্তি মুখ্য এবং সুখসাধন স্ত্রী-অন্ন-পানাদি ও দুঃখাভাবসাধন ধনোপার্জ্জনাদি গৌণ। প্রয়োজনের অপর আর একটী নাম ফল।

দৃষ্টান্ত। ইতর ভদ্র সাধারণেই যে বিষয়টীকে ঠিক্ বলিয়া বুঝিতে পারে, তাহাকে দৃষ্টান্ত বলা যায়।

সিদ্ধান্ত। শাস্ত্রীয় বিষয়ের নিশ্চয়কে সিদ্ধান্ত বলা যায়; সিদ্ধান্ত চারি প্রকার—প্রতিতন্ত্র, সর্ব্বতন্ত্র, অধিকরণ, ও অভ্যুপগম। তন্ত্র অর্থে শাস্ত্র, যাহা এ শাস্ত্রে বিচারিত হইতেছে, তাহা যদি অন্য সর্ব্বশাস্ত্রে স্বীকৃত হইয়া থাকে; তবে তাহার সিদ্ধান্ত=সর্ব্বতন্ত্রসিদ্ধান্ত। সেইরূপ সমানশাস্ত্রে স্বীকৃত ও বিষমশাস্ত্রে অস্বীকৃত হইলে, তাহার নিশ্চয়=প্রতিতন্ত্রসিদ্ধান্ত। কোন একটির নিশ্চয় হইলে, তাহার আনুষঙ্গিক আরও দশটির যে নিশ্চয় হয়, তাহা=অধিকরণ-সিদ্ধান্ত। কাণ টানিলে মাথা আসা গোছের আর কি। অবিচারিত মত স্বীকার করিয়া লইয়া, তাহার বিচার করিয়া নিশ্চয় করা=অভ্যুপগম-সিদ্ধান্ত। যেমন, ঈশ্বর নাই বলিতেছ? আচ্ছা, স্বীকার করি ঈশ্বর নাই; কিন্তু এ জগতের উপাদনগুলি জড়, জীবেরাও নিতান্ত অজ্ঞ, তবে কিরূপে সে জড়গণ ক্রিয়া করিবে? অতএব ঈশ্বর মানিতে হইবে। তাহা হইলে, তিনি সর্ব্বজ্ঞ, কোন্‌টির সহিত কোন্‌টিকে মিলিত করিলে এ জগৎ এ আকারে হইতে পারে, তাহা তিনি জানেন; সুতরাং তিনি জড়গণকে যেরূপে চালাইয়াছিলেন, তাহারা সেইরূপে চলিয়া এই বিচিত্র জগতের নির্ম্মাণ করিয়াছে। ইহাকে অভ্যুপগম-সিদ্ধান্ত বলা যায়।

অবয়ব। যেমন দেহটা অবয়বী ও হস্তপদাদি তাহার এক একটী অবয়ব, সেইরূপ অবয়বি-স্বরূপ ন্যায়ের এক একটি অংশই অবয়ব। অবয়ব পাঁচটি; প্রতিজ্ঞা, হেতু, উদাহরণ, উপনয় ও নিগমন।

১। প্রতিজ্ঞা। কোন একটি স্থানে সিদ্ধির জন্য অসিদ্ধবিষয়ের নির্দ্দেশ। যথা—এ জগতের একজন কর্ত্তা আছেন।

২। হেতু। যাহা দ্বারা অজ্ঞাতবিষয়ের জ্ঞান হয়। যথা—যেহেতু এ জগৎ কতকগুলি কার্য্যের সমষ্টি মাত্র।

৩। উদাহরণ। সাধ্যের সহিত সমান-গুণবান্ যে দৃষ্টান্ত। যথা—কার্য্য হইলেই তাহার একজন কর্ত্তা থাকে, যেমন একটী অট্টালিকা ক্ষুদ্র ক্ষুদ্র কার্য্যের সমষ্টি বলিয়া তাহার একজন কর্ত্তা আছে।*

---

* সাধ্যের ঠিক বিপরীত-ধর্ম্মাবলম্বী দৃষ্টান্তকে ব্যতিরেকি-উদাহরণ বলে। যথা—আকাশ কার্য্যমাত্র নহে বলিয়া তাহার কর্ত্তা নাই। উপনয়ের সময় 'সেইরূপ নহে' এই শব্দ দ্বারা পক্ষে সাধ্যের বৈষম্য-দর্শন করিতে হইবে।

৪। উপনয়। উদাহরণের সহিত সাম্য দেখিয়া 'সেইরূপ' এই শব্দ দ্বারা সাধ্যে সাম্যের দর্শন। যথা—সেইরূপ এ জগৎটিও ক্ষুদ্র ক্ষুদ্র কতকগুলি কার্য্যের সমষ্টি মাত্র। অর্থাৎ এ জগতের প্রত্যেক অংশেই অল্পবিস্তর কার্য্য দেখিতে পাওয়া যায়।

৫। নিগমন। পক্ষে হেতুটির পুনর্দর্শন করিয়া প্রতিজ্ঞার পুনরাবৃত্তি। যথা—এ জগৎ কতকগুলি কার্য্যের সমষ্টি=অর্থাৎ এ জগতের প্রত্যেক অংশেই অল্পবিস্তর কার্য্য দেখিতে পাওয়া যায় বলিয়া ইহারও একজন কর্ত্তা আছেন।

পক্ষ। যেখানে সিদ্ধি করা যায়।

সাধ্য। যাহার সিদ্ধি করা যায়।

হেতু। যদ্দ্বারা সিদ্ধি করা যায়।

দৃষ্টান্ত। যাহার সমান দেখিয়া সিদ্ধি করা যায়।

তর্ক। প্রদর্শিত কারণের উপপত্তি দ্বারা কল্পনাবিশেষকে তর্ক বলে। অর্থাৎ বিরুদ্ধভাবের আরোপ দ্বারা বিরুদ্ধভাবের সম্ভাবনা করা। যেমন, জগৎ যদি কতকগুলি কার্য্যের সমষ্টি মাত্র না হয়, তবে তাহার একজন কর্ত্তা থাকার সম্ভাবনা নাই। তাহা হইলে 'যদি—না হয় বা না থাকে' এই শব্দ উল্লেখ করিয়া সিদ্ধিযোগ্য-পদার্থে বিরুদ্ধভাবের আরোপ দ্বারা 'তবে নাই বা থাকে না' এই শব্দ উল্লেখ করিয়া যে সিদ্ধিযোগ্য-পদার্থের বিরুদ্ধভাবের সম্ভাবনা করা যায়, তাহাকে তর্ক বলে

নির্ণয়। সন্দেহ করিয়া বিরুদ্ধপক্ষের স্থাপনা-পূর্ব্বক খণ্ডন দ্বারা পদার্থের যথাযথজ্ঞান। বাদ-বিচারের নির্ণয় পৃথক্; কারণ, বাদ-বিচারে সন্দেহ করিবার আবশ্যক হয় না।*

বাদ। ন্যায়ানুসারে সিদ্ধপক্ষ ও বিরুদ্ধ প্রতিপক্ষ স্বীকার করিয়া প্রমাণ ও তর্কদ্বারা সিদ্ধান্তের অবিরোধে সিদ্ধপক্ষের স্থাপনা এবং বিরুদ্ধ প্রতিপক্ষের খণ্ডনমূলক যে উক্তি প্রত্যুক্তি, তাহার নাম বাদ। যেমন গুরুশিষ্যের তত্ত্বজ্ঞানের জন্য বাদানুবাদ।

জল্প। ন্যায়ানুসারে সিদ্ধপক্ষ ও বিরুদ্ধপক্ষ গ্রহণ করিয়া প্রমাণ ও তর্কদ্বারা সিদ্ধপক্ষস্থাপন ও বিরুদ্ধ-প্রতিপক্ষের খণ্ডন এবং ছল জাতি ও নিগ্রহস্থান দ্বারা স্বপক্ষস্থাপন ও পরপক্ষ খণ্ডনমূলক যে কথা হয়, তাহাই জল্প। যেমন আজি কালিকার দুই একটি বিচার।

বিতণ্ডা। সেই জল্পকথাকেই বিতণ্ডা বলা যায়, যদি কোন একটী পক্ষের স্থাপনা না থাকে, কেবল পরপক্ষের খণ্ডন-মূলে কথা প্রবর্ত্তিত হয়। ইদানীন্তনের সাধারণ বিচার এইরূপেই হইয়া থাকে।

হেত্বাভাস। অপ্রকৃত-হেতুকেই হেত্বাভাস বলা যায়। হেত্বাভাস পাঁচ প্রকার; যথা—সব্যভিচার, বিরুদ্ধ, প্রকরণসম, সাধ্যসম ও অতীতকাল। উচ্যমান-শব্দের অর্থান্তর কল্পনা

* বৈদান্তিকেরা এ কথা স্বীকার করেন না। তাঁহাদের মতে সন্দেহ ভিন্ন কোন বিচার হইতে পারে না। অন্ততঃ ইচ্ছাকৃত সন্দেহপূর্ব্বক দুটী পক্ষ উপস্থিত করিতে হইবে; তবে যে কোন বিচার চলিবে; নতুবা কিরূপে বিচার করা যাইবে? অদ্বৈতসিদ্ধিকার এই কথা বলিয়াছেন।

ছল। জাতি। করিয়া বাক্যের ব্যাঘাত করাকে ছল বলে। ছল তিনপ্রকার; যথা—বাক্‌ছল, সামান্যচ্ছল ও উপচারচ্ছল। উদাহরণ-সিদ্ধ বা উদাহরণবিরুদ্ধ হেতু প্রদর্শন করিলে সমানধর্ম্ম বা বিষমধর্ম্ম অবলম্বন করিয়া যে দোষ দেওয়া যায়, তাহার নাম জাতি। নিগ্রহস্থান। জাতি চতুর্ব্বিংশতি প্রকার। বিরুদ্ধজ্ঞান বা অজ্ঞানকে নিগ্রহস্থান বলা যায়। নিগ্রহস্থান ষড়্‌বিংশতি প্রকার।

এই ষোড়শপদার্থের মধ্যে যে পদার্থ যতভাগে বিভক্ত এবং তাহার লক্ষণ, ও তাহার উপর যেরূপ বাদপ্রতিবাদ চলিতে পারে, মহর্ষি গোতম সে সকল অতিবিশদভাবে ক্রমশঃ ক্রমশঃ বলিয়াছেন। সে সকলগুলি বলিতে গেলে প্রবন্ধের আকার বাড়িয়া যায়; সুতরাং তাহা মূল-দর্শন হইতে জ্ঞাত হওয়াই যুক্তিসঙ্গত বলিয়া বিবেচিত হওয়ায় পরিত্যাগ করিলাম।

প্রকরণজ্ঞানের জন্য, অধ্যায়, আহ্নিক, মোট সূত্রসংখ্যা প্রত্যেক প্রকরণে যতগুলি সূত্র আছে, তাহার সংখ্যা এবং প্রকরণের নাম করিয়া পৃথক্ পৃথক্ তালিকা করিলাম। তাহাতে অধ্যায়ের অর্থ ও আহ্নিকের অর্থ দেওয়া গেল। ইহা দেখিলে সহজেই প্রায় সকল প্রস্তাবিত বিষয় বুঝিতে পারা যাইবে। তাহার বিশেষ বিশেষ অর্থ, ভাষ্য, বার্ত্তিক, তাৎপর্য্য ও বৃত্তি দেখিলে পরিস্ফুট হইবে।

প্রকরণের তালিকা দিবার কারণ।

প্রত্যেক অধ্যায়াদির সংক্ষিপ্ত তালিকা।

অধ্যায়ার্থ	আহ্নিকার্থ	সূত্রসংখ্যা	প্রাকরণিক-সূত্রসংখ্যা ও প্রকরণের নাম
১ম ষোড়শবিধ পদার্থের উদ্দেশ, লক্ষণ ও প্রসঙ্গ-ক্রমে ছলের পরীক্ষা।	১ম সাঙ্গোপাঙ্গ-ন্যায়ের লক্ষণ।	৪১	২, সপ্রয়োজন-প্রতিপাদ্য; ৬, প্রমাণ-লক্ষণ; ১৪, প্রমেয়-লক্ষণ; ৩, ন্যায়-পূর্ব্বাঙ্গ; ৬, ন্যায়-সিদ্ধান্ত; ৮ ন্যায়-স্বরূপ; ২, ন্যায়োত্তরাঙ্গ।
ঐ	২য় ছলপরীক্ষা-সহিত-বাদাদি-পরীক্ষা।	২০	৩, কথাস্বরূপ; ৬, হেত্বাভাস-লক্ষণ; ৮, ছল; ৩, দোষ-লক্ষণ।
২য় প্রমেয়, ছল ও জাতি-ভিন্ন সমস্ত পদার্থের পরীক্ষা।	১ম বিভাগ-সাপেক্ষ প্রমাণ পরীক্ষা ব্যতীত সমস্ত পদার্থের পরীক্ষা।	৬৭	৭, সংশয়-পরীক্ষা; ১২, প্রমাণ-সামান্য-পরীক্ষা; ১১, প্রত্যক্ষ-প্রমাণ-পরীক্ষা; ৪, অবয়বি-পরীক্ষা ২, অনুমান-পরীক্ষা; ৫, বর্ত্তমানকাল-পরীক্ষা; ৫, উপমান-পরীক্ষা; ৯, শব্দ-প্রমাণ-পরীক্ষা; ১২, বেদ-প্রামাণ্য-পরীক্ষা।

অধ্যায়ার্থ	আহ্নিকার্থ	সূত্রসংখ্যা	প্রাকরণিক-সূত্রসংখ্যা ও প্রকরণের নাম
ঐ	২য় বিভাগ সাপেক্ষ প্রমাণের পরীক্ষা।	৭১	১২ প্রমাণ চতুষ্টয় ; ২৮ শব্দানিত্যত্ব ; ১৯ শব্দপরিণাম ; ১২ শব্দশক্তিপরীক্ষা।
৩য় আত্মা, শরীর, ইন্দ্রিয়, অর্থ, বুদ্ধি, ও মনঃ, এই ছয়টী প্রমেয় পদার্থের পরীক্ষা।	১ম আত্মা, শরীর, ইন্দ্রিয় ও অর্থ, এই চারিটী প্রমেয় পদার্থের পরীক্ষা।	৭৫	৩ ইন্দ্রিয়ভেদ ; ৩ দেহভেদ ; ৯ চক্ষুরদ্বৈত ; ৩ মনোভেদ ; ৯ অনাদি নিধনাত্ম-প্রকরণ ; ২ শরীরপরীক্ষা ; ২১ ইন্দ্রিয় পরীক্ষা ; ১৩ ইন্দ্রিয় নানাত্ব ; ১২ বিষয়পরীক্ষা।
ঐ	২য় বুদ্ধি ও মনের পরীক্ষা।	৭৮	১০ বুদ্ধ্যনিত্যতা ; ৮ ক্ষণভঙ্গবাদ ; ২৬ বুদ্ধ্যাত্মতা ; ৫ বুদ্ধির উৎপন্নাপবর্গিতা ; ১০ বুদ্ধির শরীরগুণবিশেষতা, ৪ মনঃ-পরীক্ষা ; ১৪ শরীরের অদৃষ্টনিষ্পাদ্যতা।
৪র্থ কারণরূপ আত্মা-আদি পদার্থ ষট্‌কের কার্য্যস্বরূপ প্রবৃত্তি, দোষ, পুনর্জ্জন্ম, ফল, দুঃখ ও মুক্তির পরীক্ষা।	১ম প্রবৃত্তি, দোষ, পুনর্জ্জন্ম, ফল, দুঃখ ও মুক্তির পরীক্ষা।	৬৮	২, প্রবৃত্তি-দোষসামান্য-পরীক্ষা ; ৭. দোষ পরীক্ষা ; ৪ পুনর্জ্জন্মপরীক্ষা ; ৫ শূন্যোপাদানতা-নিরাকরণ ; ৩ ঈশ্বর-কারণতা ; ৩ আকস্মিকত্ব নিরাকরণ ; ৪ সর্ব্বানিত্যত্ব নিরাকরণ ; ৫ সর্ব্ব নিত্যত্ব নিরাকরণ ; ৩ সর্ব্ব পৃথক্ত্ব নিরাকরণ ; ৪ সর্ব্ব শূন্যতা নিরাকরণ ; ৩ সংখ্যৈকান্তবাদ নিরাকরণ ; ১১ ফল পরীক্ষা ; ৪ দুঃখপরীক্ষা ; ১০ মুক্তি পরীক্ষা।
ঐ	২য় মুক্তিদায়ক তত্ত্বজ্ঞানের পরীক্ষা।	৫০	৩ তত্ত্বজ্ঞানোৎপত্তি ; ১৪ অবয়বাবয়বি বিভাগ ; ৮ নিরবয়ব নিরূপণ ; ১২ বাহ্যার্থ ভঙ্গবাদ নিরাকরণ , ১২ সমাধ্যাদি সাধনাভ্যাসাধীন তত্ত্বজ্ঞানবিবৃদ্ধি ; ২ তত্ত্বজ্ঞানপরিপালন।

অধ্যায়ার্থ	আহ্নিকার্থ	সূত্রসংখ্যা	প্রাকরণিক-সূত্রসংখ্যা ও প্রকরণের নাম
৫ম জাতি-পরীক্ষার সহিত জাতি ও নিগ্রহস্থানের বিশেষ বিশেষ লক্ষণ-কীর্ত্তন।	১ম জাতি পরীক্ষা ও জাতির বিশেষ-লক্ষণ কীর্ত্তন।	৪৩	৩ সৎপ্রতিপক্ষদেশনাভাস ; ৩ জাতি ষট্‌ক ; ২ প্রাপ্ত্যপ্রাপ্তিসম জাতিদ্বয় ; ৩ প্রসঙ্গসম প্রতিদৃষ্টান্তসম ; ২ অনুৎপত্তিসম ; ২ সংশয়সম ; ২ প্রকরণসম ৩ অহেতুসম ; ২ অর্থাপত্তিসম ; ২ অবিজ্ঞেয়সম ; ২ উপপত্তিসম ; ২ উপলব্ধিসম ; ৩ অনুপলব্ধিসম ; ৩ অনিত্যসম; ২ নিত্যসম ; ২ কার্য্যসম ৫ কথাভাস।
ঐ	২য় নিগ্রহ-স্থানের বিশেষ লক্ষণ কীর্ত্তন।	২৫	৬ প্রতিজ্ঞাহেত্বন্যতরাশ্রিত নিগ্রহস্থান-পঞ্চক ; ৪ ইষ্টবাক্যার্থাপ্রতিপাদক নিগ্রহস্থান চতুষ্টয় ; ৩ স্বসিদ্ধান্তরূপ প্রয়োগাভাস নিগ্রহস্থানত্রিক ; ৩ পুনরুক্ত প্রকরণ ; ৩ উত্তরদানে অশক্তি-সূচক নিগ্রহস্থানত্রিক; ২ কৈতবকারিত নিগ্রহ স্থানদ্বিক ; ৪ নিগ্রহস্থান বিশেষ লক্ষণ।

সম্পূর্ণ সংক্ষিপ্ত তালিকা।

	অধ্যায়	আহ্নিক	সূত্র	প্রকরণ
	১ম	১ম	৪১	৭
	„	২য়	২০	৪
	২য়	১ম	৬৭	৯
	„	২য়	৭১	৪
	৩য়	১ম	৭৫	৯
	„	২য়	৭৮	৭
	৪র্থ	১ম	৬৮	১৪
	„	২য়	৫০	৬
	৫ম	১ম	৪৩	১৭
	„	২য়	২৫	৭
একুন	৫	১০	৫৩৮	৮৫
		বাদ	২	
			৫৩৬	
		অতিরিক্ত	৮	
			৫৪৪	

এতদ্ভিন্ন মহানুভব বিশ্বনাথ সিদ্ধান্তপঞ্চানন আরও আটটী সূত্র অধিক বলিয়া নির্দ্দেশ করিয়াছেন। সেগুলি ভাষ্যের অসম্মত বলিয়া বোধ হয় না, কারণ—

অতিরিক্ত সূত্রের তালিকা।

অধ্যায়	আহ্নিক	দত্তসূত্রাঙ্ক	প্রকরণ	সূত্রসংখ্যা
২য়	১ম	২৫।২৬	প্রত্যক্ষ পরীক্ষা	২
৩য়	১ম	২৯।৩০।৩১	শরীর পরীক্ষা	৩
৪র্থ	২য়	৭৮।৫১	অবয়বি প্রকরণ তত্ত্বজ্ঞান-পরিপালন	৩
৩য়ে	৩কে	৮ঙ্ক	৮৭	৮টী

কোন কোন সূত্রের ভাষ্যব্যাখ্যাও আছে ও সে ব্যাখ্যা ভাষ্যান্তর্গত বলিয়া বোধ হয়। কোন কোনটীর ভাষ্যে উল্লেখমাত্রও নাই।

ইহাদ্বারা ৫৪৪টী সূত্রে বৃত্তির সম্মতি পাওয়া যাইতেছে। তথাপি বেদান্তবাগীশ মহাশয় যে কোন্ হিসাবে ৫২১ সূত্র স্থির করিয়াছেন, তাহা তিনিই বলিতে পারেন।

আমরা যখন, চারিশতাব্দী ধরিয়া বৃত্তির সম্মতিক্রমে ৫৪৪টী সূত্র নৈয়ায়িকমণ্ডলী নির্বিরোধে স্বীকার করিয়া আসিতেছেন দেখিতেছি, তখন সেই সংখ্যাই অভ্রান্ত বলিয়া মনে করিলে বোধ হয় নিষ্পাপভাবে পরিগৃহীত হইতে পারিব।

ঐ সূত্রগুলি যথাযথ অধ্যয়ন করিলে এবং সূত্রার্থ, প্রকরণার্থ, আহ্নিকার্থ ও অধ্যায়ার্থ বিশেষরূপে পর্য্যালোচনা করিলে দেখিতে পাওয়া যাইবে, 'যে যাহা, ঠিক সে তাহাই।' তাহা হইলে, তখন বুঝিতে পারা যাইবে যে, অজ্ঞানবশতঃ লোকে অকিঞ্চিৎকর কামিনী, কাঞ্চন ও মদিরাদিতে অনুরাগ করে এবং অন্য কাহার দ্বারা স্বার্থে প্রতিহত হইয়া দ্বেষ-হিংসাদি করিয়া পাপসঞ্চয় বা পুণ্যসঞ্চয় করিয়া বসে। তদ্দ্বারাই স্বর্গ নরকাদিতে বারংবার গতায়াত করিয়া আত্মাকে অশেষ জ্বালাময়-সংসারের কীট অপেক্ষাও হীন মনে করিয়া থাকে। কেহবা সেই দুঃখস্রোতে পড়িয়া আত্মার পরকালাদিতে আস্থা স্থাপন করিতে পারে না। তাহার মূল-কারণ ঐ মিথ্যাজ্ঞান ভিন্ন আর কিছুই নহে। মিথ্যাজ্ঞান বহু-প্রকার—আত্মা নাই বা থাকা সম্ভবও নয়, দেহই আত্মা, মন বা বুদ্ধিই আত্মা, অথবা ইন্দ্রিয়সমষ্টিই আত্মা, এইরূপ অনাত্মা=দেহেন্দ্রিয়াদিতে আত্মজ্ঞান; এই মিথ্যাজ্ঞান হয় বলিয়া অন্যান্য মিথ্যাজ্ঞানের উপস্থিতি অনিবার্য্য। যথা—দুঃখে ও দুঃখমিশ্রিত সুখে সুখজ্ঞান, যথা—মৎস্যমস্তকচর্ব্বনাদি বড়ই সুখকর। অনিত্যে নিত্যজ্ঞান, যথা—পৃথিবী ও চন্দ্রসূর্য্যাদি চিরস্থায়ী। অত্রাণে ত্রাণজ্ঞান, যথা—স্থাবরও অস্থাবর-সম্পত্তি-আদি শেষের ভরসাস্থল। সভয়ে নির্ভয়জ্ঞান, যথা—ধনসঞ্চয় প্রভৃতি, ব্যাধি ও দুর্ভিক্ষাদি হইতে রক্ষা প্রকৃষ্টতম উপায়। জুগুপ্সিতে রমণীয়-জ্ঞান, যথা—মনোভূয়িষ্ঠ কামিনী দেহাদি কি মনোরম? ত্যাজ্যে অত্যাজ্য জ্ঞান, যথা—মদ্যপানাদি পরিমিত হইলে স্বাস্থ্যরক্ষা করিয়া থাকে।

মূল মিথ্যাজ্ঞান।

উহার পুত্রকন্যা।

কর্ম্মাধর্ম্মাদিতে—

পাপ বা পুণ্য জন্মে এরূপ কর্ম্মও নাই বা কর্ম্মফলও নাই।

রাগদ্বেষমোহে—

অনুরাগ বা হিংসাদি দ্বারা স্বর্গনরকাদিতে অবশ হইয়া যাতায়াত করিতে হয় না।

জন্মান্তরে—

জন্তু বা জীব, সত্ত্ব বা আত্মা বলিয়া একটি পদার্থই নাই, যে মরিয়া আবার জন্মিবে। জন্মের প্রতি কোনই কারণ নাই, জন্ম-নিবৃত্তিরও কোন কারণ নাই, সুতরাং জন্মান্তরের আদি আছে, কিন্তু অন্ত নাই। কোনও কারণবশে জন্মান্তর হইতে পারে বলিয়া কর্ম্ম তাহার কারণ নহে। দেহ, ইন্দ্রিয়, বুদ্ধি ও সুখদুঃখ-প্রবাহের উচ্ছেদ ও উপস্থিতি দ্বারাই জন্মান্তর সাধিত হয়, তোমার আত্মা দ্বারা নহে।

অপবর্গে বা মুক্তিতে—

তোমার অপবর্গ বড়ই ভয়ঙ্কর। তোমরা বলিয়া থাক—সেই অপবর্গে সকল কার্য্যই চুকিয়া যায়, সকলেরই সহিত সুচির-বিয়োগ হয়, এবং সমস্ত মঙ্গলই থামিয়া যায়; সুতরাং কোন্ বুদ্ধিমান্ তোমার সমস্ত সুখের উচ্ছেদকর চৈতন্যরহিত অপবর্গে রুচি করিবে? এইরূপ জ্ঞানকেই মিথ্যাজ্ঞান বলা যায়। ইহার ফল বড়ই ভয়ঙ্কর। যথা—

ইহাদ্বারা মনোঽনুকূলবিষয়ে আসক্তি=অনুরাগ বা ভালবাসা জন্মে, ও প্রতিকূল বিষয়ে দোষ। দ্বেষ বা হিংসার আবির্ভাব হয়। ঐ রাগ ও দ্বেষকে অবলম্বন করিয়া ঈর্ষ্যা, অসূয়া, মায়া, মমতা, লোভ ও অনবধানতা-আদি আসিয়া যায়। এ গুলি সমস্তই দোষ পদবাচ্য।

এই দোষেই মানবগণ হিংসা, চৌর্য্য ও নিষিদ্ধ-স্ত্রীসঙ্গাদি দ্বারা শারীর-পাপ, মিথ্যা কঠোর-পাপপ্রবৃত্তি। কখনও অসম্বন্ধপ্রলাপাদি দ্বারা বাক্যজ-পাপ; পরদ্রোহ, পরের দ্রব্যে ইচ্ছা ও নাস্তিক্য প্রভৃতি মানসিক-পাপ করে। ইহাকে পাপপ্রবৃত্তি বলে।

ঐ দোষেই দান, পরিত্রাণ ও সেবাশুশ্রূষাদি দ্বারা শরীরজাত পুণ্য; সত্য, হিতকর, প্রিয় ও পুণ্যপ্রবৃত্তি। বেদাধ্যয়নাদি দ্বারা বাক্যজ-পুণ্য; এবং দয়া, অস্পৃহা ও শ্রদ্ধাদি দ্বারা মানসিক-পুণ্যও করে। ইহাকে পুণ্যপ্রবৃত্তি বলে।

ইহাদ্বারা হয় কুৎসিত-জন্ম, না হয় পূজিত-জন্ম লাভ হইয়া থাকে। জন্ম হইলেই ফলে জন্ম ও তজ্জন্য দুঃখ। দুঃখভোগ একান্ত অনিবার্য্য। প্রতিকূল বলিয়া যাহাকে জানা যায়, তাহাই দুঃখ; তাহাকে তাপ, জ্বালা ও যন্ত্রণাদি নামে বলা হয়।

তত্ত্বজ্ঞান ইহার বিপরীত। আত্মা সত্যসত্যই আছেন, শরীরাদি আত্মা নয় অনাত্মা পার্থিব-বিকার। দুঃখ ও দুঃখমিশ্রিত সুখ বিষ ও বিষসম্পৃক্ত অন্নের ন্যায় সুখ বা সুখকর নয়, দুঃখ বা দুঃখকর। জুগুপ্সিতবস্তু রমণীয় নহে, সে নিন্দনীয়। ত্যাজ্যবস্তু অত্যাজ্য নহে, ত্যাজ্যই।

ধর্ম্মাধর্ম্মাদিতে—

প্রত্যেক কর্ম্মই যখন কিছুনা কিছু সংস্কার না জন্মাইয়া বিনষ্ট হয় না, তখন নিশ্চয়ই কর্ম্মের অস্তিত্বে বিশ্বাস না করিয়া পারা যায় না। অতএব কর্ম্মের ফলও আছে।

রাগদ্বেষমোহে—

অনুরাগ বা হিংসাদ্বারা সুখময় স্বর্গ ও দুঃখময় নরক ভোগ করিতে হয়। যেমন দধ্যাদি-ভোজন দ্বারা কালে জ্বরাদি হইয়া থাকে, সেইরূপ আসক্তিপ্রযুক্ত কর্ম্মজ সংস্কার দ্বারা পরিচালিত হইয়া জীব নরকাদিতে নিতান্ত অবশের ন্যায় যাতায়াত করিয়া থাকে। সুতরাং রাগদ্বেষামোহ-নিমিত্তকই সংসার।

প্রেত্যভাবে বা জন্মান্তরে—

জন্তু বা জীব, সত্ত্ব বা আত্মা একটী নিত্যসিদ্ধ পদার্থ আছে, যে মরিয়া উৎপন্ন হয়। যতদিন পর্য্যন্ত মুক্তি না হয়, ততদিনপর্য্যন্ত জন্ম ও মৃত্যুর নিমিত্ত থাকায় তাহার বারম্বার আবর্ত্তন হইয়া থাকে। সুতরাং অনাদি ও সান্ত, অন্তহীন নহে। তাহার গ্রহণকর্ত্তা একটী আত্মা থাকায় দেহ, ইন্দ্রিয়, বুদ্ধি ও বেদনা প্রবাহের উচ্ছেদ ও উপস্থিতি দ্বারা প্রবর্ত্তন হয়। তত্ত্বজ্ঞানোদয় হইলে, মিথ্যাজ্ঞান, রাগ-দ্বেষ-মোহ, ধর্ম্মাধর্ম্ম ও তজ্জন্য জন্মের নিবৃত্তি হওয়ায় শরীরেন্দ্রিয়াদি না থাকাহেতু পুনর্ব্বার দুঃখোৎপত্তি হইতে পারে না; সুতরাং তখন সর্ব্বতো-ভাবেই শান্তি বিরাজিত হয়। সকলের সহিত সম্বন্ধ চুকিয়া যায় বটে; কিন্তু তাহাতে ক্ষতি কি? সকলেই যে দুঃখের হেতু, সুখের হেতু ত কেহই নহে। তাহাদিগের নিবৃত্তিই অপবর্গ। যদি বহু কষ্ট ও ঘোর পাপ বিলুপ্ত হয়, তবে সর্ব্বদুঃখোচ্ছেদ বা সমস্ত দুঃখের না জানিতে পারার অবস্থা সেই অপবর্গ কোন্ বুদ্ধিমানের অরুচিকর হইবে?—

এইরূপ জ্ঞানকেই যথার্থতঃ তত্ত্বজ্ঞান বলা যাইতে পারে। তত্ত্বজ্ঞান দ্বারা অপবর্গ লাভ করিতে হইলে সমাধিবিশেষের অনুষ্ঠান করিতে অভ্যাস করা উচিত। নিরুপদ্রবস্থানে বসিয়া যোগাভ্যাস করিতে হয় বলিয়া অরণ্য, গুহা ও পুলিনাদি স্থানই প্রশস্ত।

৪।২।৩৮ সূত্রার্থ।

৪।২।৪২ সূত্রার্থ।

যোগাচারবিধানপূর্ব্বক যোগশাস্ত্রানুসারে যম, নিয়ম, আসন, প্রাণায়াম, প্রত্যাহার, ধারণা, ধ্যান ও সম্প্রজ্ঞাতসমাধির অনুষ্ঠান করিলে চিত্তের অবিদ্যা বা অজ্ঞানরূপ অশুদ্ধির ক্ষয় হইয়া দেহাদি হইতে আত্মাকে ভিন্নরূপে দেখিবার ক্ষমতা জন্মে, তাহাই আত্মসংস্কার বা যোগজধর্ম্ম নামে অভিহিত হয়।

৪।২।৪৬ সূত্রার্থ।

সমাধির বিষয় নির্ব্বাচন করিবার জন্য প্রস্তুত ন্যায়শাস্ত্রের পুনঃ পুনঃ অধ্যয়ন ও

* বোধ হয় সংসার ছাড়াটা তত সুবিধাজনক নহে ভাবিয়া বৃত্তিকার বলিয়াছেন 'ইদং ন সূত্রং ভাষ্যমিতি কেচিৎ' যাহাই হউক শেষে কিন্তু বৃত্তি করিয়াছেন।

অর্থের ধারণা দ্বারা দৃঢ়তর সংস্কারের উদ্বোধন ও ন্যায়শাস্ত্রাভিজ্ঞ
৪।২।৪৭ সূত্রার্থ। অভিযুক্তগণের সহিত স্বকৃতসিদ্ধান্তের সংবাদ করিয়া স্বীয় অনুভবের দৃঢ়তা ব্যবস্থাপন করা কর্ত্তব্য।

শিষ্য, গুরু, সব্রহ্মচারী=সহাধ্যায়ী বা প্রকৃষ্টজ্ঞানবান্, ও মুমুক্ষুগণ বিজিগীষাপরতন্ত্র না
৪।২।৪৮ সূত্রার্থ। হইলে ইঁহাদিগের সহিত স্বকৃতসিদ্ধান্তের সত্যমিথ্যাত্বের নিশ্চয়ার্থে
৪।২।৫০-৫১ সূত্রার্থ। পর্য্যালোচনা করিবে। স্বকীয়জ্ঞানের পরিশুদ্ধি করিবার আবশ্যক বোধ হইলে প্রয়োজনানুসারে বিরুদ্ধপক্ষ স্থাপন না করিয়া ন্যায়চর্চ্চা করা উচিত।

পরস্পর বিরুদ্ধ-পক্ষাবলম্বী হইলে স্বপক্ষে আসক্তি হওয়ায় প্রাবাদুকগণ ন্যায়পথ অতিক্রম করিয়া থাকে; সুতরাং যেমন কণ্টকবৃক্ষ উৎপদ্যমান অঙ্কুরের
৪।২।৫০-৫১ সূত্রার্থ। পরিপালন জন্য সর্ব্বাঙ্গে কণ্টক ধারণ করিয়া থাকে, সেইরূপ সেখানেও তত্ত্বজ্ঞানের পরিপালনার্থ জল্প ও বিতণ্ডার আশ্রয় গ্রহণ করিবে। বিদ্যাপালনের জন্য এরূপ করিলে ক্ষতি হইবে না; কিন্তু লাভ, পূজা বা খ্যাতির জন্য এরূপ করা কখনই উচিত নহে। তাহাতে অনিষ্ট হওয়ার বিশেষ সম্ভাবনা।

মুমুক্ষুগণের জ্ঞেয়বস্তুর মধ্যে কতকগুলি নিত্য ও কতকগুলি অনিত্য। পরমসূক্ষ্ম ভূত-
৪।১।২৮ সূত্রার্থ। চতুষ্টয়—ক্ষিতি, অপ্, তেজঃ, মরুৎ, এবং আকাশ, কাল, দিক্, আত্মা ও মনঃ ও ইঁহাদিগের কোন কোন গুণবিশেষ, আর সামান্য=জাতি, বিশেষ ও সমবায়, এগুলির উৎপত্তি বা বিনাশ প্রমাণসিদ্ধ নহে বলিয়া ইহারা
৪।১।২৯-৩০ সূত্রার্থ। নিত্যসিদ্ধপদার্থ। পঞ্চভূত নিত্য বলিয়া তজ্জাত বিকারগুলি নিত্য হইতে পারে না, তাহাদিগের উৎপত্তিবিনাশ ত প্রত্যক্ষসিদ্ধ। এই সকল অনিত্যবিকার
৪।২।১৬ সূত্রার্থ। পৃথিব্যাদির খণ্ডলয় হইয়া থাকে; কিন্তু মহাপ্রলয় হইতে পারে না, কেননা, পরমাণু নিত্য-পদার্থ, তাহার বিনাশ উপলব্ধি করিবার কোনও প্রমাণ নাই। যেখানে
৪।২।১৭ সূত্রার্থ। যাইয়া বিভাগ শেষ হয়, তাহাই পরমাণু। পরমাণুগণ স্পর্শ-ধর্ম্মক, একটি অন্যটির সহিত সংযুক্ত হইলেও উভয়ের মধ্যে স্পর্শদ্বারা ব্যবধান বা
৪।২।২৪ সূত্রার্থ। ফাঁক থাকিয়াই যায়; সুতরাং একটি অন্যটির উপর চড়িয়া বসে না
প্রতিবাদীর উক্তার্থ হইলেও বা বসিতে পারে না। নিরবয়ববস্তুর উপর, নিম্ন, ও পার্শ্বাদিব্যবহার
স্বসিদ্ধান্তার্থ নিশ্চয়। দিক্‌পদার্থের সাহায্যেই করা হয়। বাস্তবিক, নিরবয়বের এদিক্ ওদিক্, সেদিক্ নাই। সেইজন্য বিন্দু বা পয়েন্টের ন্যায় পরমাণুসকল পরিমণ্ডল=সুগোল বা বর্ত্তুল। একটি বাটুল (বর্ত্তুল) যেমন অন্য একটি বাঁটুলের উপর থাকিতে পারে না, একটি বিন্দুর উপর যেমন আর একটি বিন্দু দাঁড়াইতে পারে না, সেইরূপ একটী পরমাণুর উপর আর
৪।১।১৩ সূত্রার্থ। একটি পরমাণুও থাকিতে পারে না। তবে ঈশ্বরেচ্ছায় একটি
৪।২১।১-১২ সূত্রার্থ। অন্যটির অতি নিকট হইতে পারে, সেই অতিনৈকট্যই পরমাণুর সংযোগ ও সেইরূপ অতিনৈকট্য হইলে দুটিতে দ্ব্যণুকের উৎপত্তি হয়। তারপর ত্র্যণুকাদিক্রমে

ব্রহ্মাণ্ডোৎপত্তি অসম্ভব নয়। বস্তুর অংশান্তর না থাকিলেও অতিনৈকট্যরূপ সংযোগ হইতে পারে।*

৪।১।১৯-২০-২১ সূত্রার্থ।

জগতের সমস্ত কার্য্যের আদিকারণ ঈশ্বর। পুরুষসকল সর্ব্বজ্ঞ নহে বলিয়া আদিকারণ হইতে পারে না। তবে জীবাদৃষ্ট আদিকারণ হইতে পারে; কিন্তু পুরুষের কর্ম্মানুষ্ঠানে প্রবৃত্তির প্রেরণাও ঈশ্বরের অধীন; সুতরাং পুরুষদিগের কৃতকর্ম্মের ফলানুসারে আদি-অবস্থায় পরমাণুগণের নৈকট্য ঘটাইয়া তাহার সাহায্যে দ্ব্যণুকাদিক্রমে প্রকাণ্ড জড়ব্রহ্মাণ্ডের ও পুরুষের সাহায্যে জীব-জগতের সৃষ্টি করিয়া ঈশ্বর তাহাদিগকে যেরূপ প্রবর্ত্তিত করিতেছেন, তাহারা সেইরূপে প্রবর্ত্তিত হইতেছে, এবং যেরূপে নিবর্ত্তিত করিতেছেন, সেইরূপে নিবর্ত্তিত হইতেছে। অতএব অদৃষ্টচক্রের সাক্ষী ঈশ্বরই প্রবৃত্তি-নিবৃত্তির মূল কারণ। আমরা সেই অদৃষ্টসাক্ষী ঈশ্বরের স্মরণ করিয়া এইখানেই প্রবন্ধের উপসংহার করিলাম।

শ্রীগঙ্গাচরণ বেদান্তবিদ্যাসাগর ভট্টাচার্য্য।

* ভাষাপরিচ্ছেদের ভূমিকায় রায়বাহাদুর রাজেন্দ্রচন্দ্র শাস্ত্রী বলিয়াছেন, 'দ্ব্যণুকাদিক্রমে ব্রহ্মাণ্ডোৎপত্তি প্রক্রিয়া গৌতম-সূত্রে নাই, উহা বৈশেষিকের নিজস্ব।' এ কথাটি কতদূর সত্য, তাহা সত্যানুসন্ধিৎসুগণ মৎপ্রদর্শিতসূত্র ও তদ্ভাষ্যবার্ত্তিকাদির যথাযথ পর্য্যালোচনা করিলেই বুঝিতে সমর্থ হইবেন। শাস্ত্রীমহাশয় সেইখানেই আবার বলিয়াছেন, 'তবে বার্ত্তিকাদিতে উৎপত্তিপ্রক্রিয়া মার্জ্জিত আকার দেখিতে পাওয়া যায় বটে; কিন্তু সূত্রে তাহার নাম গন্ধও দেখিতে পাওয়া যায় না।' আমি কিন্তু সূত্র হইতে সেই সেই কথা উঠাইয়া দেখাইয়াছি।

সম্পাদকীয় মন্তব্য।

সাহিত্যপরিষদের গত ষষ্ঠ মাসিক অধিবেশনে পূর্ব্বপ্রবন্ধ পঠিত ও গৃহীত হওয়ায় প্রকাশিত হইল। প্রবন্ধমধ্যে ব্যক্তি বিশেষের উপর যে শ্লেষোক্তি আছে, তাহা পরিষদের অনুমোদিত নহে। প্রবন্ধের সকলাংশের সহিতও আমরা একমত হইতে পারিলাম না।

১। পূজনীয় প্রবন্ধলেখক "নিঃসংশয়ে গোতম ত্রেতাযুগের অবতার শ্রীরামচন্দ্রের সমসাময়িক" বলিয়া মত প্রকাশ করিয়াছেন। কিন্তু এ সম্বন্ধে আমাদের যথেষ্ট সংশয় আছে। ব্রহ্মাণ্ডপুরাণে (অনুষঙ্গপাদ ২৩ অধ্যায়) লিখিত আছে—

"যদা ব্যাসঃ সুরক্ষণঃ পর্য্যায়ে তু চতুর্দ্দশে। তত্রাপি পুনরেবাহং ভবিষ্যামি যুগান্তিকে ॥৯৪
বনে ত্বঙ্গিরসঃ শ্রেষ্ঠো গৌতমো নাম যোগবিৎ। তস্মাত্তু বিষ্যতি পুণ্যং গৌতমং নাম তদ্বনম্ ॥"৯৫

অর্থাৎ চতুর্দ্দশ দ্বাপরে ব্যাসরূপে সুরক্ষণের আবির্ভাব হইলে, আমি অঙ্গিরা ঋষির পবিত্র বনে গৌতম নামে উৎপন্ন হইয়া যোগাচরণ করিব। আমার নামানুসারে সেই পবিত্র বনের নামও গৌতম হইবে। আবার ইহার পরে উক্ত পুরাণেই ২৩ অধ্যায়ে লিখিত আছে,—

"সপ্তবিংশতিমে প্রাপ্তে পরিবর্ত্তে ক্রমাগতে। জাতুকর্ণো যদা ব্যাসো ভবিষ্যতি তপোধনঃ ॥১৪৯
তদাহপ্যহং ভবিষ্যামি সোমশর্ম্মা দ্বিজোত্তমঃ। প্রভাসতীর্থমাসাদ্য যোগাত্মা লোকবিশ্রুতঃ ॥১৫০
তত্রাপি মম তে পুত্রাঃ ভবিষ্যন্তি তপোধনাঃ। অক্ষপাদঃ কণাদশ্চ উলূকো বৎস এব চ ॥"১৫১

অর্থাৎ সপ্তবিংশতি দ্বাপরে তপস্বী জাতূকর্ণ ব্যাসরূপ পরিগ্রহ করিলে, আমি প্রভাসতীর্থে যোগনিষ্ঠ দ্বিজশ্রেষ্ঠ সোমশর্ম্মা নামে অবতীর্ণ হইয়া ত্রিলোকবিখ্যাত হইব, আমার এই সময়-জাত যোগাত্মা তপোনিরত পুত্রগণের নাম অক্ষপাদ, কণাদ, উলূক ও বৎস।

উক্ত শাস্ত্রীয় প্রমাণ অনুসারে দেখা যাইতেছে যে, দ্বাপর যুগের বিভিন্ন সময়ে গৌতম, অক্ষপাদ প্রভৃতি নামধেয় যোগবিৎ ঋষিগণ আবির্ভূত হইয়াছিলেন। তাঁহারা যে বিভিন্ন শাস্ত্র-প্রবর্ত্তক, তাহা ব্রহ্মাণ্ডপুরাণ হইতেই জানিতে পারি।* এরূপ স্থলে ন্যায়সূত্রকার গোতমকে আমরা নিঃসন্দেহে ত্রেতাযুগের লোক বলিয়া গ্রহণ করিতে পারিলাম না।

২। বাচস্পতি মিশ্র ও উদয়নাচার্য্যের কালনির্ণয় সম্বন্ধে প্রবন্ধলেখক কোন স্থির সিদ্ধান্ত করিতে পারেন নাই। কিন্তু উভয় দার্শনিকের স্ব স্ব উক্তিদ্বারা নিঃসন্দেহে কালনির্ণয় হইতে পারে। বাচস্পতিমিশ্র স্বরচিত ন্যায়সূচী নিবন্ধের শেষ ভাগে লিখিয়াছেন—

"ন্যায়সূচীনিবন্ধোহসাবকারি সুধিয়াং মুদে। শ্রীবাচস্পতিমিশ্রেণ বস্বঙ্কবসু-(৮৯৮)-বৎসরে ॥"

অর্থাৎ সুধীগণের প্রমোদনার্থ শ্রীবাচস্পতি মিশ্র কর্ত্তৃক ৮৯৮ শকবর্ষে অর্থাৎ ৯৭৬ খৃষ্টাব্দে এই ন্যায়সূচীনিবন্ধ রচিত হয়। এইরূপে উদয়নাচার্য্যও স্বরচিত লক্ষণাবলীর শেষে লিখিয়াছেন,—

"তর্কাম্বরাঙ্কপ্রমিতেষ্বতীতেষু শকান্ততঃ। বর্ষেষূদয়নশ্চক্রে সুবোধাং লক্ষণাবলীম্ ॥"

---

* বিশ্বকোষ-কার্য্যালয় হইতে প্রকাশিত ব্রহ্মাণ্ডপুরাণ দ্রষ্টব্য।

অর্থাৎ উদয়নাচার্য্য ৯০৬ শক (৯৮৪ খৃষ্টাব্দ) অতীত হইলে সুখবোধ্য লক্ষণাবলী রচনা করেন।

৩। প্রবন্ধলেখক বিশ্বনাথ ন্যায়পঞ্চাননকে ৪১৯ বর্ষ পূর্ব্বের লোক স্থির করিয়াছেন, ইহাও সমীচীন বলিয়া মনে হইল না। বাসুদেব সার্ব্বভৌম ও তাঁহার ভ্রাতা রত্নাকর বিদ্যা-বাচস্পতি মহাপ্রভু চৈতন্যদেবের সমসাময়িক। বিশ্বনাথ উক্ত বিদ্যাবাচস্পতির পৌত্র ও বিদ্যানিবাসের পুত্র হইতেছেন।* এরূপ স্থলে বরং তাঁহাকে মোটামুটি ৫৫০ বর্ষের লোক বলা যাইতে পারে।

প্রবন্ধলেখক যে সকল নৈয়ায়িক প্রসঙ্গ উপস্থিত করিয়াছেন, তদ্ব্যতীত আরও শত শত প্রাচীন ন্যায়গ্রন্থকার ছিলেন। বাহুল্য বোধে তাঁহাদের পরিচয়-দানে ক্ষান্ত হইলাম। †

বিদ্যাধর।

যশোরাধিপতি বঙ্গবীর প্রতাপাদিত্য অত্যন্ত প্রবল ও দুর্দ্ধর্ষ হইয়া বাদশাহের বশ্যতা অস্বীকার করিলে, বাদশাহ জাহাঙ্গীর তাঁহার বিরুদ্ধে অম্বররাজ মানসিংহকে প্রেরণ করেন। মানসিংহ প্রতাপের নিকট বার বার পরাজিত ও তাঁহার এক পুত্র রণস্থলে নিহত হন। প্রতাপাদিত্য নিরন্তর যুদ্ধে কেন বিজয়ী হন, মানসিংহ তাহার কারণানুসন্ধানে প্রবৃত্ত হইলেন। জানিতে পারিলেন—প্রতাপের গৃহে শিলাদেবী নামক বিগ্রহ প্রতিষ্ঠিত আছেন, প্রতাপ তাঁহারই কৃপায় রণবিজয়ী। মানসিংহ তাঁহাকে হোম, যজ্ঞ ও স্তবাদিদ্বারা প্রসন্ন করিতে প্রবৃত্ত হইলেন। প্রবাদ আছে, তখন মাতাও প্রতাপের অপরাধসমূহ স্মরণ করিয়া ছলনা করিবার জন্য তাঁহার যুবতী কন্যার রূপ ধারণ করিয়া সভাস্থলে প্রবেশ করেন। তদ্দৃষ্টে প্রতাপ ক্রুদ্ধ হইয়া কন্যারূপিণী দেবীকে কহেন, নির্লজ্জে তুই আমার গৃহ হইতে দূর হ। সুতরাং মানসিংহ সহজেই শিলাদেবীর অনুগ্রহ লাভ করিলেন।

মাতা তাঁহাকে বলেন, তুমি যদি আমাকে প্রত্যহ একটী করিয়া বলি অর্পণ করিতে পার, তবে আমি তোমার হইব। যখনই তুমি এ বিষয়ে ত্রুটী করিবে, তোমার সঙ্গে তখনই আমার চুক্তি ভঙ্গ হইবে। মানসিংহ তাহাতেই সম্মত হইয়া শিলাদেবীকে আপনার অম্বর রাজধানীতে আনিয়া স্থাপন করিলেন। সেই অবধি আজ পর্য্যন্ত একটী করিয়া ছাগবলি শিলাদেবীর মন্দিরে অর্পিত হয়। রাজা দেবীর সঙ্গে তাঁহার পুরোহিত রত্নগর্ভ সার্ব্বভৌম ভট্টাচার্য্যকে

---

* বঙ্গের জাতীয় ইতিহাস ১মাংশ ২৯৫ পৃষ্ঠা দ্রষ্টব্য।

† যাঁহারা সেই সকল নৈয়ায়িকগণের সংক্ষিপ্ত ইতিহাস জানিতে ইচ্ছা করেন, তিনি বিশ্বকোষের ১০ম ভাগে, "ন্যায়" শব্দ পাঠ করিতে পারেন।

আনয়ন করেন। ইনি পাশ্চাত্য-বৈদিক শ্রেণীর ব্রাহ্মণ। ভট্টপল্লী ও ঘল্‌ঘলের বৈদিকগণের সহিত ইঁহাদের এক আভিজাত্য। রত্নগর্ভ আপনার কন্যাগণের জন্য বঙ্গদেশ হইতেই স্বশ্রেণীর ব্রাহ্মণ আনাইয়া জামাতৃত্বে বরণ করেন। রাজেন্দ্র চক্রবর্ত্তী ও রামনারায়ণ নামক দুই ভ্রাতা তাঁহার সাত কন্যার মধ্যে দুই কন্যাকে বিবাহ করেন। রাজেন্দ্রের পুত্র শান্তেন্দ্র চক্রবর্ত্তী (পাট্টায় সন্তোষরাম চক্রবর্ত্তী বলিয়া উল্লিখিত) মহারাজ সবাই জয়সিংহের নিকট সম্বৎ ১৭৫৬ (১৭০০ খৃষ্টাব্দে) ফাল্গুনমাসে ৫১ বিঘা ভূমি উদকদান প্রাপ্ত হন। (গঙ্গাজল গ্রহণপূর্ব্বক সঙ্কল্প করিয়া ব্রাহ্মণকে যে দান করা হয়, তাহার নাম উদকদান।) জয়সিংহ একবৎসরমাত্র সিংহাসনারোহণ করিয়াই সন্তোষরামকে ৫১ বিঘা ভূমি দান করাতে বুঝিতে হইবে যে তিনি উক্ত বাঙ্গালীকে বিশেষ বুদ্ধিমান্ দেখিয়াই উচ্চপদে অধিষ্ঠিত করেন। সম্বৎ ১৭৭২ (১৭১৫ খৃষ্টাব্দে) সন্তোষরামের মৃত্যু হইলে তাঁহার পুত্র বিদ্যাধর পিতৃসম্পত্তির উত্তরাধিকারী হইলেন। ঐ সালের শ্রাবণ-কৃষ্ণচতুর্দ্দশী তিথিতে তাঁহার জন্য এইরূপ একটী হুকুম দেওয়া হয় যে, তাঁহার পিতৃসম্পত্তি সাহনকোটরা ১২ বিঘা ও সাচড়ী ৩৯ বিঘা যেন তাঁহাকে ভোগ করিতে দেওয়া হয়। এই হুকুমের মোহর পারসী অক্ষরে খোদিত। ইহার পর হইতে বিদ্যাধর ও তাঁহার বংশীয়েরা যে সকল পাট্টা প্রাপ্ত হন, তাহাতে হিন্দী অক্ষর খোদিত। ইহাতে বুঝিতে হইবে যে বিদ্যাধরের প্রাধান্যের সঙ্গে সঙ্গে অম্বরের রাজবংশরূপ চন্দ্র মোগলরাহুর গ্রাস হইতে ক্রমশঃ মুক্ত হইতেছিল।

কথিত আছে, বিদ্যাধরের মাতুল কিষণরাম (কৃষ্ণরাম) জয়সিংহের রাজত্বের প্রারম্ভ কালে দেওয়ান ছিলেন। একদা কিষণরামের সহিত রাজা অম্বরে মতিমহল নামক একটী নির্ম্মীয়মাণ প্রাসাদ পর্য্যবেক্ষণ করিতে করিতে ছাদে উঠিবার সিঁড়ী দেখিতে না পাইয়া জিজ্ঞাসা করিলেন, সিঁড়ী কি হইবার উপায় নাই? মিস্ত্রিরা একবাক্যে অস্বীকার করিল। কিষণরামের ভাগিনেয় বালক বিদ্যাধর সেইখানে ছিলেন। তিনি মাতুলকে বলিলেন, যদি আমাকে পাঁচসের মোম দেওয়া হয়, তবে আমি বলিয়া দিতে পারি সিঁড়ী হইতে পারে কি না। কিষণরাম রাজাকে জানাইলে তিনি বিদ্যাধরকে পাঁচসের মোম দিবার আজ্ঞা দিলেন। বিদ্যাধর বাড়ী গিয়া ঐ মোমে ঠিক মতিমহলের অনুরূপ একটী বাড়ী প্রস্তুত করিয়া পেঁচদার ভাবে তাহাতে একটী সিঁড়ী সংযোজিত করিলেন। রাজাকে যখন উহা দেখান হয়, তখন সিঁড়ী যে নিম্ন হইতে দ্বিতীয়তল ভেদ করিয়া ছাদ পর্য্যন্ত উঠিয়াছে, তাহা তিনি বুঝিতে পারিলেন না। বিদ্যাধর জলধারা ঢালিয়া দেখাইয়া দিলেন, উপর হইতে অবিচ্ছেদে নীচে পর্য্যন্ত জল আসিতে পারিল। তখন রাজা বিদ্যাধরের উপর যৎপরনাস্তি সন্তুষ্ট হইয়া তাঁহার ভবিষ্যৎ উন্নতির দিকে মনোযোগী হইলেন। কিষণরামের মৃত্যুর পরে তাঁহাকেই দেওয়ান করিলেন। জয়সিংহের অন্যান্য মন্ত্রী থাকিলেও বোধ হয় বিদ্যাধরেরই একাধিপত্য ছিল, কারণ বিদ্যাধরেরই কল্পনা ও জ্যামিতি বিদ্যাবলে সুদৃশ্য জয়পুর নগর নির্ম্মিত হয়। বিদ্যাধর স্বয়ং ইহার নির্ম্মাণকার্য্য পর্য্যবেক্ষণ করেন। এতদ্ব্যতীত রাজার সমস্ত জ্যোতিষিক যন্ত্রাদি নির্ম্মাণ-বিষয়ে তিনি একজন প্রধান

সহকারী ছিলেন। নিম্নলিখিত ঘটনাতে বিদ্যাধরের ক্ষমতা অনুমিত হইবে। যোধপুররাজ অভয়সিংহ বিকানীর আক্রমণ করিলে বিকানীরপতি জয়সিংহের নিকট আত্মরক্ষার্থ সাহায্য প্রার্থনা করিয়া দূত প্রেরণ করেন। সমস্ত মন্ত্রী এবং রাজপুত সর্দ্দারগণ একবাক্যে জয়সিংহকে যোধপুরের সহিত বিরোধ করিতে নিষেধ করেন; কিন্তু শরণাগতকে রক্ষা করা এবং দুর্ব্বলকে সাহায্য করা বিশেষ গৌরবের বিষয় ইহা কেবল বিদ্যাধরই বুঝিয়াছিলেন। একমাত্র তাঁহারই প্ররোচনায় বিষম যুদ্ধের আয়োজন ও বিকানীর রাজধানী অভয়সিংহের হস্ত হইতে বিমুক্ত হইয়াছিল। রাজনৈতিক ধূর্ত্ততাবিষয়ে বিদ্যাধর সম্বন্ধে আর একটী গল্প আছে,—

যোধপুররাজ অভয়সিংহ জয়পুরপতি জয়সিংহের শ্যালক ছিলেন। কোন উৎসবে নিমন্ত্রিত হইয়া তিনি ভগিনীপতির নিকট নারাণা নামক পরগণা প্রার্থনা করেন। জয়সিংহ উৎসব-আমোদে প্রমত্তাবস্থায় ভবিষ্যদ্বিবেচনা না করিয়া তাহা দিতে স্বীকৃত হন। কিন্তু সর্ব্বাধিকারী মন্ত্রী রাজকীয় মোহরের সহি না দিলে দান সিদ্ধ হয় না। বিদ্যাধর এই রাজমোহর চিহ্নিত করা সম্বন্ধে বিলম্ব করিতে লাগিলেন। বহুমাস অতীত হইয়া গেল, তথাপি যোধপুররাজ নারাণা পাইলেন না। পরে কার্য্যবশতঃ কোন সময় জয়সিংহ বিদ্যাধরের সহিত যোধপুর গমন করিলে যোধপুররাজ বিদ্যাধরের দীর্ঘসূত্রতার বিষয়ে অনুযোগ করেন। রাজা জয়পুরে ফিরিয়া আসিয়া বিদ্যাধরকে এরূপ করিবার কারণ জিজ্ঞাসা করিলে, তিনি বলিলেন যে নারাণা পরগণা দান করা আপনার কোনক্রমেই উচিত নহে, কারণ উহা নাগা সৈন্যগণের বাসস্থান। ঐটী যোধপুররাজ হস্তগত করিয়া লইলে আপনার সৈন্যবল হ্রাস হইবে। রাজা বলিলেন, তবে কি উপায় করা যায়। বিদ্যাধর বলিলেন, আপনি নারাণার বিনিময়ে অভয়-সিংহের নিকট বিষণগড় পরগণা প্রার্থনা করুন। বলা বাহুল্য বিষণগড় যোধপুরের এক সৈনিকসম্প্রদায়ের কেন্দ্রস্থান। অভয়সিংহ কখনই তাহা ছাড়িতে সম্মত হইলেন না, সুতরাং বিদ্যাধরের কৌশলে নারাণা জয়সিংহের হস্তচ্যুত হইল না।

বিদ্যাধরের সময় হইতেই অম্বরে বাঙ্গালীদিগের বিশেষ প্রতিপত্তির সূত্রপাত হয়। তাঁহার নিকটসম্পর্কীয় হরিহর চক্রবর্ত্তী একজন বিশেষ তন্ত্রসিদ্ধ পণ্ডিত ছিলেন। বৃন্দাবন হইতে ৺গোবিন্দজীউর বিগ্রহ এবং বাঙ্গালী গোস্বামিগণ ও দেবসেবকগণ জয়পুরে আনীত হন। বিদ্যাধর নিজে বঙ্গদেশ হইতে উপযুক্ত বর আনাইয়া আপনার কন্যাকে পরিণীতা করেন। সংক্ষেপতঃ তাঁহারই প্রভাবে জয়পুরে বাঙ্গালীর নাম অধিকতর ঘোষিত হওয়ার সূত্রপাত হইয়াছিল সন্দেহ নাই।

জয়পুররাজ জয়সিংহ, উদয়পুররাজ অমরসিংহ এবং যোধপুররাজ অজিতসিংহ বাদশাহ্ অরঙ্গজেবের মৃত্যুর অব্যবহিত পরেই রাজপুতজাতির স্বাধীনতার জন্য সখ্যসূত্রে বদ্ধ হইয়াছিলেন। সন্ধিতে এরূপ স্থির হয় যে, মোগলদিগের আনুগত্য পরিত্যাগ করিলে, জয়পুর ও যোধপুররাজ-বংশে উদয়পুররাজ কন্যাদান করিতে আপত্তি করিবেন না, তবে উদয়পুরের কন্যার গর্ভজ পুত্রকে অনুজ হইলেও অপর রাণীর অগ্রজ পুত্রকে বা পুত্রদিগকে অতিক্রম করিয়া সিংহাসনের উত্ত-

রাধিকারী করা হইবে। এই সন্ধির বলে জয়সিংহ উদয়পুরপতি অমরসিংহের কন্যার পাণি-গ্রহণ করিতে পারিয়াছিলেন। জয়সিংহের জ্যেষ্ঠ পুত্রের নাম ঈশ্বরীসিংহ এবং কনিষ্ঠ পুত্রের নাম মাধবসিংহ, ইনি মহারাণা অমরসিংহের দৌহিত্র। সন্ধির সর্ত্তানুসারে মাধবসিংহেরই রাজ্য পাওয়া উচিত। কিন্তু জ্যেষ্ঠপুত্রে অধিকতর স্নেহবশতঃ জয়সিংহ মাধবসিংহকে সিংহাসন হইতে অলোভী রাখিবার জন্য টঁক, রামপুরা, ফাগী ও মালপুরা নামক চারিটী পরগণা দিয়া যান। এতদ্ব্যতীত মাধবসিংহের মাতুল রাণা দ্বিতীয় সংগ্রামসিংহ উদয়পুর রাজ্যের অন্তর্গত ভামপুরা রামপুরা নামক পরগণা তাঁহাকে জায়গীর স্বরূপ ১৭২৯ খৃষ্টাব্দে প্রদান করেন। এই সকলে মিলিয়া মাধবসিংহের একটী ক্ষুদ্র রাজ্য হইয়াছিল। সুতরাং যখন ঈশ্বরীসিংহ সিংহাসনারোহণ করেন, তখন তিনি কোন আপত্তি করেন নাই। তিনি সবাই মাধোপুর নামক সহর বসাইয়া তাহাতে বাস করিতেন।

পাঁচবৎসর কাল নির্ব্বিবাদে কাটিয়া গেল। পঞ্জাবে এই অবসরে ঈশ্বরীসিংহ অহ্মদশাহ আবদালীর বিরুদ্ধে সংগ্রাম করেন। এ দিকে জয়পুরের কতকগুলি অসন্তুষ্ট ব্যক্তির ষড়যন্ত্রে ও উদয়পুরের রাণা জগৎসিংহের উৎসাহে মাধবসিংহের মনে সিংহাসনলাভ-লালসা প্রদীপ্ত হয়। বিদ্যাধর এ সময়ে ঈশ্বরীসিংহের মন্ত্রী ছিলেন। সিন্ধিয়াকে সহায় করিয়া রাজমহল নামক স্থানে ঈশ্বরীসিংহের সৈন্যগণ রাণাকে পরাস্ত করেন। রাণা তখন মল্হাররাও হোলকারকে সহায় করিলেন। ঈশ্বরীসিংহ অত্যন্ত চিন্তিত হইলেন। বিদ্যাধর বার্দ্ধক্যবশতঃ এই সময়ে পদত্যাগ করেন। তাঁহার সহকারী হরগোবিন্দ নাটানী মন্ত্রীর কার্য্য করিতে লাগিলেন। এই সময় শত্রুপক্ষীয়েরা অগ্রসর হইতেছে শুনিয়া ঈশ্বরীসিংহ হরগোবিন্দকে বলিলেন, কি করা যায়। হরগোবিন্দ কহিল, চিন্তা করিবেন না, আমার খিসাতে (পকেটে) সমস্ত ফৌজ আছে, প্রয়োজন হইলেই যথাবিধানে সজ্জিত হইবে। এই কথা শুনিয়া রাজা আশ্বস্ত হইলেন। সেনাপতি কেশবদাস অতি বিশ্বস্ত ও বীরপুরুষ ছিলেন। তিনি কাঁকরে শত্রুসৈন্যের আগমনে বাধা দিবার জন্য অগ্রসর হইলেন। রাজা তাঁহার কোন অভাব আছে কি না জানিবার জন্য দূত প্রেরণ করেন। এ দিকে দুষ্ট হরগোবিন্দ গুপ্তমিত্র মাধবসিংহকে লিখিয়া পাঠায় যে "আপনি সত্বর কেশবদাসের নিকটে গিয়া আতিথ্য গ্রহণ করুন। শত্রু হইলেও অতিথির অনিষ্টসাধনে কেশব-দাসের কখন প্রবৃত্তি হইবে না।" রাজদূত কেশবদাসের নিকট গিয়া দেখিল, মাধবসিংহ তাঁহারই কাছে রহিয়াছেন অথচ শত্রুর গতিরোধের বন্দোবস্ত পুরাদস্তর রহিয়াছে। সে ফিরিয়া আসিয়া রাজাকে সংবাদ দিল যে কেশবদাস সুবন্দোবস্তই করিয়া রাখিয়াছেন। হরগোবিন্দ সেইখানেই ছিল, বলিল, "ঠিক করিয়া বল আর কিছু দেখিয়াছ কি না ?" তাহাতে দূত কহিল, আর দেখিয়াছি "মাধবসিংহ আমাদের সেনাপতির অতিথি।" অমনি দুরাত্মা হরগোবিন্দ বলিল, "দেখুন, মহারাজ! কেশবদাস মাধবসিংহের সঙ্গে মিলিত হইয়াছে। সে বিশ্বাসঘাতক।" ঈশ্বরীসিংহ ক্রোধপ্রদীপ্ত হইয়া কহিলেন, সে পাপিষ্ঠের কি শাস্তি হওয়া উচিত? হরগোবিন্দ বলিল, তাহাকে ডাকাইয়া বিষের পেয়ালা দিন। তৎক্ষণাৎ কেশবদাসকে ডাকান হইল।

কেশবদাস রাজসাক্ষাৎমাত্রেই রাজা তাঁহাকে বিষের পেয়ালা দিয়া কহিলেন, ইহা পান কর। রাজাজ্ঞা অবশ্যই পালনীয়; কেশবদাস বিষপান করিলেন, ও কহিলেন, আমি সমস্তই বুঝিতে পারিয়াছি; যাহা হউক আপনারও পরিণামে এইরূপ বিষপান ঘটিবে। সেনাপতি পাল্কী করিয়া যেমন নিজবাটী পৌঁছিলেন, অমনি তাঁহার বিষজর্জ্জরিত দেহকে পরিত্যাগ করিয়া তাঁহার বিশুদ্ধ আত্মা স্বর্গগামী হইল। কবিরা গাইতেন—

"মৈত্রী মোটা মারিয়া ক্ষত্রী কেশোদাস
জবহী ছোড়া ঈস্‌রা রাজকরণকী আস।"

অর্থাৎ মিত্রপুরুষ ক্ষত্রিয় কেশবদাসকে যখন মারিল, তখনই ঈশ্বরীসিংহ রাজ্য করিবার আশা ত্যাগ করিল।

রাণা ও হোলকারের মিলিত সৈন্য জয়পুরের অর্দ্ধক্রোশ দক্ষিণে মতিডুঙ্গরি নামক পাহাড়ের তলায় আসিয়া ছাউনী করিল, তখন সংত্রস্ত ঈশ্বরীসিংহ হরগোবিন্দকে ডাকিয়া কহিলেন, "কই হরগোবিন্দ, তুমি যে বলিয়াছিলে তোমার খিসায় ফৌজ আছে, এখন বাহির কর।" হরগোবিন্দ কহিল, প্রভু কি করিব "মেরা খিসা ফট্‌ গিয়া" অর্থাৎ আমার পকেট ফাটিয়া গিয়াছে। তখন রাজা বুঝিলেন যে হরগোবিন্দই সর্ব্বনাশ করিয়াছে, অপমান ও পরাভব নিকটবর্ত্তী। সুতরাং বিষপান দ্বারা একেবারে সমস্ত চিন্তার অবসান করাইলেন এবং কেশবদাসের ভবিষ্যদ্বাণী পূর্ণ করিলেন। রাজার আকস্মিক মৃত্যুতে অন্তঃপুরবাসিনী রাণীগণ শোকে কিংকর্ত্তব্যবিমূঢ় হইয়া বিদ্যাধরকে ডাকাইলেন, তখন এত তাড়াতাড়ি যে, শিবিকা সজ্জিত করাইবার অবসর ছিল না। টোকরা করিয়া বিদ্যাধরকে মহলে আনান হইল। বিদ্যাধর রাণীদিগকে কহিলেন, আপনারা কোলাহল করিয়া রাজার মৃত্যুসংবাদ প্রকাশ করিবেন না। অন্ততঃ রাজা যে জীবিত আছেন, আরও একদিন ইহাই প্রচারিত থাকুক। বিদ্যাধর এই বলিয়া ঝাণাইএর ঠাকুর পরমমিত্র কুশলসিংহকে ডাকাইলেন। উভয়ে পরামর্শ করিয়া হরগোবিন্দকে ডাকাইয়া কহিলেন, "হরগোবিন্দ, তুমি যৌবনোন্মত্ত রাজাকে বিনাশ করিয়া উত্তম কার্য্য করিয়াছ, এক্ষণে যাহাতে তাঁহার অন্ত্যেষ্টিক্রিয়া শীঘ্র সম্পাদিত হয়, তাহার উপায় কর।" এই কথা বলিলে হরগোবিন্দ কোন প্রয়োজনে দ্রব্য আনিবার জন্য দৌড়াদৌড়ি যেমন একটা পার্শ্ববর্ত্তী ঘরে গেল, বিদ্যাধর ও কুশলসিংহ অমনি ধাঁ করিয়া তাহার দরজা বন্ধ করিয়া তালা লাগাইয়া দিলেন ও বাহির হইতে কহিলেন, "তুমি এখন এই ঘরে বন্ধ থাক, তোমার আহারাদি নিয়মমত পৌঁছিয়া যাইবে।" পরে যে কয়জন সভ্য সে সময়ে মহলে উপস্থিত ছিলেন, তাঁহারা বিদ্যাধরকেই যথাকর্ত্তব্য স্থির করিয়া কার্য্য করিতে অনুরোধ করিলেন। বিদ্যাধর মৃত রাজা ঈশ্বরীসিংহকে রাজপরিচ্ছদে সাজাইয়া রাখিয়া রাণাজীর নিকট মতিডুঙ্গরিতে দূত প্রেরণ করিলেন।

দূতের হস্তে রাণাসাহেবকে এই পত্র দেওয়া হইল যে, মহারাজ ঈশ্বরীসিংহ উভয় পক্ষের কর্ত্তব্যতা স্থির করিবার জন্য মন্ত্রী বিদ্যাধর ও ঠাকুর কুশলসিংহকে আপনার নিকট পাঠাইতে

ইচ্ছুক, ইহাতে আপনার মত কি? রাণা উভয়ের সহিত সাক্ষাৎ করিতে চাহিলে উঁহারা মতিডুঙ্গরির নিকট যাইয়া রাণাকে অভিবাদন করিলেন। কিন্তু উঁহারা বলিলেন যে, রাজা ঈশ্বরীসিংহ রাণা মহাশয়কে দেখিবার জন্য তাঁহাকে নিজপ্রাসাদে নিমন্ত্রণ করিয়াছেন, সেই-খানেই সমস্ত কথা স্থির হইবে। রাণা জগৎসিংহ বলিলেন, এ কি কথা, ঈশ্বরীসিংহের লিখিত ইচ্ছা এই যে আপনারা এইখানেই যথাকর্ত্তব্য নিষ্পত্তি করিবেন, অথচ আপনারা মুখে বলিতেছেন অন্য কথা। বিদ্যাধর উত্তর করিলেন, রাজাদিগের আদেশ এককালে সমগ্র বুঝিতে পারা যায় না; তিনি মুখে আমাদিগের নিকট এই অভিপ্রায়ই প্রকাশ করিয়াছেন যে রাণাজী পঞ্চাশজন অশ্বারোহী সহিত জয়পুরপ্রাসাদে আগমন করিলে সমস্ত স্থির হইবে। রাণা বিদ্যাধরের বাক্যকৌশলে মুগ্ধ হইয়া তাহাতেই স্বীকৃত হইলেন। জয়পুরের সাঙ্গানীর দরজা হইতে প্রাসাদ পর্য্যন্ত বিলক্ষণরূপে সুসজ্জিত ছিল। সৈন্যদের উপর আদেশ ছিল যে রাণাসাহেব সহরে প্রবেশ করিবামাত্র তাঁহার পঞ্চাশজন অশ্বারোহীর দশজনকে 'আটকাও' করা হয়, আর কিয়দ্দূর অগ্রসর হইলে আর দশজনকে। এইরূপে প্রাসাদে পৌঁছিবার সময় *একমাত্র রাণা নিজেই থাকেন, আর কেহ সঙ্গী না থাকে এরূপ করা চাই।* সহরের মধ্যে রাণা প্রবেশ করিলে এই অপ্রিয় আচরণ তাঁহাকে দেখিতে হইল; কিন্তু তখন আর তিনি কিছু করিতে পারেন না। যখন তিনি মৃত ঈশ্বরীসিংহের নিকট সমানীত হইলেন, তখন বেশভূষার ভিতর হইতে তাঁহাকে মৃত বলিয়া বুঝিতে পারিলেন না। বিদ্যাধর রাণাকে সম্বোধন করিয়া কহিলেন, রাজার অভিপ্রায় এই যে রাণাসাহেবের প্রাণবধ করা হয়। রাণা তখন বিলক্ষণ ফাঁদে পড়িলেন, এরূপ বিশ্বাসঘাতকতা তিনি আশা করেন নাই, অথচ সেখানে ক্রোধপ্রকাশ করিতে পারেন না, কারণ তিনি সম্পূর্ণরূপে শত্রুবেষ্টিত। অতএব তিনি ঈশ্বরীসিংহের পক্ষে অনুকূল সন্ধির প্রস্তাব করিয়া আপনার মুক্তির জন্য চেষ্টা পাইতে লাগিলেন। বিদ্যাধর কহিলেন যে, আমাদের মহারাজ নিজ অনুজ ও রাণাসাহেবের পিতৃস্বসৃপুত্র মাধবসিংহকে অর্দ্ধেক রাজ্য কেন সমস্ত রাজ্য সমর্পণ করিতে প্রস্তুত আছেন, কিন্তু আপনি এইখান হইতে হুকুম দিন যে আপনারা সমস্ত সৈন্য ও মলহাররাওয়ের সমস্ত সৈন্য নগরের সান্নিধ্য পরিত্যাগ করিয়া চলিয়া যায়। রাণা তাহাই করিলেন। উদয়পুরী ফৌজ সমস্ত চলিয়া গেল; কিন্তু ধনপিপাসু মরাঠাসর্দ্দার যাইলেন না। তিনি নগরের পশ্চিমদিকের চাঁদপোল দরজা দিয়া নগর আক্রমণের চেষ্টা পাইলেন। কিন্তু হরিহর চক্রবর্ত্তী পূর্ব্বেই এককাজ করিয়া রাখিয়াছিলেন, তিনি দুইটী পর্ণীপত্র (খুব লম্বা, শক্ত ও তীক্ষ্ণধার খড় বিশেষ) এক তোলো হাঁড়ির ভিতর প্রোথিত করিয়া চাঁদপোল দরজায় মন্ত্রাদিষ্ট করিয়া স্থাপিত করিয়া রাখিয়াছিলেন। হোলকারের সৈন্য আসিলে ঐ পর্ণী একটা সহস্রটা হইয়া যুদ্ধ করিতে লাগিল। সৈন্যেরা ক্ষতবিক্ষত হইয়া পলায়ন করিল। এই অদ্ভুত প্রবাদ গল্পের মূলে কতকটা ঐতিহাসিকসত্য নিহিত আছে তাহা নিশ্চয় করা দুঃসাধ্য। যাঁহার রাজ্য কাড়িয়া লইতে আসিয়াছেন, তাঁহারই প্রাসাদে রাণাসাহেবের যাইতে সম্মতিদান ও তন্মধ্যে তাঁহার নিশ্চলতা দেখিয়াও জীবিত মনে করা অবিশ্বাস্য। পর্ণীপত্র কখনও যুদ্ধ

করিতে পারে না, তবে সে সময়ে সহরের পশ্চিমদিকের বহির্ভাগ পর্ণীবনে পূর্ণ ছিল, অজ্ঞাতক্ষেত্র শত্রুসৈন্যের পক্ষে তাহা ভেদ করিয়া সহর আক্রমণ করা কতকটা অসম্ভব হইতে পারে।

১৭৫২ খৃষ্টাব্দে মাধবসিংহ নিরুপদ্রব রাজ্য বিনা রক্তপাতে অধিকার করিলেন। তাঁহার প্রথম কার্য্য হরগোবিন্দ নাটানীকে অব্যাহতি দান, দ্বিতীয় কার্য্য বিদ্যাধরকে মন্ত্রিত্ব-গ্রহণের জন্য অনুরোধ। বিদ্যাধর যে হরগোবিন্দের বিষদাঁত ভাঙ্গিয়া রাখিয়াছিলেন, সেই হরগোবিন্দ এখন মুক্ত হইল। রাজা তাহার প্রতি চিরকালই অনুকূল থাকিবেন, সুতরাং তিনি অপ্রতিহতভাবে কার্য্য করিতে পারিবেন না, এই সকল—ভাবিয়া তিনি মন্ত্রিত্বগ্রহণে সম্মত হইলেন না। রাজার সঙ্গে উদয়পুরবাসী বাইশজন পল্লীবাল ব্রাহ্মণ ছিলেন। তাঁহারাও বাঙ্গালী ব্রাহ্মণের প্রভুত্বে বিদ্বেষ পোষণ করিতেছিলেন। সুতরাং বিদ্যাধরের এখন দুর্দ্দিন আরম্ভ হইল। ক্রুদ্ধ রাজার ক্রোধ প্রতিপক্ষীয়েরা বাড়াইয়া দিতে লাগিল। রাজা বিদ্যাধরকে আজ্ঞা করিলেন যে, যদি তুমি মন্ত্রিত্ব গ্রহণ না কর, তবে চরোয়াদার (ঘোড়াওয়ালা) ও গাড়ীওয়ালাদের যে ছয়মাসের বেতন বাকী পড়িয়াছে, তাহা চুকাইয়া দাও। বিদ্যাধরের চাকরী না থাকাতে চাকরীর জায়গীরও নাই, নগদও নাই সুতরাং নিরুপায় হইলেন। চরোয়াদার ও গাড়ীওয়ালারা বিদ্যাধরের নিকট টাকা না লইয়াই প্রকাশ করিল, আমাদের প্রাপ্য পাইয়াছি। তাহাদের সততায় বিদ্যাধর অব্যাহতি পাইলেন দেখিয়া মাধবসিংহ দ্বিতীয় আজ্ঞা দিলেন 'তিন লাখরুপয়ে নগদ জমা কর'।

বি। প্রভো কোথা হইতে দিব ? আমি কখন চুরিও করি নাই, ঘুষও লই নাই।

রাজা। ভিক্ষা করিয়া দাও।

বি। ভিক্ষা করিয়া উপার্জ্জন করিবার জন্য লিখিত অনুমতি (পাট্টা) দিন।

রাজা লিখিত অনুমতি (পাট্টা) দিলেন। বিদ্যাধর মিত্র ঝালাইয়ের ঠাকুর কুশল সিংহজীর নিকট তিন লাখ টাকা প্রাপ্ত হইয়া রাজসরকারে জমা দিলেন। রাজা ভাবিলেন এই ব্রাহ্মণ এইরূপে 'ভাইবেটা'কে অর্থাৎ রাজপুত-সর্দ্দারগণকে ঠকাইবে। অতএব ইহার নিকট হইতে পাট্টা ফেরত লওয়া উচিত। এই ভাবিয়া পাট্টা ফেরত লইলেন ও কুশলসিংহকে তিন লাখ টাকা ফেরত দিলেন এবং বিদ্যাধরের জন্য তৃতীয় দণ্ডের ব্যবস্থা করিলেন। "মকানাৎ খালসা কিয়া যায়" এই হুকুমে বিদ্যাধরের জয়পুরের ও আমেরের (অম্বরের) বাটী এবং ঘাটের বাগান খালসা (রাজসম্পত্তি) হইয়া যায়। বিদ্যাধরের জ্যেষ্ঠপুত্র মুরলীধর বিদ্যাধরের সুদিনের সময় একটী বৈটকখানা বাটী তৈয়ার করাইতে ছিলেন, কিন্তু বিদ্যাধর অর্দ্ধসমাপ্ত অবস্থায় ঐ বাটীনির্ম্মাণ বন্ধ করাইয়া দিয়াছিলেন। সম্প্রতি রাজরোষরূপ বিষম অনর্থের সময় বিদ্যাধর সপরিবারে সেই অর্দ্ধসমাপ্ত বাটীতেই থাকিতে বাধ্য হন। অদ্যাপি সেই বাটীতেই সুরজবক্স আছেন। মুরলীধর ফরাসখানায় দারোগা ছিলেন। তাঁহার বেতন বার্ষিক ৬০০৲ টাকা ছিল ও ঈশ্বরীসিংহের সময় বিদ্যাধরের তিন পুত্রের নামে বিজাপুর গ্রাম পাট্টা দেওয়া হয়। এ সকল আয় মাধবসিংহ বন্ধ করেন নাই। সুতরাং এই আয়ের উপর বিদ্যাধরকে শেষ অবস্থায় নির্ভর করিতে হইয়াছিল।

বিদ্যাধরের মৃত্যু উপলক্ষে তাঁহার ভাগিনেয়কে যে কূপ ও তৎসংক্রান্ত ভূমি দান করা হয়, সেই দানপত্রে দেখা যায়—বিদ্যাধর সংবৎ ১৮০৮ বৈশাখ শুক্লপক্ষ ষষ্ঠী তিথিতে পরলোক গমন করেন। উহা ইংরাজী ১৮৫৪ সাল এবং তখন মাধবসিংহের রাজত্ব চলিতেছে।

বিদ্যাধরের দ্বিতীয় পুত্র গঙ্গাধরেরও বোধ হয় স্বতন্ত্র তঙ্খা (বেতন) রাজসরকার হইতে মুকরর ছিল। তাঁহার তৃতীয় পুত্র গজাধর (গদাধর) সম্বরের নাজিম ছিলেন। সুতরাং বুঝিতে হইবে যে, রত্নগর্ভ সার্ব্বভৌম হইতে বিদ্যাধরের পুত্রগণ পর্য্যন্ত শিলাদেবীর ব্রাহ্মণগণ মধ্যে কার্য্যকুশলতা ও লেখাপড়ার চর্চ্চা ছিল। কোন কোন বাটীতে ৩০০ বৎসরের পুরাতন হস্তলিপিতে বঙ্গীয় অক্ষরের ন্যায়শাস্ত্রের পুঁথির পাতা দেখিতে পাওয়া যায়, রত্নগর্ভের সময় হইতে বহুকাল পর্য্যন্ত এই বঙ্গীয় ব্রাহ্মণগণ বাঙ্গালা অক্ষরেই লেখা পড়া করিতেন। পরে কালবশে ন্যায়শাস্ত্রের চর্চ্চা ছাড়িয়া দেন, তন্ত্র শাস্ত্র, ব্যাকরণ ও পূজাপদ্ধতির পুথিগুলি হিন্দী অক্ষরেই লিখিতে আরম্ভ করেন। সাজসজ্জা সম্পূর্ণই হিন্দুস্থানী হইয়া যায়। কিন্তু পূজাপদ্ধতি আজিও বঙ্গীয় রীতি অনুসারে চলিতেছে। বহুকাল পর্য্যন্ত বাঙ্গালী নামেই নামকরণ করায় প্রচলন ছিল, কিন্তু দুই তিন পুরুষ হইতে হিন্দুস্থানী নাম রাখা আরম্ভ হইয়াছে, যথা—শিওবক্স, রামবক্স ইত্যাদি। বৈবাহিক সম্বন্ধ স্বশ্রেণীর মধ্যে আছে; তবে বাঙ্গালীর সঙ্গে সম্বন্ধ দুর্ঘট হওয়ায় অনেক দিন হইতে তাহা স্থগিত রহিয়াছে।

জয়পুর সহরে বিদ্যাধরের যে বাটী খালসা হইয়া যায়, তাহা ফয়েজ আলী খাঁ নামক ইদানীন্তন কালের একজন মন্ত্রীকে এবং ঘাটে যে বাগান ছিল, তাহাও ইদানীন্তন কালের আর একজন মন্ত্রী ঠাকুর ফতেসিংহকে দেওয়া হয়।

বিদ্যাধরের বংশাবলী।

রাজেন্দ্রের পুত্র শান্তেন্দ্র, শান্তেন্দ্রের পুত্র বিদ্যাধর; বিদ্যাধরের তিনপুত্র মুরলীধর, গঙ্গাধর ও গজাধর এবং দুই কন্যা মায়াদেবী ও কামিয়াদেবী। মুরলীধরের পুত্র লছমীধর, গঙ্গাধর নিঃসন্তান; গজাধরের পুত্র শ্রীধর, ধরণীধর, মহীধর ও বংশীধর। নিঃসন্তান লছমীধর বংশীধরকে পোষ্যপুত্র গ্রহণ করেন। বংশীধরের পুত্র শিওবক্স, শিওবক্সের পুত্র সুরজবক্স। শ্রীধরের পুত্র গিরিধর, চিমণধর, প্রেমধর; গিরিধরের পুত্র কিষণলাল। কিষণলালের সন্তান হয় নাই। চিমণধরও নিঃসন্তান, প্রেমধরের পুত্র মায়ারাম, মায়ারামের পুত্র শিবরাম। এখন দুইজন মাত্র জীবিত আছেন। সুরজবক্সের বয়স ৩৫ এবং শিবরামের বয়স ৭।

সাল তারিখ বুঝিবার সুবিধা হইবে বলিয়া মানসিংহ হইতে রাজগণের ও প্রত্যেক রাজার সমকালবর্ত্তী প্রাধান্যপ্রাপ্ত শিলাদেবীসংক্রান্ত ব্রাহ্মণগণের নামোল্লেখপূর্ব্বক একটী তালিকা প্রস্তুত করিয়া পাঠকগণকে অর্পণ করিতেছি।

উহারই অব্যবহিত পরে একটীমাত্র পাট্টার তালিকা দিলাম। সকল পাট্টার নকল দিতে গেলে প্রস্তাব অনেক দীর্ঘ হইয়া পড়ে এবং পাঠকেরও তত ভাল লাগিবে না এই বিবেচনায়

তাহা ত্যাগ করিলাম। প্রত্যেক পাট্টাতে সেই সেই সময়ের মন্ত্রীদের নাম, সাক্ষীর নাম ও পাঠের নানাবিধ বৈচিত্র দেখিতে পাওয়া যায়। নমুনাস্বরূপ পাঠক একটুখানি দেখিয়া লউন।

"সীধী শ্রীরাওজী শ্রীমুকুন্দ সংঘজী বচনাৎ দয়ারাম গোলাবচন্দ ও সেয়াল পুণ্যউদক সন্তোষরাম চক্রবর্ত্তীনে দীনীছে বিঘা ৫১ মিতি ফাগণ বুদি ৮ সম্বৎ ১৭৫৩ মে দীনীছে ওত কালবস হোগিয়ো উস্‌কা বেটা বিদ্যাধরান ধরতী বিঘা ৫১ দিজ্যো। তপসীল জৈল ১৭৭২ সম্বৎ সাবন বুদি ১৪।"

রাজাদের তালিকা।

মানসিংহ (জাহাঙ্গীরের সময়ে) (১৬০৫ হইতে ১৬১৫)	প্রতাপাদিত্যের সহিত যুদ্ধ।
জগৎসিংহজী (১৬১৫ হইতে ১৬২২)	রত্নগর্ভ সার্ব্বভৌম।
জয়সিংহ (প্রথম) (১৬২২ হইতে ১৬৬৮)	রাজেন্দ্র
রামসিংহ (১৬৬৮ হইতে ১৬৯০)	শান্তেন্দ্র বা শান্তীন্দ্র
বিষণসিংহ (১৬৯০ হইতে ১৭০০)	শান্তেন্দ্র কিষণরাম
জয়সিংহ (দ্বিতীয়) (১৭০০ হইতে ১৭৪৩)	বিদ্যাধর
ঈশ্বরী সিংহ (১৭৪৩ হইতে ১৭৫২)	বিদ্যাধর
মাধবসিংহ (১৭৫১ হইতে ১৭৬৯)	মুরলীধর
পৃথ্বীসিংহ (১৭৬৯ হইতে ১৭৭৮)	গদাধর লছমীধর
প্রতাপসিংহ (১৭৭৮ হইতে ১৮০৩)	বংশীধর

পাট্টার তালিকা।

১৭০০—সন্তোষরাম চক্রবর্ত্তী (শান্তীন্দ্র) সাহন-কোটরা ও সাচড়ী প্রাপ্ত হন।
(সময়—জয়সিংহ)।

১৭১৫—বিদ্যাধর উত্তরাধিকারী হন। (পারসী মোহর জয়সিংহ)

১৭৪৫—মুরলীধর প্রভৃতি ভ্রাতৃত্রয়কে বিজাপুর দেওয়া হয় (হিন্দীমোহর ঈশ্বরীসিংহজী)

১৭৫২—ঐ পাট্টা পাকা করা হয়। (হিন্দীমোহর মাধবসিংহ)

১৭৬২—গঙ্গাধরের কোন তঙ্খা বাকী ছিল—দিবান নন্দলাল-কানাইরাম জয়পুরের নাজিমের উপর হুকুম দিতেছেন, তুমি ঐ তঙ্খা দিতে ঝগড়া করিও না। (হিন্দীমোহর মাধবসিংহ)

[পূর্ব্বে বেতন দেওয়ার কার্য্য খাজনার অধীন ছিল না; জয়পুর-নিজামতের নাজিমের হস্তে ন্যস্ত ছিল।]

১৭৭৩—মুরলীধরের ফরাসখানা দেশের* তঙ্খা দিয়া যাও। (হিন্দীমোহর পৃথ্বীসিংহ)

১৭৭৯—লছমীধর—মুরলীধরের স্থানে ফরাসখানা দেশ প্রাপ্ত হইলেন। (হিন্দীমোহর প্রতাপসিংহ)

১৭৮০—দেওয়ান সিংঘজী দেওয়ান রামগোপালকে লিখিতেছেন, লছমীধরকে ৬০০৲ টাকা দেওয়া হয়। (হিন্দীমোহর প্রতাপসিংহ)

১৭৮৬—বিজাপুর ভোগ করিতে দাও। ঐ ঐ।

১৭৮৭—গজাধর—সামরের (শম্ভরের) নাজিম ঐ ঐ।

টড্ সাহেব এক স্থানে বিদ্যাধরকে জৈনধর্ম্মাবলম্বী বলিয়া উল্লেখ করিয়াছেন, কিন্তু এটী তাঁহার ভ্রম। বিদ্যাধর যে হিন্দুধর্ম্মেই শ্রদ্ধাবান্ ছিলেন, তাঁহার কন্যা মায়াদেবীর পুনঃপুনঃ শিব-মন্দিরস্থাপনেই তাহা প্রমাণিত হয়। বোধ হয় তিনি মাংসত্যাগী ছিলেন অথবা টডের সংবাদদাতা কোন জৈন, জৈনধর্ম্মের প্রভাব দেখাইবার জন্য তাঁহার নিকট বিদ্যাধরকে জৈন বলিয়া পরিচয় দিয়াছিলেন। জয়সিংহ মহারাজের সময়ে বিদ্যাধরের ন্যায়োপার্জ্জিত ঐশ্বর্য্য কম ছিল না। জয়পুরে—"বিশ্বেশ্বরকী চৌকুড়ী" নামক মহল্লায় তাঁহার কয়েকখানি বৃহৎ বৃহৎ অট্টালিকা ছিল। পুরাতন অম্বর সহরে তাঁহার অট্টালিকা ও ঘাটনামক পর্ব্বতসানুতে তাঁহার বৃহৎ উদ্যান ছিল। এ সমস্তই এখন পরহস্তগত হইয়াছে। এখনও একটী রাস্তা "দেওয়ান বিদ্যাধরজীকী গলি" বলিয়া প্রসিদ্ধি লাভ করিতেছে। ঐ রাস্তার পশ্চিমদিকেই তাঁহার বাটী ছিল। মহাত্মা টড্ বিদ্যাধর সম্বন্ধে যেরূপ সুখ্যাতির সহিত লিখিয়া গিয়াছেন, তাহা তাঁহার সুবিখ্যাত ইতিহাস হইতে নিম্নে উদ্ধৃত হইল :—

"But the envoy had a friend in the famous Vidyadhar the chief civil minister of the state, through whose means he obtained permission to make a 'verbal report standing'

Vidyadhar was a Brahmin of Bengal, a scholar and man of Science. The plan of the modern city of Amber named Jeypur, was his; a city as

---

* দশ = Department.

regular as Dramstadt. He was also the joint-compiler of the celebrated geneological tables which appear in the first volume of this work."

Tod's Rajasthan, Vol. II p. 105.

অর্থাৎ জয়পুর রাজের প্রধান অসামরিক সচিব বিখ্যাত বিদ্যাধর ঐ বিকানীর-দূতের বন্ধু ছিলেন। তাঁহারই সাহায্যে উক্ত দূত খাড়া খাড়া মৌখিক নিবেদন করিবার অনুমতি পাইয়াছিলেন। বিদ্যাধর একজন বঙ্গদেশীয় ব্রাহ্মণ, পণ্ডিত ও বৈজ্ঞানিক ছিলেন। অম্বররাজ্যের বর্ত্তমান রাজধানী জয়পুর নগরের পত্তন তাঁহারই। নগরটী ড্রামষ্টাড্ নগরের ন্যায় পারিপাট্যের সহিত নির্ম্মিত। এই পুস্তকের প্রথমভাগে সংযোজিত বৃহৎ বংশাবলীর তালিকা প্রণয়নবিষয়ে তিনি রাজার একজন সহযোগী সঙ্কলয়িতা।

II

"Jaipur is the only city in India built upon a regular plan with streets bisecting each other at right angles. The merit of the design and execution is assigned to Vidyadhar, a native of Bengal, one of the most eminent coadjutors of the prince in all his scientific persuits both astronomical and historical." (page 344)

অর্থাৎ ভারতবর্ষের মধ্যে একমাত্র জয়পুর নগরই সুশৃঙ্খলার সহিত নির্ম্মিত। ইহার পথগুলি পরস্পর সমদূরে লম্বভাবে সম্পাতপ্রাপ্ত। পত্তন ও নির্ম্মাণবিষয়ে গুণপনা বিদ্যাধরে সংন্যস্ত। বিদ্যাধর একজন বাঙ্গালী এবং রাজার বৈজ্ঞানিক, জ্যোতিষিক ও ঐতিহাসিক সমস্ত কার্য্যেই প্রধান সহকারী।

III

"Vidyadhar one of his chief coadjutors in his astronomical persuits, and whose genius planned the city of Jeypur was a Jain." Tod. page 354.

অর্থাৎ—যিনি মহারাজের জ্যোতিষিক কার্য্যকলাপের একজন প্রধান সহকারী ও যাঁহার প্রতিভা হইতেই বর্ত্তমান জয়পুরনগর রচনাপ্রসূত, সেই বিদ্যাধর একজন জৈন ছিলেন। আমরা পূর্ব্বেই দেখাইয়াছি যে টডের এই উক্তিটী ভিত্তিহীন।

রাজকীয় ইঞ্জিনীয়ার মহাত্মা গ্যারেট সাহেব স্বপ্রণীত "জয়পুরের জ্যোতিষিক যন্ত্রালয়" নামক পুস্তিকাতে বিদ্যাধর সম্বন্ধে যেরূপ লিখিয়াছেন, তাহাও নিম্নে যথাযথ উদ্ধৃত করিয়া দিলাম—

"Vidyadhar, a Bengali, was another of his Coadjutors, and he appears to have been of the greatest help to the Maharaja in both his Astronomical and historical researches."

বিদ্যাধরের নিজের ও তাহার বংশীয়গণের স্থাপিত দেবালয়াদি অনেকগুলি ছিল। তাঁহার কন্যা মায়াদেবীর স্থাপিত নিম্নলিখিত মন্দির কয়টী প্রসিদ্ধ।

১। আমের মহাদেব। (আমের = অম্বর)

২। তারকেশ্বরের মহাদেব। (জয়পুর) ৩। যকানকে কুয়েকা মহাদেব। (জয়পুর)

বিদ্যাধরের নামীয় একখানি পাট্টা পাওয়া গিয়াছে। সেখানি এইরূপ—

"(সহি) মহারাজ সবাই জয়সিংহ ইবন্ মহারাজা বিষণসিংহ।

সিধি শ্রীমহারাজ অধিরাজ মহারাজ শ্রীসবাই জয়সিংহজী দেববচনাৎ কমেটী পরগণা আমের কা দিশেষু প্রসাদবক্ষ অপরঞ্চ বাবৎ পুণ্য উদক—ধরতী বিঘা ৫১ গাঁও সাহনকোটরা তন্না রামগঞ্জ পরগণা আমের কী—বিদ্যাধর সন্তোষরাম কা ব্রাহ্মণ চক্রবর্ত্তীনে মিতি ফাল্গুন সুদ পুণ্য সম্বৎ ১৭৭৪ চন্দ্রপর বসু ও তিসমে সঙ্কল্পকর দিইসে তিসো থাকে ফরমায়োছা।

বেষাথ বুদি ১০ সম্বৎ ১৭৭৬—বৈরিশাল কিশোরদাস ও সাহাতারাচাঁদ দিবান ও নেহালচাঁদ ওয়াকানবিস্ অত্র পুণ্য উদক।"

ঈশ্বরীসিংহের সময়ে তাঁহার প্রদত্ত একখানি পাট্টার ভণিতা এইরূপ—

"উদক গাঁও বিজাপুর বাস * জামরোলী, মুরলীধর, গঙ্গাধর, গজাধর বিদ্যাধর কা বেটা ব্রাহ্মণ বাঙ্গালীনে মিতি কার্ত্তিক সুদি পুনো সম্বৎ ১৮০২।"

ঠিক এই পাট্টাখানি মাধোসিংহের সময়ে পাকা করিয়া লওয়া হয় ১৮০৮।

বিদ্যাধর শাণ্ডিল্যগোত্রীয় ছিলেন। রাজা জয়সিংহের ৪৪ বৎসরব্যাপী রাজ্যকালে দ্বাদশজন ব্যক্তি মন্ত্রিত্ব করেন মন্ত্রিগণের নামের মধ্যে কিষণরাম ও বিদ্যাধরের নাম গ্রথিত আছে। এই কিষণরাম যদি বিদ্যাধরের মাতুল হন, তাহা হইলে বুঝিতে হইবে যে শিলাদেবীর ব্রাহ্মণগণ প্রথম হইতেই উচ্চতর রাজকর্ম্মে নিযুক্ত হইতেছিলেন। মাড়য়ারী ভাষায় লিখিত একখানি বংশাবলী পাওয়া গিয়াছে। পাঠকবর্গের কৌতূহল নিবারণ জন্য তাহা হইতে মানসিংহের প্রতাপাদিত্য-বিজয় ও শিলাদেবীর আনয়ন ব্যাপারটী অনুবাদ করিয়া দিলাম। ইহাতে দেখিবেন যে মানসিংহ শিলাদেবীকে প্রতাপাদিত্যের নিকট হইতে পান নাই, কেদার কায়স্থ নামক রাজার নিকট হইতে প্রাপ্ত হন। মানসিংহ শেষোক্ত রাজার কন্যার পাণিগ্রহণ করিয়াছিলেন। আবার ঐ বংশাবলীর একস্থানে উল্লেখ আছে যে সম্বৎ ১৬৭১ সালে (=১৬১৪ খৃষ্টাব্দে) আষাঢ় শুক্লা দশমীতে মানসিংহের মৃত্যু হয়। তাঁহার সহিত বিশজন মহিষী সতী হইয়াছিলেন; তাঁহাদের মধ্যে একজন "মহলরাজকী বেটী রাণী বাঙ্গালনী পরাভাবতী।" তবে কি আমরা বুঝিব মানসিংহের দুইটী বাঙ্গালী রাণী ছিলেন, কেদারকায়স্থকী বেটী ও মহলরাজকী বেটী?

"মানসিংহ জাহাজে বসিয়া সমুদ্র পার হইলেন। পরে ওখান হইতে ষাটক্রোশ পথ অতিক্রম করিয়া ব্রহ্মপুত্র গেলেন এবং রাজা পরতাপদীপের সহিত ঝগড়া করিলেন ও জয়প্রাপ্ত হইলেন এবং পরতাপদীপের যে গড় ছিল তাহা দখল করিয়া লইলেন। তাহাতে মানসিংহের পুত্র দুর্জ্জনসিংহ মারা পড়েন। জগৎসিংহ আহত হয়েন। আর রাজা পরতাপদীপের

* বাস শব্দের অর্থ নূতন আবাদ; ইবন্ (আরবী)=পুত্র অর্থাৎ জয়সিংহ বিষণসিংহের পুত্র ছিলেন। পাট্টাগুলিতে আরবী, পারসী, সংস্কৃত, হিন্দী, ঝাড়শাই (জয়পুরী) এই পাঁচটী ভাষার অপূর্ব্ব মিশ্রণ পাওয়া যাইতেছে।

অধীনে তের শত হাতী এবং সৈন্য সরঞ্জাম অনেক ছিল ; সে সমস্তই জয় করিলেন। পশ্চাৎ ঐখানে কেদার কায়তের রাজ্য ছিল, তাঁহাকে লোকে রাজা বলিত। তাঁহার নিকট শিলামাতা ছিলেন। সেই শিলামাতার প্রতাপে তাঁহাকে কেহই জয় করিতে পারিত না। এজন্য মানসিংহ পারিষদদিগকে জিজ্ঞাসা করেন যে,কাহার বলে এ ব্যক্তি বলবান্? তাঁহারা উত্তর করিলেন, এ ব্যক্তির প্রতি শিলামাতার বল আছে। অতএব আপনি মাতাকে প্রসন্ন করিবার জন্য হোম প্রভৃতি করান, তাহাতে মাতা প্রসন্ন হইবেন। কেদার রাজার সহিত মাতার এই কথা ছিল যে তুমি যখন রাজা হইয়া বলিবে "তুমি যাও" তখনি যাইব। একদিন রাজা পূজায় বসিয়া ছিলেন, তাঁহার কন্যার রূপ ধারণ করিয়া দেবী পূজাস্থানে আসিয়া বসিলেন। রাজা আপন কন্যা জানিয়া বলিলেন, তুই যা, আমায় পূজা করিতে দে, তুই যা। এইরূপ তিন বার বলিলে মাতা বলিলেন, তোমার ও আমার মধ্যে যে কথা ছিল, তাহা পূর্ণ হইল। তখন রাজা বলিলেন, 'আমাকে আপনি ছলনা করিলেন, আপনার যাহা ইচ্ছা হয় করুন' এই বলিয়া মাতাকে সমুদ্রমধ্যে ফেলিয়া দিলেন। তখন দেবী মানসিংহের নাম ধরিয়া আওয়াজ করিলেন, "আমাকে সমুদ্রমধ্যে ফেলিয়া দিয়াছে এখান হইতে উঠাইয়া লও, আমি তোমার প্রতি প্রসন্ন হইয়াছি।" ইহার পর রাজা মানসিংহ কেদার রাজাকে হারাইয়াছিলেন। রাজা তাহাকে করিয়া পলাইলেন এবং দেওয়ানকে মানসিংহের নিকট পাঠাইলেন। দেওয়ান মানসিংহের সহিত সাক্ষাৎ করিলেন। মানসিংহ রাজার কন্যার পাণিগ্রহণ প্রার্থনা করিলেন। রাজা কেদার তাঁহাকে কন্যা দিলেন। উভয়ে সন্ধি হইয়া গেল। তখন মানসিংহ কহিলেন, তোমার রাজ্য তোমায় দিলাম। কেদার রাজা সেলাম করিলেন। পরে মানসিংহ সমুদ্র হইতে মাতাকে উঠাইলেন এবং নিবেদন করিলেন, মাতা আপনি আজ্ঞা করুন, আমি সেই মত আপনার পূজা করিব। তখন মাতা কহিলেন, প্রত্যহ আমার নিকট বলিদান হওয়া চাই, তাহা হইলে তোমার রাজ্য বজায় থাকিবে, আর আমিও থাকিব। যে দিন বলিদান বন্ধ পড়িবে, সে দিন তোমার ও আমার বাক্য পূর্ণ হইয়া যাইবে। রাজা ইহাই স্বীকার করিলেন, এবং বাঙ্গালীদিগকে ইহার পূজার ভার সমর্পণ করিলেন।"

কেদার কায়ত = পরতাপদীপ = প্রতাপাদিত্য, এইরূপ বুঝিলে সকল গোল মিটিয়া যায়।*

প্রস্তাবের উপসংহারে—আমার বক্তব্য এই যে বিদ্যাধরের এই সংক্ষিপ্ত জীবনী সাধারণে প্রকাশ করিতেছি বটে, কিন্তু ইহাতে অমানুষিক ঘটনার সহিত ঐতিহাসিক ঘটনার বিশ্লেষণ চেষ্টা অল্পই দৃষ্ট হইবে। আবার অনেক কথা বিদ্যাধরের বংশধর সুরজবক্সের মুখে যেমন শুনা গিয়াছে, তেমনই লিখিয়াছি। সত্য বাহির করিবার জন্য আড়ম্বর করা হয় নাই।

---

* কেদার কায়স্থকে আমরা প্রতাপাদিত্য বলিয়া মনে করিতে পারি না। তিনি বারভূঁয়ার অন্যতম সুপ্রসিদ্ধ কেদার রায়।—সা° প° প° স°।



মুরলীধর বিদ্যাধর

সুরজবক্সের নিকট বিদ্যাধরের যে ছবি আছে, উপরে সেই ছবিরই প্রতিকৃতি দেওয়া হইল। ছবির ভাব এই যে—বিদ্যাধর বসিয়া আছেন। পুত্র মুরলীধর হাঁটু গাড়িয়া কিছু নিবেদন করিতেছেন। এদেশে বড়লোক বা গুরুজনের নিকট জানু পাতিয়া বসা শিষ্টাচার। পিতা ও পুত্রের মস্তকে জয়পুরী পাগড়ী ও গায়ে চাপকান। বিদ্যাধরের বর্ণ শ্যাম, নাসা অনুন্নত এবং চক্ষুঃ দীপ্তিবিশিষ্ট ও বড়। শরীর একহারা। উচ্চতা স্বাভাবিক।

শ্রীমেঘনাথ ভট্টাচার্য্য (জয়পুর)

ঐতিহাসিক সমস্যা

[১]

কনোজে আয়ুধ-রাজবংশ।

কনোজের গৌরবে বঙ্গদেশ গৌরবান্বিত, কনোজের পরিচয় দিয়া বঙ্গবাসী উচ্চশ্রেণী আজও স্পর্দ্ধা করিয়া থাকেন, বলিতে কি আমাদের পূর্ব্বপুরুষ কনোজ হইতে এ দেশে শুভাগমন করেন বলিয়া আজও আমরা আপনাদিগকে ধন্য মনে করিয়া থাকি। এই সকল কারণে কনোজের পুরাতত্ত্ব—কনোজের রাজকাহিনী আমাদের অবশ্যজ্ঞাতব্য ও অবশ্যপাঠ্য মনে করি। বিশেষতঃ যে সময় গৌড়রাজসভায় তেজঃপুঞ্জ সাগ্নিক ব্রাহ্মণের পদার্পণে গৌড়দেশ উদ্ভাসিত হইয়াছিল, সেই গৌড়াধিপ আদিশূরের সমসাময়িক কনোজ-রাজকাহিনী ও কনোজের আভ্যন্তরিক অবস্থা অবগত হইতে কে না আগ্রহ প্রকাশ করিবেন ?

বলিতে কি আদিশূরের সমসাময়িক কান্যকুব্জের ঐতিহাসিক সমস্যা এখনও সাধারণের অজ্ঞাত রহিয়াছে। সেই অবশ্যজ্ঞাতব্য সমস্যা পূরণ করিবার অভিপ্রায়েই বর্ত্তমান প্রবন্ধের অবতারণা।

বহুদিন হইল, আমরা দেখাইয়াছি যে গৌড়াধিপ আদিশূর ৬৫৪ শকে বা ৭৩২ খৃষ্টাব্দে সাগ্নিক ব্রাহ্মণ আনয়নের জন্য আয়োজন করেন এবং কনোজ হইতে সমুপাগত সাগ্নিক ব্রাহ্মণগণ ৭৫৩ হইতে ৭৫৫ খৃষ্টাব্দের মধ্যে কোন সময়ে গৌড়রাজসভা আলোকিত করিয়াছিলেন।* এখন কথা হইতেছে যে, কাশী, কাঞ্চী, প্রভৃতি বৈদিক স্থান থাকিতে আদিশূর কনোজ হইতেই বা কেন ব্রাহ্মণ আনাইয়াছিলেন ? অগ্রে কাশী ও মিথিলা থাকিতে কনোজ হইতে বৈদিক ব্রাহ্মণ আনীত হইলেন, তাহারই বা কারণ কি ?

যে সময়ের কথা লিখিতেছি, সে সময়ে বাস্তবিক কান্যকুব্জ বেদচর্চ্চার কেন্দ্র বলিয়াই পরিগণিত হইয়াছিল। এই কান্যকুব্জ হইতেই তৎকালে বৈদিক ধর্ম্মের পুনরভ্যুদয় হইতেছিল।

কহ্লণের রাজতরঙ্গিণী ও রাজশেখরের প্রবন্ধকোষ হইতে জানিতে পারি, খৃষ্টীয় ৮ম শতাব্দীর মধ্যভাগে যশোবর্ম্মা নামে একজন পরাক্রান্ত নৃপতি কনোজরাজ্য শাসন করিতেছিলেন। এই যশোবর্ম্মার সভায় মহাকবি ভবভূতি ও কবি বাক্‌পতি বিদ্যমান ছিলেন। সুপ্রসিদ্ধ প্রত্ন-তত্ত্ববিদ্ রামকৃষ্ণ গোপাল ভাণ্ডারকরের মতে, কনোজাধিপ যশোবর্ম্মার রাজ্যশাসনের প্রথমাংশে ভবভূতি ও শেষাংশে বাক্‌পতি রাজকবির আসন লাভ করিয়াছিলেন।† কাশ্মীর ঐতিহাসিক কহ্লণ কিন্তু উভয় কবিকেই এক সময়ের লোক বলিয়াই বর্ণনা করিয়াছেন। এই সম্বন্ধে রাজতরঙ্গিণীর উক্তি এই—

---

* বঙ্গের জাতীয় ইতিহাস ব্রাহ্মণকাণ্ড ১মা অংশ ১০২ পৃঃ।

† Bhandarkar's Report on the search of Sanskrit Mss, 1887, p. 15.

"কবির্বাক্‌পতিরাজশ্রীভবভূত্যাদিসেবিতঃ।
জিতো যযৌ যশোবর্ম্মা তদ্‌গুণস্তুতিবন্দিতাম্‌ ॥" ৪।১৪৪।

অর্থাৎ কবি বাক্‌পতিরাজ ও ভবভূতি প্রভৃতি দ্বারা সেবিত বিজিত রাজা যশোবর্ম্মা (বিজয়ী কাশ্মীরপতি) ললিতাদিত্যের গুণ ও স্তুতিগান করিবার জন্যই যেন বন্দিত স্থানে গমন করিলেন। এতদ্বারা স্পষ্টই জানা যাইতেছে যে কনোজাধিপতি যশোবর্ম্মা ললিতাদিত্যের নিকট যুদ্ধে পরাস্ত হইয়া তাঁহার প্রিয়কবি বাক্‌পতি ও ভবভূতি সহ কাশ্মীরে যাইতে বাধ্য হইয়াছিলেন। কহ্লণের মতানুসারে ললিতাদিত্য ৬৯৫ হইতে ৭৩২ খৃষ্টাব্দ পর্য্যন্ত রাজত্ব করেন। ঐ সময়ের মধ্যে কোন সময়ে কনোজরাজের পরাজয় ঘটে। এদিকে রাঢ়ীয় ও বারেন্দ্র কুলশাস্ত্র হইতেও আমরা জানিতে পারিয়াছি যে, ৬৫৪ শকে (৭৩২ খৃষ্টাব্দে) গৌড়রাজসভায় সাগ্নিক ব্রাহ্মণ আনয়নের উদ্যোগ চলিতেছিল।

রাজকবি বাক্‌পতি তাঁহার উৎসাহদাতা কনোজরাজ যশোবর্ম্মদেবের কীর্ত্তি ঘোষণা করিবার উদ্দেশ্যেই "গউড়বহো" বা 'গৌড়বধ' নামক প্রাকৃত কাব্য রচনা করেন। এই গৌড়বধ হইতেই আমরা জানিতে পারি যে, কনোজপতি মহারাজ যশোবর্ম্মা একজন পরাক্রান্ত দিগ্বিজয়ী নরপতি ছিলেন। গৌড়বধকাব্যে কান্যকুব্জপতি যশোবর্ম্মের গৌড়বিজয়যাত্রা পাঠ করিলে আমাদের মহাকবি কালিদাসের রঘুবংশে অজরাজের দিগ্বিজয়যাত্রা মনে পড়ে। তাঁহার বিপুল বাহিনীর পদভরে শোণনদের উপত্যকাভূমি প্রকম্পিত, তাঁহার বীরত্বপ্রভাবে মগধাধিপতি পরাজিত, গৌড়ীয় সামন্ত-নৃপালবর্গ পশ্চাদ্‌পদ ও গৌড়ীয়সেনার শোণিতে রণক্ষেত্র রক্তপ্লাবিত, এবং গৌড়রাজ ধৃত ও নিহত হইয়াছিলেন। কনোজপতি মলয়পর্ব্বতসন্নিহিত দাক্ষিণাত্যপতিকে বিজিত ও সমুদ্রতীর ভেদ করিয়া পারসিক জাতিকে পরাস্ত করিয়াছিলেন। এইরূপে জয়দৃপ্ত মহারাজ যশোবর্ম্মা নর্ম্মদাতীরে আসিয়া কার্ত্তবীর্য্যের কীর্ত্তিদর্শন ও তীর্থবাস করিয়া মরুদেশ দিয়া শ্রীকণ্ঠে (থানেশ্বরে) আগমন করেন, এখানে জনমেজয়ের সর্পসত্র ও কুরুক্ষেত্রে কর্ণের রণভূমি দর্শন করিয়া বাস্তবিক সেই মহাবীরের হৃদয় বীররসে আপ্লুত হইয়াছিল। তিনি অযোধ্যানগরীতে একদিনে একটী সুরপ্রাসাদ নির্ম্মাণ করাইয়া অপূর্ব্ব কীর্ত্তি স্থাপন করিয়াছিলেন। এমন কি কবি বাক্‌পতি উজ্জ্বল ভাষায় লিখিয়া গিয়াছেন যে, গৌড়-বিজয়ের পর, তিনি যে সকল রূপমাধুর্যময়ী মাগধ-রাজকুলললনাকে বন্দিরূপে আনিয়াছিলেন, ক্রীতদাসীর ন্যায় সেই সকল রাজকুলবধূ কনোজরাজ-দরবারে সর্ব্বসমক্ষে যশোবর্ম্মরাজের রাজশ্রীমণ্ডিত কর বপুতে চামর ব্যজন করিয়াছিল।

পূর্ব্বেই বলিয়াছি, মহাকবি ভবভূতি যশোবর্ম্মরাজের সভাকবি ছিলেন। তাঁহার বীরচরিত ও উত্তরচরিতে বৈদিক মার্গ-প্রবর্ত্তনের চিত্র অতি সুস্পষ্ট চিত্রিত হইয়াছে। লবকুশের জাতকর্ম্ম, চূড়াকরণ, উপনয়ন ও বেদাধ্যয়ন; রামচন্দ্রের দীক্ষাগ্রহণ, গোদানমঙ্গল ও বিবাহাদি সংস্কার; ভাণ্ডায়নাদির ব্রহ্মচর্য্য, অতিথিসৎকার ও তাঁহার বিধিব্যবস্থা প্রভৃতি পাঠ করিলে পদে পদেই যেন সেই প্রাচীন বৈদিক সমাজের চিত্র মনে আসিয়া পড়ে। ভবভূতি বেদ,

উপনিষদ্‌, ধর্ম্মশাস্ত্র, রামায়ণ, মহাভারত, পুরাণ প্রভৃতির মত উদ্ধৃত করিয়া বৈদিক সমাজের আদর্শ প্রদর্শন করিয়াছেন। বৌদ্ধ ও তান্ত্রিক ধর্ম্ম হইতে প্রতিনিবৃত্ত হইয়া জনসাধারণ যাহাতে বৈদিক আচার ব্যবহারের অনুসরণ করেন, ভবভূতির দৃশ্যকাব্যগুলিতে সেই গূঢ় উদ্দেশ্য অভিব্যক্ত রহিয়াছে।

ভবভূতির দৃশ্যকাব্য পাঠ করিলে ও তাঁহার আশ্রয়দাতা মহারাজ যশোবর্ম্মার চরিত্র আলোচনা করিলে সহজেই মনে হইবে যে, কনোজ-রাজসভা হইতেই উত্তর-ভারতে বেদমার্গ-প্রবর্ত্তনের চেষ্টা চলিতেছিল। মহারাজ যশোবর্ম্মা দুষ্টের দমন ও পুনরায় বৈদিক ধর্ম্মস্থাপনার্থ বিশেষ যত্নবান্ হইয়াছিলেন, সেই জন্যই তিনি কবিবর বাক্‌পতির গৌড়বধকাব্যে হরির অন্যতর অবতার "কমলায়ুধ" নামে পরিকীর্ত্তিত হইয়াছেন। বলিতে কি, কনোজাধিপ কমলায়ুধ উত্তর ভারতীয় হিন্দুসমাজে যে সনাতন বৈদিক ভাব উজ্জীবিত করিতেছিলেন, গৌড়বাসীকে তাহার অমৃতময় ফলভোগ করাইবার জন্যই মহারাজ আদিশূর কনোজ রাজসভা হইতে সাগ্নিক ব্রাহ্মণ আনাইবার জন্য বদ্ধপরিকর হইয়াছিলেন। অধিক সম্ভব, ৬৫৪ শকে আদিশূর অভিষিক্ত হন। তখন হইতেই কনোজের দিকে তাঁহার লক্ষ্য ছিল। তাই বারেন্দ্র ও রাঢ়ীয় ব্রাহ্মণদিগের কোন কোন কুলগ্রন্থে ৬৫৪ শক বা ৭৩২ খৃষ্টাব্দে গৌড়ে ব্রাহ্মণাগমনের কথা লিখিত হইয়াছে। কিন্তু তখনও আদিশূর গৌড়ের একাধীশ্বর হইতে পারেন নাই, তখনও গৌড়ে সম্পূর্ণ হিন্দু আধিপত্য প্রতিষ্ঠিত হয় নাই;—তখনও বৌদ্ধ প্রভাব,—বৌদ্ধাচার ও তান্ত্রিকতায় গৌড়ভূমি সমাচ্ছন্ন, তাই সহজেই আচারভ্রষ্ট হইবার আশঙ্কায় কান্যকুব্জবাসী নিষ্ঠাবান্ সাগ্নিক ব্রাহ্মণগণ প্রথমে গৌড়ে আসিতে সম্মত হন নাই। শুভক্ষণে যশোবর্ম্মবিজেতা ভারতবিজয়ী ললিতাদিত্যের পৌত্র কাশ্মীরবীর জয়াদিত্য পৌণ্ড্রবর্দ্ধনে আগমন করিলেন, শুভক্ষণে কাশ্মীর ও গৌড় সম্বন্ধ-সূত্রে আবদ্ধ হইলেন। কাশ্মীরপতি জয়াদিত্য পঞ্চগৌড়ের নৃপালবর্গকে পরাজিত করিয়া তাঁহার শ্বশুর "আদিশূর" উপাধিধারী রাজা জয়ন্তকে সকলের অধীশ্বর করিয়াছিলেন এবং তাঁহারই প্রভাবে কনোজপতি পরাজিত ও আদিশূরের আমন্ত্রণে গৌড়দেশে বৈদিক ধর্ম্ম প্রচারের জন্য সাগ্নিক ব্রাহ্মণ পাঠাইতে বাধ্য হইয়াছিলেন।

উক্ত কনোজপতি কমলায়ুধ-যশোবর্ম্মা পূর্ব্বে গৌড়জয় করিয়া এদেশে মহাবীর বলিয়াই প্রসিদ্ধ ছিলেন, সেই জন্য এ দেশীয় কুলগ্রন্থসমূহে তিনি "বীরসিংহ" নামে আখ্যাত হইয়াছেন। এই কমলায়ুধ হইতেই কনোজে 'আয়ুধ' উপাধিধারী রাজবংশের প্রতিষ্ঠা। যতদিন কমলায়ুধ-যশোবর্ম্মা জীবিত ছিলেন, ততদিন কান্যকুব্জে পৃথুর রাজ্য চলিয়াছিল;—বিপদে সম্পদে হিন্দুকুল-তিলক কনোজপতি একদিনের জন্যও স্বীয় উদ্দেশ্য বিস্মৃত হন নাই। কত বৈদেশিক আক্রমণে তিনি উত্যক্ত হইয়াছেন, কতবার কাশ্মীরসৈন্য কান্যকুব্জের যথাসর্ব্বস্ব গ্রাস করিতে উদ্যত হইয়াছে, তথাপি তিনি কনোজের সিংহাসনে বসিয়া হিন্দুধর্ম্ম উদ্ধারের জন্য যে যত্ন ও অধ্যবসায় দেখাইয়া গিয়াছেন, তাহারই প্রভাবে আজও কান্যকুব্জ বঙ্গবাসীর চক্ষে সাগ্নিক বিপ্রের লীলাভূমি ও বুদ্ধিজীবী কায়স্থগণের আদি জন্মভূমি বলিয়া মহাপুণ্যক্ষেত্ররূপে সমাদৃত হইয়া থাকে।

বেদমার্গ নিরত কমলায়ুধ যশোবর্ম্মা ৭৫৩ খৃষ্টাব্দে ইহলোক পরিত্যাগ করিলেন ও তৎপুত্র আমরাজ পিতৃসিংহাসনে অধিষ্ঠিত হইলেন। বপ্পভট্টি-সূরি চরিত, প্রবন্ধকোষ, প্রভাবকচরিত, পট্টাবলী, তীর্থকল্প প্রভৃতি গ্রন্থে যশোবর্ম্মপুত্র কনোজপতি আমরাজের প্রসঙ্গ দৃষ্ট হয়। প্রভাবকচরিতে লিখিত আছে—

"পাটলিপুরে শূরপাল (বপ্পভট্টি) জন্ম পরিগ্রহ করেন। ৮০৭ সংবতে (৭৫১ খৃষ্টাব্দে) তাঁহার দীক্ষা হয়। এ সময়ে কান্যকুব্জে যশোবর্ম্মা রাজত্ব করিতেছিলেন। যশোবর্ম্মার মৃত্যুর পর তৎপুত্র আমরাজ কান্যকুব্জের সিংহাসনে অভিষিক্ত হইলেন; তাঁহার সহিত গৌড়াধিপ ধর্ম্মের ঘোর শত্রুতা চলিয়াছিল। প্রথমে শূরপাল আমরাজের সভায় ছিলেন, কিন্তু তিনি কোন কারণে বিরক্ত হইয়া লক্ষণাবতী নগরে চলিয়া আসেন, তৎকালে কবি বাক্‌পতি ধর্ম্মরাজের প্রধান সভাপণ্ডিত বলিয়া গণ্য ছিলেন। বাক্‌পতির যত্নে শূরপাল গৌড়রাজসভায় সসম্মানে রাজগুরুরূপে কিছুদিন অতিবাহিত করিলেন। কনোজপতি আমরাজ শূরপালের বিচ্ছেদে কিছুদিন মনে মনে অশান্তিভোগ করিয়াছিলেন। তিনি কোশল করিয়া তাঁহাকে পুনরায় আপনার সভায় আনাইলেন। তাহাতে গৌড়পতি ধর্ম্ম অতিশয় দুঃখিত হইলেন। অল্প দিন পরেই তিনি আমরাজকে বলিয়া পাঠাইলেন যে, আমরা চিরদিন উভয়ে উভয়ের শত্রু, বৃথা আর শস্ত্রযুদ্ধ না করিয়া আসুন আমরা শাস্ত্রযুদ্ধে লিপ্ত হই। আমার রাজ্যে বর্দ্ধনকুঞ্জর নামে একজন বৌদ্ধপণ্ডিত আসিয়াছেন, আপনার যে কোন সভাপণ্ডিত আসিয়া তাঁহার সহিত শাস্ত্র-সংগ্রামে প্রবৃত্ত হইতে পারেন। এই সংগ্রামে যাঁহার পক্ষ পরাজিত হইবেন, তিনি বিনা আপত্তিতে নিজ রাজ্য পরিত্যাগ করিতে বাধ্য হইবেন! কনোজপতি শূরপালকে পাঠাইয়া দিলেন;—জৈনাচার্য্য শূরপাল আমরাজের পক্ষ হইয়া বিচারযুদ্ধে অগ্রসর হইলেন। বর্দ্ধনকুঞ্জর গুটিকা-সিদ্ধ ছিলেন। তাঁহার অপূর্ব্ব গুটিকাপ্রভাবে কেহই তাঁহার সহিত তর্কযুদ্ধে জয়ী হইতে পারিতেন না। তাঁহার সেই কৌশল কবি বাক্‌পতি ভিন্ন আর কাহারও জানা ছিল না। বুদ্ধিমান্ শূরপাল গৌড়রাজধানীতে উপস্থিত হইয়া তাঁহার বহুদিনের পরিচিত কবি বাক্‌পতির শরণাপন্ন হইলেন এবং যাহাতে তাঁহার মানসম্ভ্রম রক্ষা হয়, তজ্জন্য অনুরোধ করিলেন। বাক্‌পতি শূরপালের অনুরোধ এড়াইতে পারিলেন না। তিনি গোপনে বর্দ্ধনকুঞ্জরের কৌশলটী বলিয়া দিলেন। গৌড়রাজসভায় উভয় শাস্ত্রবীর সম্মুখীন হইলেন। বিচারের পূর্ব্বেই শূরপাল কৌশল করিয়া তাঁহার প্রতিদ্বন্দ্বীর গুটিকাটী সরাইয়া ফেলিলেন। সুতরাং বর্দ্ধনকুঞ্জরের কৌশলজাল ছিন্ন হইল। বর্দ্ধনকুঞ্জরের পরাজয়ের সহিত গৌড়পতি আপনার বিশাল রাজ্যসম্পদ্ আমরাজের করে সমর্পন করিতে বাধ্য হইলেন। কিন্তু কান্যকুব্জপতি নিজ গুরু শূরপালের আদেশে গৌড়-রাজ্য প্রত্যর্পণ করিয়া ধর্ম্মরাজের সহিত বন্ধুত্বসূত্রে আবদ্ধ হইলেন। ৮৯০ বিক্রম সংবতে (৮৩৪ খৃষ্টাব্দে) মগধতীর্থে আমরাজ দেহত্যাগ করেন।"

জৈনগ্রন্থ প্রভাবকচরিতে কনোজরাজের সহিত গৌড়রাজের শাস্ত্রসংগ্রামপ্রসঙ্গ জৈনাচার্য্য বপ্পভট্টি শূরপালের গৌরব-ঘোষণার্থ রচিত হইলেও এবং গুটিকাপ্রভাবের কথা অনেকটা

গণ্য বলিয়া স্বীকার করিলেও পূর্ব্ববর্ণিত জৈনগ্রন্থসমূহ হইতে কনোজপতি আমরাজ ও গৌড়পতি ধর্ম্ম উভয়ে যে সমসাময়িক ছিলেন, তাহার বিলক্ষণ প্রমাণ পাওয়া যাইতেছে। যে কবি বাক্‌পতি বৈদিক মার্গপ্রবর্ত্তক যশোবর্ম্মার সভা উজ্জ্বল করিয়াছিলেন, তাঁহাকেই আবার আমরা গৌড়পতি ধর্ম্মের সভায় উপস্থিত দেখি।

বঙ্গের বারেন্দ্র ও রাঢ়ীয় ব্রাহ্মণগণের কুলগ্রন্থ হইতে আমরা জানিতে পারিয়াছি যে গৌড়াধিপ আদিশূরের পরই পালবংশের অভ্যুদয় ঘটে। রাঢ়ীয় কুলাচার্য্য হরিমিশ্রের কারিকায় স্পষ্টই লিখিত হইয়াছে যে, রাজা আদিশূরের বংশীয়েরা বেশী দিন গৌড়রাজ্য ভোগ করিতে পারেন নাই। অনতিপরেই বৌদ্ধধর্ম্মানুরাগী দেবপালের আধিপত্য বিস্তৃত হইয়াছিল।* ইতিহাস আলোচনা করিলেও দেখা যায় যে, ধর্ম্মপালই গৌড়ের পালবংশীয় প্রথম নৃপতি। ইনিই জৈনগ্রন্থ সমূহে গৌড়াধিপ "ধর্ম্ম" নামে প্রখ্যাত হইয়াছেন।

এখন আমরা জানিতে পারিতেছি যে, কনোজপতি কমলায়ুধ যশোবর্ম্মা ও গৌড়পতি আদিশূর উপাধিধারী জয়ন্তের সময় যেমন কান্যকুব্জ ও গৌড়দেশে বৈদিকধর্ম্মের পুনরভ্যুদয় ঘটিয়াছিল, আবার পরবর্ত্তী কনোজপতি আমরাজের সময় সেইরূপ কান্যকুব্জে জৈনধর্ম্মাভ্যুদয় এবং গৌড়পতি ধর্ম্মপালের সময় গৌড়ভূমে বৌদ্ধপ্রভাব বিস্তৃত হইতেছিল। খালিমপুর হইতে প্রাপ্ত ধর্ম্মপালের তাম্রশাসনেও বর্ণিত হইয়াছে—

"ভোজৈর্ম্মৎস্যৈঃ সমদ্রৈঃ কুরুযদুযবনাবন্তিগন্ধারকীরৈ-
র্ভূপৈর্ব্যালোলমৌলিপ্রণতিপরিণতৈঃ সাধুসংগীর্য্যমাণঃ।
হৃষ্যৎপঞ্চালবৃদ্ধোদ্ধৃতকনকময়স্বাভিষেকোদকুম্ভো-
দত্তঃ শ্রীকান্যকুব্জস্সললিত চলিতভ্রূলতালক্ষ্ম যেন॥"

ভোজ, মৎস্য, মদ্র, কুরু, যদু, যবন, অবন্তী, গান্ধার, কীর (কাশ্মীর) প্রভৃতি দেশীয় নৃপতিগণ অবনত মস্তকে প্রণতিপূর্ব্বক যাঁহার সাধুবাদ কীর্ত্তন করেন, তিনি (সেই গৌড়পতি ধর্ম্মপাল) যে কান্যকুব্জে অভিষিক্ত হইবার জন্য সহর্ষে পাঞ্চালবৃদ্ধোদ্ধৃত, সুমনোহর ভ্রূলতাচিহ্নিত অভিষেকবারিপূর্ণ কনকময় কুম্ভ প্রস্তুত করিয়াছিলেন, তাহা কনোজপতিকেই প্রদান করিলেন।

উদ্ধৃত তাম্রশাসনোক্তি হইতে জানিতেছি যে, রাজা ধর্ম্মপাল কনোজপতিকে স্বরাজ্যে অভিষিক্ত করিয়াছিলেন। ধর্ম্মপালের ভ্রাতৃপ্রপৌত্র নারায়ণপালের তাম্রশাসনের মতে, ধর্ম্মপাল ইন্দ্ররাজকে পরাজয় করিয়া চক্রায়ুধকে সিংহাসন প্রদান করিয়াছিলেন। উক্ত ইন্দ্ররাজ কে? এই ইন্দ্ররাজের কাল ও পরিচয় সম্বন্ধে মতভেদ লক্ষিত হয়।

পুণার ডি, আর, ভাণ্ডারকর অল্পদিন হইল, রাষ্ট্রকূটপতি ৪র্থ গোবিন্দের তাম্রশাসন আলোচনা উপলক্ষে দেখাইতে চেষ্টা করিয়াছেন যে, রাষ্ট্রকূটপতি ৩য় ইন্দ্রই উক্ত ইন্দ্ররাজ। তিনি ধর্ম্মপাল ও ৪র্থ গোবিন্দের তাম্রশাসনের উপর নির্ভর করিয়া সিদ্ধান্ত করিয়াছেন যে—

* বিশ্বকোষ ৪র্থ ভাগ "কুলীন" শব্দ দ্রষ্টব্য।

"The Indraràja, therefore mentioned in the Bhagalpur and Khalimpur grants must be identical with the Ràstrakuta prince Indra III. and the king of Kanykubja, whom he vanquished, is doubtless Kshitipala or Mahipàla. But the honour of placing Kshitipala on his throne is claimed for the Chandella prince Harshadeva by Khajuraho inscription above alluded to, and for Dharmapàla by the Bhagalpur and Khalimpur charters. And what in all likelihood must have come to pass is that both Harshadeva and Dharmapàla placed Kshitipàla on his throne.

There remains another conclusion yet to be deduced from the Bhagalpur grant. The King of Mahodaya or Kanykubja, whom Indraràja ousted, is mentioned therein as *Chakràyudha* and we have just show that this king of Mahodaya was Kshiti.àla, therefore, appears to have borne the epithet Chak.àyudha."

অর্থাৎ 'ভাগলপুর ও খালিমপুরের তাম্রশাসনে যে ইন্দ্ররাজ উক্ত হইয়াছেন, তাঁহাকে অবশ্যই রাষ্ট্রকূটরাজ ৩য় ইন্দ্র বলিয়া মনে করিতে হইবে। আর যে কান্যকুব্জপতিকে তিনি উৎসাদিত করিয়াছিলেন, তিনি নিঃসন্দেহে ক্ষিতিপাল বা মহীপাল। কিন্তু খাজুরাহর শিলালিপি অনুসারে ক্ষিতিপালকে সিংহাসনে-স্থাপনরূপ-গৌরবভাগী চন্দেল্লরাজ হর্ষদেব,—আবার ভাগলপুর ও খালিমপুর শাসন অনুসারে ধর্ম্মপালই হইতেছেন। যাহা হউক অধিক সম্ভব যে হর্ষদেব ও ধর্ম্মপাল উভয়েই ক্ষিতিপালকে সিংহাসনে স্থাপন করিয়াছিলেন। ভাগলপুর-শাসন হইতে আর একটী সিদ্ধান্ত স্থির হইতে পারে। ঐ শাসনে মহোদয় বা কান্যকুব্জরাজ, যাঁহাকে ইন্দ্ররাজ সিংহাসনচ্যুত করিয়াছিলেন, 'তিনি চক্রায়ুধ' নামে বর্ণিত হইয়াছেন। এই মহোদয়রাজই যে ক্ষিতিপাল বা মহীপাল তাহাও দেখান হইয়াছে। অতএব এখন মনে হইতেছে যে ক্ষিতিপালই 'চক্রায়ুধ' উপাধি ব্যবহার করিতেন।'

এইরূপ সিদ্ধান্ত করিয়া তিনি আরও লিখিয়াছেন যে,—

"Two other points of some importance deserve to be noticed. The first is with regard to the date of Dharmapàla, who has been placed conjecturally by Cunningham and Prof. Kielhorn in the middle of the 9th century. But we have seen that Dharmapàla was a contemporary of the Rashtrakuta prince Indra III. for whom the Ràstrakuta records furnish the dates 915 and 917 A. D. We thus have positive evidence that in the earliar part of the 10th Century, i. e. at least half a century later than he has hitherto been placed. Next, the Mungir plates of Devapàladeva, tell us that Dharmapàla married Rannadevi

* Epigraphia Indica, Vol. VII. p. 32.

daughter of the Rastrakuta prince Sri Paravala. Prof Kielhorn, who re-edited the inscription, corrects Sri Paravala into Sri Vallabha." †

'এখানে দুইটী বিষয় উল্লেখযোগ্য। ১ম—ধর্ম্মপালের কালনির্ণয় সম্বন্ধে। কনিংহাম্ ও অধ্যাপক কিল্‌হোর্ণ আন্দাজী খৃষ্টীয় ৯ম শতাব্দীর আগু বা মধ্যভাগ স্থির করিয়াছেন। কিন্তু আমরা দেখিয়াছি যে, ধর্ম্মপাল রাষ্ট্রকূটপতি ৩য় ইন্দ্রের সমসাময়িক। রাষ্ট্রকূট-শাসনসমূহ হইতে উক্ত রাজার ৯১৫ হইতে ৯১৭ খৃষ্টাব্দ পাওয়া যাইতেছে। এইরূপে আমরা বিশেষ প্রমাণ পাইতেছি যে, ধর্ম্মপাল খৃষ্টীয় ১০ম শতাব্দীর প্রথমাংশে অর্থাৎ পূর্ব্বে তাঁহার যে কাল নির্ণীত হইয়াছিল, তাহার অন্ততঃ অর্দ্ধ শতাব্দী পরের লোক হইতেছেন। ২য়তঃ—মুঙ্গের হইতে প্রাপ্ত দেবপালদেবের তাম্রশাসন নির্দ্দেশ করিতেছে যে, ধর্ম্মপাল রাষ্ট্রকূটপতি পরবল-কন্যা রণ্ণাদেবীর পাণিগ্রহণ করেন। অধ্যাপক কিলহোর্ণ উক্ত তাম্রশাসন পুনঃসম্পাদনকালে পরবল স্থানে "শ্রীবল্লভ" পাঠ শোধন করিয়াছেন।'

এইত গেল ভাণ্ডারকর মহাশয়ের যুক্তি। এদিকে আবার শ্রীযুক্ত নিখিলনাথ রায় মহাশয় লিখিয়াছেন—

"ভাগলপুর হইতে প্রাপ্ত নারায়ণপালের তাম্রশাসন পাঠে অবগত হওয়া যায় যে, ধর্ম্মপাল ইন্দ্ররাজ প্রভৃতি অরাতিবর্গকে পরাজয় করিয়া চক্রায়ুধ নামে রাজাকে কান্যকুব্জ প্রদান করিয়াছিলেন। কান্যকুব্জের রাজবংশে চক্রায়ুধ নামে রাজার কোন উল্লেখ দৃষ্ট না হইলেও ইন্দ্ররাজের উল্লেখ পাওয়া যায়। উক্ত ইন্দ্ররাজ সম্ভবতঃ রাষ্ট্রকূটবংশীয়। রাষ্ট্রকূটবংশীয়েরা পশ্চিম ভারতে রাজত্ব করিতেন। এক সময়ে কান্যকুব্জ পর্য্যন্ত তাঁহাদের অধিকার-ভুক্ত হইয়াছিল। রাষ্ট্রকূট-বংশের তালিকায় ৪ জন ইন্দ্ররাজের নাম দৃষ্ট হয়। নারায়ণপালের তাম্রশাসনোক্ত ইন্দ্ররাজকে আমরা ৩য় ইন্দ্র বলিতে পারি। কারণ পূর্ব্বাপর আলোচনা করিলে অন্যান্য প্রমাণের দ্বারা স্থিরীকৃত ধর্ম্মপালের সময়ের সহিত অপরাপর ইন্দ্ররাজের সময়ের অনেক পার্থক্য হইয়া পড়ে। ৩য় ইন্দ্ররাজের পর আমরা ২য় কর্ক রাজকে রাষ্ট্রকূটবংশের তালিকায় দেখিতে পাই। রাষ্ট্রকূটবংশের ৭৪৪ শকাব্দের ১২ই বৈশাখের একখানি তাম্রশাসনে দৃষ্ট হয় যে গৌড়েশ্বরের আক্রমণ হইতে আত্মরক্ষা করিবার জন্য মালবপতি কর্করাজের আশ্রয় গ্রহণ করিয়াছিলেন। এই গৌড়েশ্বর যে ধর্ম্মপাল, সে বিষয়ে সন্দেহ নাই। সুতরাং ২য় কর্করাজের পূর্ব্ববর্ত্তী ৩য় ইন্দ্ররাজ যে ধর্ম্মপাল কর্ত্তৃক পরাস্ত হইয়াছিলেন, তাহা বেশ বুঝা যাইতেছে। জৈন হরিবংশে লিখিত আছে যে ৭০৫ শকাব্দে উত্তরপ্রদেশে কৃষ্ণনৃপজ ইন্দ্রায়ুধ নামে রাজা রাজত্ব করিতেন। রাষ্ট্রকূটবংশের তালিকায় ২য় কৃষ্ণরাজের এক পুরুষ পরে ৩য় ইন্দ্ররাজের উল্লেখ আছে। উক্ত তালিকা দ্বারা রাজগণের পরস্পর সম্বন্ধ বুঝিতে পারা যায় না, কিন্তু কাহার পর কাহার রাজত্বকালের সম্ভব

† Epigraphia Indica, Vol. VII. p. 33.

হইতে পারে, ইহাই নির্দ্দিষ্ট হইয়াছে। সুতরাং কৃষ্ণরাজের এক পুরুষ পরে ইন্দ্ররাজের নাম দৃষ্ট হওয়ায় ৩য় ইন্দ্ররাজকে কৃষ্ণনৃপজ বলিয়া স্বীকার করা যাইতে পারে।" *

উপরে যে দুইটী মত উদ্ধৃত করিলাম, উহার কোনটী সমীচীন বলিয়া গ্রহণ করা যায় না। নিখিল বাবুর কথায় যদি রাষ্ট্রকূটপতি ৩য় ইন্দ্ররাজকে ইন্দ্রায়ুধ ও ধর্ম্মপালকে তাঁহার সমসাময়িক বলিয়া স্বীকার করা যায়, তাহা হইলে ধর্ম্মপালকে ঐ সময়ের রাজা না বলিয়া তাঁহার নির্দ্দিষ্ট-কালের বহু পরবর্ত্তী বলিয়া স্বীকার করিতে হইবে? কারণ রাষ্ট্রকূটপতি ৩য় ইন্দ্র ৮৩৭—৩৯ শকাব্দে রাজত্ব করিতেছিলেন, তাহা তাঁহার তাম্রশাসন হইতেই প্রমাণিত হইয়াছে? আবার ভাণ্ডারকরের মতানুবর্ত্তী হইয়া ধর্ম্মপালকে কথনই আমরা ঐ সময়ের লোক বলিয়া স্বীকার করিতে পারি না। কারণ পূর্ব্বেই আমরা দেখাইয়াছি যে, কনোজরাজকবি বাকৃপতি ধর্ম্মপালের সভাও উজ্জ্বল করিয়াছিলেন। বাকৃপতি কান্যকুব্জাধিপ যশোবর্ম্মার সভাসদ্ ছিলেন এবং প্রতি-পালক নৃপতির গৌরব-ঘোষণার উদ্দেশ্যেই "গৌড়বধকাব্য" রচনা করেন। প্রত্নতত্ত্ববিদ্ রামকৃষ্ণ গোপাল ভাণ্ডারকর নিজেই স্বীকার করিয়াছেন যে, যশোবর্ম্মা প্রায় ৭৫৩ খৃষ্টাব্দে (৬৭৫ শকাব্দে) ইহলোক পরিত্যাগ করেন †। কবি বাকৃপতি যখন যশোবর্ম্মা ও ধর্ম্মপাল উভয় নৃপতির সভায় বিদ্যমান ছিলেন, তখন ধর্ম্মপাল কোন মতেই ৮৩৭ শকাব্দের সমসাময়িক বা খৃষ্টীয় ১০ম শতাব্দীর লোক হইতে পারেন না। নারায়ণপালের তাম্রশাসন ও জৈন হরিবংশবর্ণিত বচনের প্রকৃত অর্থ করিতে না পারিয়াই ভাণ্ডারকর মহাশয় ও নিখিলবাবু উভয়েই বিষম ভ্রমে পতিত হইয়াছেন। প্রথমতঃ—নারায়ণপালের তাম্রশাসনে এইরূপ বচন লক্ষিত হয়—

"জিত্বেন্দ্ররাজপ্রভৃতীনরাতীনুপার্জ্জিতা যেন মহোদয়শ্রীঃ।
দত্তা পুনঃ সা বলিনার্থয়িত্রে চক্রায়ুধায়ানতিবামনায় ॥"

এই শ্লোকটীর দুই প্রকার অর্থ করা যায়। একপক্ষে—বলি দেবরাজ ইন্দ্র প্রভৃতি নিজ শত্রুকে পরাজয় করিয়া স্বর্গরাজ্য উপার্জ্জন করিয়াছিলেন, পরে আবার তাহাই তাঁহার পালক অনতিবামনরূপ চক্রায়ুধকে [বিষ্ণুকে] সেই বলিদ্বারাই প্রদত্ত হইয়াছিল।

অপরপক্ষে—ইন্দ্ররাজ প্রভৃতি শত্রুগণকে জয় করিয়া যদ্দারা [যে ধর্ম্মপাল দ্বারা] মহোদয় বা কান্যকুব্জের রাজ্যশ্রী উপার্জ্জিতা হইয়াছিলেন, তিনিই [রাজ্যশ্রী] আবার তৎপিতা নাতিথর্ব্ব চক্রায়ুধে বলি [উপহার] সহ প্রদত্তা হইয়াছিলেন।

অর্থাৎ দেবরাজ ইন্দ্র প্রভৃতি শত্রুগণকে পরাজয় করিয়া বলি যেমন ত্রিভুবনলক্ষ্মীলাভ করিয়া-ছিলেন, ধর্ম্মপালও সেইরূপ ইন্দ্ররাজ প্রভৃতি আরাতিবৃন্দকে জয় করিয়া মহোদয় বা কান্যকুব্জ-রাজ্যলক্ষ্মী উপার্জ্জন করিয়াছিলেন। আবার বলি যেমন পাতা চক্রায়ুধ বামনদেবকে (সেই সমুদয়) প্রদান করিয়াছিলেন, ধর্ম্মপালও সেইরূপ (ইন্দ্ররাজের) পিতা নাতিথর্ব্ব চক্রায়ুধকে সেই (কান্যকুব্জরাজ্যলক্ষ্মী) উপহার দিয়াছিলেন।

---

* মুর্শিদাবাদের ইতিহাস ১ম খণ্ড ১৩৫ পৃঃ।

† Dr. R. G. Bhandarkar's Report on the Search of Sanskrit Mss, 1887, p. 15.

অতএব নারায়ণপালের তাম্রশাসন অনুসারে কনোজপতি ইন্দ্ররাজ চক্রায়ুধের পুত্র হইতেছেন। সাময়িক গ্রন্থকার জিনসেনাচার্য্য স্বরচিত অরিষ্টনেমিপুরাণসংগ্রহে হরিবংশে (৬৬ সর্গে) লিখিয়াছেন,—

"শাকেষ্বব্দশতেষু সপ্তসু দিশং পঞ্চোত্তরেষূত্তরাং
পাতীন্দ্রায়ুধনাম্নি কৃষ্ণনৃপজে শ্রীবল্লভে দক্ষিণাম্।
পূর্ব্বাং শ্রীমদবন্তিভূভৃতি নৃপে বৎসাদিরাজেহপরাং
সৌরাণামধিমণ্ডলে জয়যুতে বীরে বরাহেঽবতি॥"

অর্থাৎ সপ্ত শত পঞ্চ (৭০৫) শকাব্দে উত্তরাংশে ইন্দ্রায়ুধ, দক্ষিণ দেশে কৃষ্ণরাজপুত্র শ্রীবল্লভ, পূর্ব্ব হইতে শ্রীমদবন্তিভূমিপতি বৎসরাজ এবং পশ্চিম হইতে সৌরদিগের অধিমণ্ডলে জয়শীল বরাহ রাজ্য পালন করিতেছেন।

পূর্ব্বেই লিখিয়াছি যে, কনোজপতি কমলায়ুধ-যশোবর্ম্মা ৭৫৩ খৃষ্টাব্দে (৬৭৫ শকে) দেহত্যাগ করেন এবং তৎপুত্র আমরাজ সিংহাসন প্রাপ্ত হন। এদিকে আবার জৈন-হরিবংশকার-জিনসেনাচার্য্যের সমসাময়িক বচন হইতে দেখা যাইতেছে যে ৭০৫ শকে অর্থাৎ কমলায়ুধের দেহাত্যয়ের ৩০ বর্ষ পরে ইন্দ্রায়ুধ নামক এক রাজা উত্তরদিক্ শাসন করিতেছিলেন। গৌড়ের পালবংশীয় রাজগণের ইতিহাস আলোচনা করিলেও দেখিতে পাওয়া যায় যে, ঠিক ঐ সময়ে ধর্ম্মপালের অভ্যুদয় হইতেছিল। ধর্ম্মপালের সহিত কমলায়ুধপুত্র আমরাজের যে বন্ধুত্ব স্থাপিত হইয়াছিল, তাহা একাধিক প্রাচীন জৈনগ্রন্থ হইতে জানা গিয়াছে। আবার প্রভাবকচরিত হইতে পাইতেছি যে, ৮৯১ বিক্রম সংবতে বা ৭৫৬ শকে মগধতীর্থে (সম্ভবতঃ অতি বৃদ্ধ বয়সে) আমরাজ দেহত্যাগ করেন। এরূপ স্থলে ৭০৫ শকে আমরাজেরই রাজ্যকাল পড়িবার কথা। তবে কি আমরাজেরই অপর নাম ইন্দ্রায়ুধ? তাহাই বা কি করিয়া বলি। কারণ নারায়ণপালের তাম্রশাসন নির্দ্দেশ করিতেছে যে ধর্ম্মপাল ইন্দ্ররাজকে জয় করিয়া তাঁহারই পিতা চক্রায়ুধকে কনোজরাজ্য প্রত্যর্পণ করিয়াছিলেন। এদিকে নানা জৈনগ্রন্থ হইতে জানা গিয়াছে যে, আমরাজের রাজ্যাভিষেকের পূর্ব্বেই তৎপিতা যশোবর্ম্মা কমলায়ুধ ইহলোক পরিত্যাগ করিয়াছিলেন। সুতরাং আমরাজকে আমরা ইন্দ্ররাজ বলিয়া গ্রহণ করিতে পারিলাম না।

পূর্ব্বেই উল্লেখ করিয়াছি যে মাবেল ডফের অনুবর্ত্তী হইয়া নিখিলবাবু ইন্দ্রায়ুধকে কৃষ্ণনৃপজ বলিয়া স্থির করিয়াছেন *। কিন্তু জিনসেনের উদ্ধৃত শ্লোকানুসারে—"কৃষ্ণনৃপজে শ্রীবল্লভে দক্ষিণাম্" অর্থাৎ কৃষ্ণনৃপপুত্র শ্রীবল্লভ দক্ষিণদিকের অধিপতি হইতেছেন। ডাক্তার ভাণ্ডারকরও বহু গবেষণা দ্বারা রাষ্ট্রকূটপতি কৃষ্ণরাজের পুত্র ২য় গোবিন্দকেই উক্ত শ্রীবল্লভ বলিয়া স্থির করিয়াছেন। বাস্তবিক কাবী ও পৈঠন হইতে প্রাপ্ত রাষ্ট্রকূট-তাম্রশাসনে ২য় গোবিন্দ "শ্রীবল্লভ" নামে কীর্ত্তিত হইয়াছেন।† কৃষ্ণরাজপুত্র এই শ্রীবল্লভই ৭০৫ শকে রাষ্ট্রকূট-সিংহাসনে অধি-

* Duff's Indian Chronology, p, 68.

† Dr Bhandarkar's Dekkan, p. 65.

ষ্ঠিত ছিলেন। এই রাষ্ট্রকূটপতি শ্রীবল্লভের কন্যাকেই ধর্ম্মপাল বিবাহ করিয়াছিলেন। সুতরাং উত্তরদেশের রাজা ইন্দ্রায়ুধ কখনই কৃষ্ণনৃপপুত্র হইতে পারেন না। প্রভাবকচরিত, প্রবন্ধকোষ প্রভৃতি জৈনগ্রন্থ হইতে জানা যায় যে, আমরাজের পুত্র ইন্দুক পাটলিপুত্র নগরে বিবাহ করেন। তিনি কৃতঘ্ন, পিতৃদ্বেষ্টা ও নিতান্ত অধার্ম্মিক ছিলেন। এমন কি, তাঁহার শিশুপুত্র ভোজ * তাঁহার হাত এড়াইবার জন্য পাটলিপুত্রে পলাইয়া আসেন। অবশেষে এই ভোজের হস্তেই ইন্দুক লীলাসম্বরণ করেন।

উক্ত পিতৃদ্বেষী ইন্দুকই যে ইন্দ্ররাজ বা ইন্দ্রায়ুধ এবং তাঁহার পিতা আমরাজই যে তাম্রশাসনে চক্রায়ুধ নামে প্রথিত হইয়াছেন, ইহাতে সন্দেহ করিবার আর কোন কারণ দেখি না।

খালিমপুরের তাম্রশাসনে দেখিতে পাই যে ধর্ম্মপালের রাজধানী পাটলিপুত্রে, অথচ তিনি গৌড়াধিপ বলিয়া পরিকীর্ত্তিত। সম্ভবতঃ এ সময়ে গৌড়দেশের পশ্চিমাংশ মাত্র তাঁহার করতলগত হইয়াছিল। এই পাটলিপুত্রে অধিষ্ঠানকালেই অধিক সম্ভব তাঁহার সহিত চক্রায়ুধ-আমরাজের মিত্রতা স্থাপিত হয়।

পূর্ব্ব হইতেই পাটলিপুত্রের সহিত আমরাজ চক্রায়ুধের সম্বন্ধ ছিল, তাহা নানা জৈনগ্রন্থ হইতে জানিতে পারি। তৎপুত্র ইন্দুকের পাটলিপুত্রে বিবাহই তাহার অন্যতর প্রমাণ। সম্ভবতঃ ৭০৫ শকে (৭৮৩ খৃষ্টাব্দে) পিতৃদ্বেষী ইন্দ্রায়ুধ পিতাকে রাজ্যচ্যুত করিয়া সিংহাসন অধিকার করিয়া বসিয়াছিলেন। তৎকালে চক্রায়ুধ-আমরাজ শিশুপৌত্র ভোজকে লইয়া পাটলিপুত্রে পলাইয়া আসিতে বাধ্য হইয়াছিলেন। অবশেষে পাটলিপুত্রের অধীশ্বর ধর্ম্মপাল ইন্দ্রায়ুধকে পরাজয় করিয়া আবার চক্রায়ুধ-আমরাজকে কনোজের রাজ্যলক্ষ্মী প্রদান করিয়াছিলেন।

উপরোক্ত বিবরণ দ্বারা একটী ঐতিহাসিক সমস্যা পূরণ হইতেছে। আমরা প্রাচীনগ্রন্থে, ইতিহাসে ও তাম্রশাসনাদিতে বিভিন্ন আয়ুধ উপাধিধারী যে রাজগণের নাম পাইয়াছি, তাঁহারা একসময়ে প্রবলপ্রতাপে কান্যকুব্জ শাসন করিতেন। তাঁহাদের মধ্যে কমলায়ুধ-যশোবর্ম্মাই সর্ব্বপ্রধান ও প্রসিদ্ধ, তাঁহারই প্রভাবে আর্য্যাবর্ত্তে বৈদিকধর্ম্মের পুনরভ্যুদয় ঘটে। তৎপুত্র চক্রায়ুধ-আমরাজ জৈনগুরুপ্রভাবে বেদবিরুদ্ধ জৈনমতের অনুরাগী হইলেও তাঁহার আত্মীয় স্বজন এমন কি পুত্রপরিজন কমলায়ুধপ্রবর্ত্তিত বিশুদ্ধ হিন্দুধর্ম্মেই অনুরক্ত ছিলেন। এমন কি তৎপুত্র ইন্দ্রায়ুধও পিতার মতানুবর্ত্তী ছিলেন বলিয়া বোধ হয় না।

পূর্ব্বেই বলিয়াছি, বৈদিকমার্গের অভ্যুদয়ের সহিত তৎকালে কান্যকুব্জে ব্রাহ্মণ-প্রভাব প্রতিষ্ঠিত হইয়াছিল। সম্ভবতঃ বৈদিকধর্ম্মানুরক্ত আত্মীয়স্বজন ও ব্রাহ্মণগণের প্রভাবেই চক্রায়ুধ সিংহাসনচ্যুত ও তৎপুত্র ইন্দ্রায়ুধ রাজ্যলাভ করিয়াছিলেন। নচেৎ পাটলিপুত্রের সহিত যিনি সম্বন্ধসূত্রে আবদ্ধ,সেই কনোজের অধিপতি যে এক নবীন যুবকের হস্তে রাজ্য হারাইবেন, তাহা নিতান্ত বিচিত্র কথা! সম্ভবতঃ কনোজে যে একটী ধর্ম্মনৈতিক সংঘর্ষ উপস্থিত হইয়াছিল, তাহাতে সন্দেহ নাই। সেই সংঘর্ষের ফলে চক্রায়ুধ বিতাড়িত এবং তাঁহার পুত্রবধূ বৌদ্ধ-

* ডক্‌ এই ভোজকেই "চক্রায়ুধ" বলিয়া স্থির করিয়াছেন, কিন্তু তাহা নিতান্ত অসম্ভব।

রাজকুমারী নিজ শিশুপুত্র ভোজকে লইয়া পিত্রালয়ে (পাটলিপুত্র রাজধানীতে) পলাইয়া আসিতে বাধ্য হইয়াছিলেন। ইন্দ্রায়ুধ পিতৃমতানুবর্ত্তী হইতে পারেন নাই বলিয়াই জৈনগ্রন্থ-সমূহে ও বৌদ্ধতাম্রশাসনে পিতৃদ্বেষী বলিয়া নিন্দিত হইয়াছিলেন। বৌদ্ধাধিপ ধর্ম্মপাল কর্ত্তৃক চক্রায়ুধ আমরাজ পুনরায় সিংহাসনে অধিষ্ঠিত হইলেও তিনি যে নিরাপদে রাজ্যভোগ করিতে পারিয়াছিলেন বলিয়া বোধ হয় না। সনাতন বৈদিকমতানুরক্ত পুরজন ও কনোজীয় ব্রাহ্মণবর্গ যে বরাবর চক্রায়ুধের বিরোধী ছিলেন, তাহাতে সন্দেহ নাই। জৈনগ্রন্থ প্রভাবকচরিত হইতে আরও জানিতে পারি, তিনি ধর্ম্মদ্বেষী পুত্রের পুনঃ পুনঃ অসদাচরণে মর্ম্মাহত হইয়া মগধতীর্থ আশ্রয় করিয়াছিলেন। এখানেই তাঁহার আয়ুষ্কাল পূর্ণ হয়।

অধিক সম্ভব, সুযোগ ও সুবিধা মত ইন্দ্রায়ুধ পুনরায় পিতৃরাজ্য অধিকার করিয়াছিলেন এবং পুত্রের ব্যবহারে-মর্ম্মাহত চক্রায়ুধ সংসারসুখে জলাঞ্জলি দিয়া তীর্থবাসই শ্রেয়োজ্ঞান করিয়াছিলেন। ইন্দ্রায়ুধ পিতাকে কষ্ট দিয়া বেশী দিন যে সুখভোগ করিতে পারিয়াছিলেন বলিয়া বোধ হয় না। প্রভাবকচরিত, প্রবন্ধকোষ প্রভৃতি জৈনগ্রন্থ নির্দ্দেশ করিতেছে যে, ইন্দুক নিজ পুত্র ভোজদেবের হস্তেই নিহত হন।

শ্রীনগেন্দ্রনাথ বসু।

রামরাস।*

দেখ সখি আজু রঘুনাথ কিআরে শোভাবনি।
কনক সিংহাসনে বৈঠল রঘুবর বামে জনকনন্দিনী॥
দহিনে লছমন ছত্রধর্ তহিঁবরণ কাঁচসোণা জিনি।
ভরত শত্রুঘ্ন চাওর করতহি বেদ পড়ত সব মুনি॥
চৌদিকে প্রজাগণ হরি হরি বোলত জয় জয় জয় রঘুমণি।
অমরবধূগণ মঙ্গল গায়ত উল্লাসে জনকনন্দিনী॥
পবননন্দন হনূ আনন্দমগনমে নৃত্যতিহু পুনি পুনি।
যত পাত্রমিত্রগণ করতহি জোড় হাত দেবগণে জয় জয় ধ্বনি॥
রামদাসে ভণে ও রাঙ্গাচরণে না ঠেলিহ রঘুমণি॥ ১॥

---

* কৃত্তিবাসী রামায়ণের একখানি ২৭৫ বর্ষের হস্তলিখিত পুথি পাওয়া গিয়াছে, তাহার শেষাংশে "রামরাস" আছে। এই রামরাসের ভাষা হিন্দী ও বাঙ্গালা-মিশ্রিত। কৃত্তিবাসের এরূপ রচনা আর পাওয়া যায় নাই। ভাষাতত্ত্বানুরাগীর পক্ষে আদরণীয় হইতে পারে ভাবিয়া প্রকাশিত হইল।

সরযূতীরে অশোকবন, কেলি করত জানকীরমণ,
রঙ্গভয়নে মগন হোয় নৃত্যতি তহি জানকী।
চর চর রূপ অতি অনুপাম, মরকত তাহে শোভয়ে রাম,
জলদ কোরে স্থির বিজরি জৈছে লতা কনকি ॥
লেই জন্ত্র জুবতীবৃন্দ, তম্বুর কপিলাস ডম্ফ,
সরমঙ্গল বিনা সুজন্ত্র গায়ত গান ঝমকি।
জন্ত তন্ত তাল মান, অধরে না স্ফূরত গান,
মগনে রহত জুবতীবৃন্দ দুহুক নৃত্য নিরখি ॥
নাচিতে নাচিতে টুটল তাল, বোলত বাণী অতি রসাল,
গায়ত তহি আরে সখি বোলত তহি জানকী।
সুনিকেত বহু জুবতীপুর, গায়ত ধনি অতি মধুর,
গায়তে গায়তে প্রেমে গিরত জৈছে নদী সাঙর্নকি ॥
রঘুবর কি বয়ান হেরি, অঙ্গনেতে ফেরি ফেরি,
রাম মোহিতে রামমোহিনী চলত ঠমকি ঠমকি।
হানল তহি নয়নবাণ, রঙ্গ ভরমে সিহরল রাম,
প্রিয়া মোরে লেই কোরে বোলত চমকি চমকি ॥
রঘুবর কি করিকে কোর, আনন্দে অবধি নাহিক ওর,
জোর জোর প্রেম বাড়ত পড়ত চরকি চরকি।
কোকিলাগণ করত গান, আনন্দে নাচত জানকী রাম,
দুহুক বয়ান হেরি দুহু প্রেমে কহত কতকি ॥
সীতাকে কটিতে কিঙ্কিণীরাজ, রাতুল চরণে বঙ্করাজ,
ঝুনু রুণু ঝুনু স্বর বাজ গায়ত পঞ্চম তানকি।
ভণতহি কবি কীর্ত্তিবাস, জানকীরমণ-চরণে আশ,
রামরূপ দেখি জানকী মাতল জেন চাতকী ॥

নিরক্ষর কবি ও গ্রাম্যকবিতা।

(১)

বৈদিককাল হইতে পৌরাণিক যুগ পর্য্যন্ত আসিয়া পৌছিবার অগ্রেই বাল্মীকির (রত্নাকর) মুখ হইতে যে "কবিতা ব্রহ্ম" সৃষ্টির একটী প্রবাদ আছে উহা লিখিত অথবা পঠিত কবিতার জননী। মানব-সৃষ্টির প্রাক্‌কালেই প্রত্যেক মানবের মুখ হইতে কবিতার একটা অব্যক্ত ভাব—একটা বিশ্বপ্রতিচ্ছায়ার বাক্য—মানব-সমাজের একটা অসম্পূর্ণ আদর্শ উচ্ছ্বাস—ঐশী শক্তির একটা অজ্ঞাত-প্রীতি বিস্ফূরণ হয়। কিন্তু যে দিন—যে শুভলগ্নে—যে শুভ মুহূর্ত্তে সেই "মা নিষাদ" শ্লোক ভারতে আসিয়া মানবজাতির সভ্যতাসূচক বিশ্বপ্রতিবোধক ভাব প্রকাশ করিয়া মানবের শ্রুতিপথে প্রতিধ্বনিত হইতে লাগিল, সেই হইতে এই বর্ত্তমান সময় পর্য্যন্ত লিখিত এবং পঠিত কবিতা প্রত্যহ রচিত, গীত, প্রচারিত, ও শ্রুত হইতে লাগিল। মানবজাতির এই পূর্ণ উন্নতির দিনেও উক্তরূপ কবিতার অভাব নাই।

বঙ্গবাসী অতি সরল এবং কবিত্ব-প্রিয়জাতি। বাঙ্গালীর হৃদয়ে প্রেম, প্রীতি, দয়া মায়া, ভক্তি ও করুণা কবিতার এই স্থায়ী গুণগুলি অতি সহজে প্রবেশ লাভ করে, তাই মা প্রকৃতি বঙ্গে আবার আপন উদার অনন্ত মধুরভাণ্ডার সতত উন্মুক্ত রাখিয়াছেন। এই সুজলা সুফলা বঙ্গভূমি কবিত্বের যেন একটি মধুর মধুভাণ্ড। ইহার অধিবাসিগণ সকলেই অল্পবিস্তর কবিতা-প্রিয়। এইজন্য এই দেশবাসিগণ আদিম সময়ের কবিতাকেও অতি আদরের সহিত হৃদ্‌গত করিয়া রাখিয়াছেন।

মাতৃরূপিণী বঙ্গভাষা যখন কেবল তাহার সন্তানগণের আবশ্যকীয় কার্য্যে নিত্য ব্যবহৃত হইতেন, অথবা যখন তাহার সন্ততিবর্গের উদরপূরণ-প্রবৃত্তির মাত্র সাহায্য করিতেন, তখনকার কবিগণের কবিতাই বঙ্গের আদিম গ্রাম্যকবিতা। বিদ্যাপতি, চণ্ডীদাস, গোবিন্দদাস প্রভৃতি প্রাতঃস্মরণীয় বৈষ্ণবকবিগণ যে কবিতা, লিখিত ভাষায় প্রকাশ করিয়াছেন, উহা তৎ-কালিকের শিক্ষিতের ভাষা।

বঙ্গসাহিত্যের যুগপর্য্যায় ধরিলে এই বৈষ্ণব-কবিগণ সাধন পথে আপন আপন আধ্যাত্মিক উন্নতির উৎকর্ষতার মাত্রা বঙ্গভাষাকে বহু অলঙ্কার দিয়া মানবসমাজে অতি সৌন্দর্য্য-শালিনী মহিমান্বিত করিয়া তুলিয়া ছিলেন, বঙ্গসমাজের প্রায় পৌনে পনর আনা লোক যখন পূর্ণ নিরক্ষর, তখন এই সকল মহামহিমান্বিত বৈষ্ণব কবিগণ ভাষাজননীর অঙ্গপুষ্টি করিয়া সুপুত্ররূপে বাস করিয়াছেন। এই সকল শিক্ষিত কবিগণ ব্যতীত আর যে সকল নিরক্ষর কবিগণ কবিতা রচনা করিয়াছেন, উহা বঙ্গভাষার এই পূর্ণ উন্নতির দিনেও গীত, পঠিত ও শ্রুত হইয়া থাকে।

সমস্ত গ্রাম্যকবিতা সংগ্রহ করিয়া একত্র করা এক ব্যক্তির জীবনে কখনই সম্ভবপর

নহে। এই প্রসঙ্গে প্রথমতঃ "মেয়েলী ব্রতকথা" এবং সাধারণ নিরক্ষর স্ত্রীকবিগণের গ্রথিত কবিতাই উল্লেখ করিব।

মেয়েলী গীত শ্লোক ও ব্রতকথা।

নিরক্ষর কবির কবিতা এবং দেশপ্রচারিত মেয়েলী ব্রতকথার উল্লেখ করিতে হইলে অগ্রেই দেশীয় সাধারণ স্ত্রীসমাজের আভ্যন্তরিক প্রতিচ্ছায়া দৃষ্টি পথে উদ্ভাসিত হয়। বঙ্গের রমণীমণ্ডলী সৃষ্টিকাল হইতে এই বর্ত্তমান উন্নত শতাব্দীতে পর্য্যন্ত প্রায়ই এক ভাবে সংসারের অনন্তঘাত প্রতিঘাত সহ্য করিয়া আসিতেছেন। ইহারা বঙ্গগৃহের লক্ষ্মীস্বরূপিণী। ঘর পাতিয়া বসত করিতে এই সকল প্রকৃতিরূপিণী বঙ্গরমণীগণ গৃহকার্য্য লইয়া ব্যস্ততার সঙ্গে সঙ্গে সভ্য মানবের উচ্চ লক্ষ্য ধর্ম্মভাব বিস্মৃতা নহেন। গৃহস্থালীর ঘোর ঝঞ্চাটের মধ্যেও ইহারা কবিতার মধুর রমণীয় ভাবরাজ্যে প্রতিনিয়তই চলিতেছেন। বর্ত্তমান সময়ে স্ত্রীশিক্ষার বহুল প্রচলন হইলেও অদ্যাপিও বঙ্গসমাজে প্রায় শতকরা নিরনব্বইটি স্ত্রীলোকে শিক্ষা লাভ করেন নাই। এই সকল নিরক্ষরা স্ত্রীকবিগণের কবিত্বশক্তি প্রকৃতি হইতে জাতা। বঙ্গকামিনীর ব্রতকথা এবং অন্যবিধ কবিত্ব যাহা শ্রুত ও গীত হইয়া থাকে, তাহাই নিম্নে বিবৃত হইল।

"পুণ্যপুকুর" প্রভৃতি দেশপ্রচারিত ব্রতকথার পদযোজনা এবং কবিত্বমিশ্রিত কবিতা সম্পূর্ণ নিরক্ষর কবির রচনা। যশোহর জেলায় বালিকাগণের "মাঘমোড়ল" "হেচড়া পূজা" বা "হিচৈকুমর" প্রভৃতি ব্রতকথাগুলির ভাষা শুনিলে ও ভাবে মজিলে স্পষ্টই অনুমান হয় যে, উহা পূর্ণ নিরক্ষর কবির রচিত। পুণ্যপুকুর-ব্রতকথা কিরূপ কবিত্বে—কিরূপ ভাষায় রচিত, তাহা একবার আলোচনা করিলে বোধ হয় অতৃপ্তিকর হইবে না।

পুণ্যপুকুর পুষ্পমালা,
কে পোজেরে দুপুর বেলা।
আমি সতী লীলাবতী,
ভাইর বোন পুত্তুরবতী।
হবে পুত্তুর মরবে না,
পৃথিবীতে ধরবে না।
সা হবো শুয়ো হবো,
স্বামীর কোলে পুত্তুর দোবো।
ঠাকুর পূজ'বো বিল্বদলে,
মরবো গলা গঙ্গাজলে॥
ইত্যাদি ইত্যাদি

মরি মরি নিরক্ষর কবির কি মধুর উচ্ছ্বাস! কি আবেগপূর্ণ প্রার্থনা! কেমন সহজ সাধ্য: শব্দযোজনা!!! কি অপূর্ব্ব ঐকান্তিক নিষ্ঠা, কি মধুর অকৈতব ভক্তি! তাহার পর আবার শুনুন—

দোরপদীর মত হবো রাঁধুনি,
সীতার মত সতী রাণী।
দেওর হবেন লক্ষ্মণ ঠাকুর,
দশরথ হবেন শ্বশুর।
রামের মত ভাতার হবে,
যমকে ফাঁকি দেব তবে।
ইত্যাদি ইত্যাদি

ধন্য কবিতার উদ্দেশ্যকে, ধন্য সরল প্রাণের সরল প্রার্থনাকে, পুণ্যপুকুর ব্রতকথা এই ভাবে রচিত ও আদৃত। তাহার পর আবার শুনুন,মাঘমোড়লের ব্রতে কেমন মধুর সরল প্রকৃতি

বর্ণন কেমন অপূর্ব্ব, প্রাণ-মাতওয়ারা, চিত্তবিহ্বল আবেগপূর্ণ উচ্ছ্বাসময় স্বভাব চিত্র। মাঘের দারুণ হিমে যখন ছোট ছোট বালিকাগণ কচিৎ বালকগণও শীতে জড়সড় হইয়া কাঁপিতে কাঁপিতে মাঘমোড়লের গীত গাইতে থাকে; তখন সেই শীতকম্পিত সমবেত শিশুকণ্ঠ নিরক্ষর-কবির অপূর্ব্ব কবিত্বকে সজীবভাবে জাগাইয়া যে কি স্বর্গীয় কবিত্বের অমৃতধারা সিঞ্চন করিতে থাকে, যিনি তাহা স্বকর্ণে না শুনিয়াছেন, না দেখিয়াছেন, তিনি তাহার মধুরতা উপলব্ধি করিতে পারিবেন না। বালিকারা গাইতেছে—

"এবার এলো মাঘমাস তাতে বড় শুয়ো,
ঘরের কোণে বসে দেখি আকাশের গায় কুয়ো।
আবার এলো মাঘমাস তাতে বড় শীত,
সূয্যিমামা পূবের চালে উঠ্‌লে গাবো গীত।
আঁজলা-ভরা রাঙ্গাজবা সাদা ভাঁটির ফুল,
শিশির ভেজা দূব্বো গুলো মুক্তোর সমতুল।
ভাঙ্গা কুলোর বাসি ছাই নিয়ে বসে আছি,
ঝোপের আড়ে ডাক্‌লে পাখী রোদ্ পুইয়ে বাঁচি।
আয় লো দিদি দেখ্‌বি যদি উষো রাণীর বিয়ে,
ফুলের মালা গলায় পরে ঘোমটা মাথায় দিয়ে।
আমরা তো বস্ত করি পূব তুয়োরি বসে আতুল গায়,
দোহাই তোমার সূয্যিঠাকুর রাঙ্গা বর দিও আমায়।
শীতের দাপে পরাণ কাঁপে নড়্‌ছে মাথার চুল,
মাবাপের গোলা ভরবে, ধানের ফুটবে হুল।
আমের ডালে মুকুল দোলে থোপা কচিপাতা,
বরের গায়ে হলুদ দিয়ে খাবো সতীনের মাথা।
শীতের ভয়ে জড়সড় আমরা দুটি বোনে,
দাদার কাছে বসে বউ হাস্‌ছে ঘরের কোণে।
দেখে যা লো দেখে যা লো ওলো পড়শীর ঝি,
কুয়োর মাঝে ফুটলে ছবি তোরা করবি কি।" ইত্যাদি

এই মাঘমোড়লের ব্রতকে বঙ্গের জেলা-বিশেষে বিভিন্ন নামে অভিহিত করা হয়। নদীয়া জেলার স্থান বিশেষে এই ব্রত "তুঁতুশীলা"* নামে অভিহিত হইয়া থাকে।

* তুঁষতুশলীর ব্রত—এই অঞ্চলে পৌষ মাসের শেষ দিনে (মকরসংক্রান্তিতে) কলার পেটোর নৌকা বা সোলার নৌকার গাঁদা ফুলের মালা ও দীপ জ্বালিয়া নদীতে বা পুকুরে ভাসাইয়া এই ব্রত করে।

"তুর্‌শীলা মাঘে ছাতি, ভাই বাপের ধন জাতাজাতি, স্বামীর ধন নিজপতি—
করবো তুশুল্ মরবো সাগরে। জন্মজন্ম জন্মি যেন ব্রাহ্মণের ঘরে।" ইত্যাদি

ইহা ছাড়া এই গীতটীতে আরো পদবিন্যাস আছে। তাহার অধিকাংশই ভাই, পিতা এবং স্বামি-পুত্রের মঙ্গলময় প্রার্থনায় পরিপূর্ণ।

এইরূপ ভাবের অনেকগুলি গীত মাঘমোড়লের ব্রতকথায় বালিকারা গাইয়া থাকে। সঙ্গীতগুলির সমস্তই আবেগ, উচ্ছ্বাস, প্রার্থনা, দৈন্য এবং আৰ্ত্তি বা ব্যাকুলতার কল্পনা-কৌশলে স্বভাবচিত্রসহ ভগবদ্‌ভক্তিতে পূর্ণ।

সমস্যাপূরণ ও স্ত্রীগীত।

বঙ্গীয় পাঠক বাল্যে দিদিমার নিকট, কিশোরে সমবয়স্কের নিকট, যৌবনে রসিকার নিকট, পরিণত বয়সে বঙ্গসাহিত্যের নিকট দুই চারিটি সমস্যা বা হিঁয়ালি অভ্যাস করেন। সুতরাং সেই সকল পরিজ্ঞাত হিঁয়ালির মধ্যে কবিত্বের কত দূর আবরণ আছে, তাহার বিচারভার পাঠকের জ্ঞানের বহির্ভূত নয় বোধ হয়। কেবল মাত্র কর্ত্তব্যের অনুরোধে চারিটি হিঁয়ালি উদ্ধৃত করিয়া সমস্যা-কবিতার মাধুর্য্য প্রদর্শন করা হইল। যথা—

১। তিন আখুরে নাম ইহা সর্ব্ব ঘরে আছে,
প্রথম আখর ছেড়ে দিলে গোয়ালায় নিয়ে যাচে।
মাঝের অক্ষর ছেড়ে দিলে হরিগুণ গায়,
শেষ আখর ছেড়ে দিলে লোকে ভয় পায়।
কও গো সজনি সেই কোন্ বস্তু হয়,
ভাতারে করিলে রাগ যা করে আশ্রয়।*

২। কাজলের ফেলে জল যে আখর রয়,
পাঁঠার পা'ছেড়ে মিল করিয়ে তায়।
লবঙ্গের বঙ্গ রেখে পার যা আনিতে,
পান্তাভাতে থাবো তাই নুন্ দিয়ে তাতে। †

৩। সতত অন্দরে থাকে না হয় রমণী,
যুবায় না চাহে কেহ বুড়ায় আদরিণী।
কহে কবি রঙ্গিণী পিল্লিকার ছন্দ,
মূর্খেতে বুঝিতে নারে পণ্ডিতে লাগে ধন্দ। ‡

এই সকল প্রহেলিকা বা সমস্যা সাধারণতঃ স্ত্রীকবিগণের স্ত্রীবৎ-রসিক পুরুষগণের দ্বারা রচিত। কিন্তু ইহার আদর্শ সংস্কৃত কবিগণের নিকট হইতে গৃহীত। এই প্রকারে এক সময় হিঁয়ালিদ্বারা বঙ্গসাহিত্যের অনেক পুষ্টিসাধিত হইয়াছিল। এই সকল সমস্যা প্রায়ই কামিনীসমাজে আদৃত।

---

* বিছানা। † কাঁচাল। ‡ পাণ।

স্ত্রী-কবিগণের একটী বিবাহবিষয়ক গীতের গুটিদুই পদ এই, যথা—

"বরের মাসি বরের পিসি বসে ভাব্‌চ কি
তোমাদের পিঁজ্‌রের পাখী আমরা এনেছি।
কোন্‌ দেশেতে ছিল পাখী কোন্‌ দেশেতে এল,
ঐ যে, বামুনবাড়ীর পাকা জামে ঠোকর মেরে গেল।
কোথা হ'তে এল টিয়ে মাথায় সোপার চুড়ো,
ওলো, দুধে আল্‌তায় রাঙ্গা ক'নের বর হলো বুড়ো।
পানা পুকুর হেচড়া দামে ছিল কচি কমলকলি
ঐ যে, মুচ্‌ড়ে তুলে নিয়ে গেল বনের বনমালী।" (বরের মাসি) ইত্যাদি।

আহা কি মধুর কবিত্ব! কি অপূর্ব্ব দ্ব্যর্থঘটিত ভাবুকতা! যদিও এই সঙ্গীতটির মধ্যে কতকটা অশ্লীলতা প্রচ্ছন্নভাবে স্ফুরিত হইতেছে, তথাপি ইহার গভীর ভাবসাগরে কবিত্ব-মাধুরী কেমন তরঙ্গের পর তরঙ্গ তুলিয়া উথলিয়া পড়িতেছে।

আর একটি শ্লোকের দুইটি চরণমাত্র আমার মনে আসিতেছে। পূর্ণভাবে শ্লোকটি শিখিবার আবশ্যকও হয় নাই, অথবা সুবিধাও ঘটে নাই। যথা—

"উঠ্‌ছে কমল দপ ক'রে পাক্‌লে হবে লাল
হাত দিও না খপ করে, থাবে চির কাল।" ইত্যাদি

অতঃপর আর একটি স্ত্রী-গীত এবং শ্লোক উদ্ধৃত করিয়া নিরক্ষর স্ত্রী-কবিগণের কবিত্ব আলোচনায় পাঠকের কৌতূহল পূর্ণ করিব। যথা—

"অত বড় হচ্ছো গৌরি হাত কেনে তোর খালি,
আমার সঙ্গে কও না কথা মনের কথা খুলি।
আমি দিব শাঁখা সাড়ী সেই কথাটি কই,
ভাঙ্গড়ের সঙ্গে পিরিত কর্‌লো গৌরি সই।
কুঙ্কুবরণ রংটি তোমার মেঘবরণ চুল
নাকের ডগায় নাইকো নলক কাণে নাইকো দুল।
শিবের শিবানী তুমি—লোকের মহাভুল॥" ইত্যাদি

আবার রাজধানী-বিভাগের প্রায় সমস্ত জেলায় যে মেয়েলি বিবাহ-গীতটি গীত হইয়া থাকে, উহাও এই স্থানে উদ্ধৃত হইল যথা—

"অতি সুন্দর রামেরে কি দিয়ে সাজাব,
ঐ যে মালিবাড়ীর মুকুট এনে রামের মাথায় দেবো,
পুড়ো বাড়ীর হলুদ কিনে রামেরে মাখাবো।
ও রাম ঐখানে দাঁড়াও দেখি
তোমার আর কি সাজ বাকী।

এই সকল নূতন সাজে সেজে তুমি যাবে শ্বশুর-বাড়ী।
হাস্‌তে হাস্‌তে কিনে আন্‌বে পায়ের নূতন বেড়ি।" ইত্যাদি

আবার একদিন শ্রাবণ মাসে অশ্বারোহণে বিপন্ন অবস্থায় একটি বটবৃক্ষতলে নীলের জমিতে কোন একটি অসভ্য জাতির দশমবর্ষীয়া কন্যার নিকট নিম্নের এই শ্লোকটী শুনিয়াছিলাম,—

"দিয়ে আমার মাথায় হাত সত্য কর প্রাণনাথ।
বাড়ী হতে যেতে না করিব মানা যাবার বেলায় রেখে যেও গামছাখানা।
তোমার কথা পল্লে মনে, চাব তখন গামছার পানে।"

বালিকা আর বলিল না—আমিও আর জানি না। এই কবিতার ভাবাবেশ মনে হইলে, বুঝিলাম যে—এই বয়সেই বালিকাগণ বর্ষিয়সীগণের নিকট হইতে উক্ত প্রকার শ্লোক শিক্ষা করিতে অভ্যস্তা হয়। আবার সময় সময় নিজের বয়স এবং ক্ষমতানুযায়ী দুই একটী পদ যোগ করিয়াও দেয়।

বিবাহ-বিষয়ক গীতের মধ্যে যে গীতটি প্রায় বঙ্গীয় পাঠক মাত্রেই শুনিয়াছেন—তাহার অপূর্ব্ব কল্পনা-প্রিয়তায় বিমুগ্ধ হইয়া এই স্থানে উহা উদ্ধৃত করা হইল, যথা—

"ও প্রাণ মকর গঙ্গাজল—
কা'ল হবে কামিনীর বিয়ে সইতে যাবো জল।
তুমি হাসির হাসি মহাহাসি—সতীনী কোন্দল॥
তুমি আমার ঘরকান্না উনকুটি চৌষট্টি
ধানভান্‌তে ঢেঁকিরাম মাছকুট্‌তে বঁটি।
বেড়িমুখো হাড়ি তুমি—কুলো খোন্তা হাতা
ঝালবাটার শিলনোড়া মটর-পেশার জাঁতা॥
কাঁচাচুলের খোপাদাড়ি পাকধানে মই
আষাঢ়ে বাদলার তুমি মুড়িমুড়কী খই।
ঘরপাতা দই তুমি দুধের ক্ষীর চাঁচি
তোমার বিরহে প্রাণ বল কিসে বাঁচি।
ব্যঞ্জনের লবণ তুমি পুঠীমাছের ঝোল
মোচার ঘণ্টে ফুলবড়ি কচি আমে শোল।
গোয়াল ঘরে তুমি আমার কালা কামধেনু
মজাতে অবলার প্রাণ নন্দের বেটা কানু।
ও প্রাণ মকর গঙ্গাজল—
ঝালাপালা হয়ে ছোটে গায়ে প্রেমানল।
শীতের তুমি ছিটের লেপ গ্রীষ্মের জলের জালা
বসন্তের মধুর বায়ু বরষার ডোমানালা।

যৌবন জোয়ার জলে তুমি রূপের ঢেউ
মাঘমাসে বাঘের পাছে লাগ তুমি ফেউ।
কেমন করে বলবো বঁধু তুমি আমায় কি
পান্তা ভাতে বেগুণ পোড়া তপ্তভাতে ঘি॥
মলের তুমি রুণু ঝুনু চিকের তুমি খামি
আমার মত উচ্‌কো মেয়ের প্রাণ-জুড়ান স্বামী।
তোমার তরে নিমিষেতে নয়নজলে ভাসি
অরুচির হয় রুচি দেখ্‌লে তোবড়া দেঁতোর হাসি॥
তোমার সোণার রঙ্গে জোড়া ভুরু কালা ঝুলপি চুল,
ঠাসা নাকে খাসা নথ দোলে সোণার দুল।　ইত্যাদি

এই গীতটির শব্দবিন্যাস এবং রচনাকৌশল অনুভব করিলে মনে সত্য সত্যই উদয় হয় যে, যে সকল রমণীগণ এইরূপ গীত প্রস্তুত করিতেন, অথবা গান করিতেন, তাঁহারা কখনও বর্ত্তমান কালের কামিনীগণের ন্যায় কেবলমাত্র কলম আর কার্পেট ধরিয়া গৃহ-প্রাঙ্গণ পরিশোভিত করিতেন না। বঙ্গসমাজের আভ্যন্তরিক পারিবারিককার্য্য এবং অবলাগণের স্বাভাবিক শক্তির উপর নির্ভর করিয়া এই সকল নিরক্ষরা নারীগণ হৃদয়ে কবিত্বময়ী আবেগতা আর ললিত করে হাতা, বেড়ি, বঁটি, শীল, নোড়া সম্মার্জ্জনী লইয়া গৃহকার্য্যের সঙ্গে পবিত্র দাম্পত্যপ্রীতির মূলে কবিতা-রচনাকৌশল প্রদর্শন করিতেন।

স্ত্রী কবিগণের আর একটি বিবাহ-সঙ্গীতের সামান্যাংশ মাত্র উদ্ধার করিয়া আমরা পাঠককে তাৎকালিক বঙ্গসমাজের বিবাহবিধি আর ধর্ম্মবিশ্বাসের একটী জলন্ত চিত্র উপহার দিতেছি, যথা—

"ওঠ ওঠ গঙ্গাদেবি ঝিকিমিকি দিয়ে।　দধিমঙ্গল করে আমার গৌরীর দিব বিয়ে।
তোমারে বরিতে এলেম অষ্ট এয়ো নিয়ে। তোমার জলে চান করিয়ে ঠাণ্ডা শীতল হয়ে।
তোমার জলে শঙ্খসাড়ী আদর করে ধুয়ে। আমার গৌরী চলে যাবে ঘরকন্না নিয়ে॥"

আহা এই সঙ্গীতটির ভাবে বঙ্গসমাজের তৎসাময়িক পারিবারিক চিত্র যেন আমাদের নয়ন সমক্ষে কেহ আনিয়া উপস্থিত করিয়া দিতেছে।

কোন কোন সময় প্রবীণা স্ত্রীকবির দল শিশু সন্তানকে ঘুম পাড়াইবার কালে অতি সুললিত স্বরে—অতি ললিত শ্লোক ছটায় "ঘুমের গীত" বলিয়া থাকেন।

১। ঘুম পড়ানে মাসি পিসি ঘুম দিয়ে যা,　বাটা ভরে দিব পাণ মুখ ভরে খা।
২। আই আই আই চাঁদ আই রে,　জাদুর কপালে মোর চিক্ দিয়ে যা রে।
৩। "মাসি পিসি বনকাপাসি বনের ভিতর টিয়ে।
মাসি গেছে বৃন্দাবনে দেখে আসি গিয়ে।
কিসের মাসি কিসের পিসি কিসের বৃন্দাবন
জনম ভরে জেনো জাদু মা বড় ধন॥

মাকে দিও সাড়ী শাঁখা বাপকে নীলে ঘোড়া
ভাইকে দিও শণকাপাসি—বোনের বেলায় ঘড়া ॥
দোল দোল দোল রাধাকৃষ্ণ দোল
মায়ের কোলে কচি ছেলে—বোল হরি বোল।
ময়ূরপাখী পেখম ধরে বসে কদম ডালে
খোকা আমার শুয়ে আছে ছাপর খাটের তলে ॥
দোল দোল দোল বোল হরি বোল
খোকার মা বাড়ী নেই জল আন্‌তে গেছে
খোকার দিদি ধিয়ে—ধিয়ে নাচে আলুর গাছে ॥"

৪। "এউ—এউ—তারা বাড়ি নেই কেউ, চৌকিদারে টের পেয়ে বউ কেড়ে নেছে।
তারা বউ আন্‌তে গেছে।
ও খোকা তুই বাড়ী আয় শুয়ে ঘুম যা, এনে দেব রাঙ্গা বউ দেখ্‌বে তোর মা।"

৫। "খোকন খোকন পাখীটি কোন বিলে সে চরে।
খোকন যদি ডাকে তারে উড়ে এসে পড়ে ॥
খোকন বড় দুষ্ট ছেলে নাচে আলুর কাছে।
যে ছেলেটি ঘুমায় না চকটেটা তার চক ধরে নাচে ॥"

চুঙ্গই পূজা, ষষ্ঠী মাথাল, নোলাই ঝোলাই, হিচেকুমর, মাঘমোড়ল, সেজুতি, পুণ্যপুকুর, সুবচনী, আকছটি, কুলইচণ্ডী, এয়ো সংক্রান্তি, অশ্বথ নারায়ণ, হরিচরণপূজা, মাঙ্গন, জাগরণ, হেচড়া পূজা প্রভৃতি ব্রতকথা স্ত্রী-কবিগণের মধ্যে অধিকাংশই রচিত।

পুণ্যভূমি ভারতে যখন পৌরাণিক যুগ শেষ হইয়া প্রচণ্ড বেগে তান্ত্রিক যুগ উপস্থিত হইল,

নলেগীত, ভাটেলগীত, বা বারাসে গীত।

বৈষ্ণব-প্রথায় আর তান্ত্রিক-প্রথায় যখন অভিনব মিলনকার্য্য আরম্ভ হইল, তখন বঙ্গদেশে নিরক্ষর সমাজে একটি অতি শক্তিশালী মাধুর্য্যপূর্ণ কবিত্ব আসিয়া দেশের সর্ব্বসাধারণ অধিবাসীকে সাদরে ডাকিয়া মুগ্ধ করিতে লাগিল। শিক্ষিতের লিখিত "শ্যামাসঙ্গীত" ও "হরিসঙ্কীর্ত্তন" ছাড়াইয়া অশিক্ষিত নিরক্ষর কবির হৃদয়গীতি দেশময় প্রচারিত হইল। এই সঙ্গীতের এমনি সরল আকর্ষণ যে, শিক্ষিত বৈষ্ণব কবিগণ আর মাতৃভক্ত তান্ত্রিকগণ তাঁহাদের গভীর অধ্যাত্মবিদ্যার অনুশীলনে বিষয়বিষের যন্ত্রণানিবারক কবিত্ব-শক্তি ফুটাইয়া উহার প্রতিকূলে কোনরূপ দৃঢ় বাঁধ দিতে পারিলেন না। এই সাধারণ ভাবের প্রচলিত সঙ্গীতকে লোকে "নলেগীত" কহে। আবার ঠিক্ এই সময় এই নিরক্ষর সমাজে অভক্ত নিরক্ষর কবিগণ আর একরূপ সঙ্গীত দেশময় প্রচার করিল, ইহাকে "ভাটেলগীত"* অথবা "বারাসেগীত" কহে।

* ভাটেল—ভাটিয়ারী বা ভাটিয়াল নামে এক রাগিণী আছে, তাহার সহিত এই স্থানের কোন সম্পর্ক নাই কি ?

"নলে গীত" আর "বারাসে গীতে" আকাশ পাতাল প্রভেদ। যাহারা নলে-গীত রচয়িতা তাহারা ঈশ্বরভক্ত সংসারত্যাগী এক প্রকার নিষ্কাম সাধু। আর বারাসে গীত-রচয়িতারা সংসারের তাপদুঃখমাখা বিষয়বিষে জর্জ্জরিত রসিক পুরুষ। অথচ ইহারা শ্রেষ্ঠ বৈষ্ণবের উচ্চ লক্ষ্য রাসরসিকশেখর শ্রীশ্রীকৃষ্ণের রসানুভাবক কবি বিশেষের ন্যায় নবরসে ভরপূর। বারাসে গীতে প্রেম বিরহ আর নরনারীর চরিত্র চিত্রিত আছে। ধর্ম্মভাব তাহার মাঝে ভস্মাচ্ছাদিত বহ্নির ন্যায় প্রচ্ছন্ন। নলেগীতে পূর্ণ ধর্ম্মভাব নীরসভাবে জাগ্রত। যশোহর, খুলনা প্রভৃতি জেলায় নলেগীত অতি প্রসিদ্ধি লাভ করিয়াছিল। বরিশাল, ফরিদপুর, ঢাকা প্রভৃতি জেলায় ভাটেলগীত বা বারাসেগীত সর্ব্বজনসমাদৃত হইয়াছিল। বঙ্গের অন্যান্য জেলার এই দুই সঙ্গীত-কবিত্ব ততদূর পরিস্ফুট নহে। নদীমাতৃক জেলার দাড়ি মাঝিগণ কর্তৃকই ভাটেল গীত প্রচারিত হয়। এই সূত্রে চব্বিশ পরগণা ও বারাসত অঞ্চলেও কতক কতক এই সঙ্গীত প্রচলিত আছে। সুন্দর-বনের ব্যবসায়ী পুরুষগণ কর্তৃক নলে-গীত প্রচারিত, সুতরাং বঙ্গের পশ্চিমোত্তর ভাগে তত প্রচলিত নহে।

নলে-গীত-রচয়িতারা প্রায়ই বর্ণজ্ঞানহীন। এই শ্রেণীস্থ ফকীরগণকে লোকে অধিকাংশ-স্থলে "বাওয়ালি ফকির" কহে। ইহারা প্রায়ই নিম্নশ্রেণীর অশিক্ষিত নিরক্ষর মুসলমান অথবা নিম্নবর্ণের হিন্দু। তবে স্থানে স্থানে দুই একটী মধ্যবিত্ত হিন্দুও আছে। তন্মধ্যে যশোর জেলার ফুলতলা ষ্টেসনের নিকটবর্ত্তী পাইকপাড়ার বীরেশ্বর দত্ত ওরফে "হরিঠাকুর" উল্লেখযোগ্য। সাধারণতঃ বাওয়ালিগণই নলে-গীতের রচয়িতা।

'বাওয়ালি' অর্থে সুন্দরবনের বড় কাট কাটিবার অগ্রবর্ত্তী নাবিককে বুঝিতে হয়। এই সকল বাওয়ালিগণের মাথায় লম্বা লম্বা চুল, গলায় পুথি বা রুদ্রাক্ষের মালা, হাতে দীর্ঘ একটি তৈলাক্ত নল, পায়ে খড়ম, পরিধানে মোটা তৈলাক্ত বস্ত্র, অথবা গৈরিকবসন; মুখে নলেগীত, অন্তরে নিঃস্বার্থ পারত্রিকভাব—কার্য্যে ঘোর নির্লিপ্ততা। আহারে বিহারে সংযত, সাধারণ কথায় মহাবক্তা, সততই উর্দ্ধনেত্র। কেহ তামাকুর ধূমপানে রত, কেহ গঞ্জিকায় আসক্ত। কিন্তু অনেক ফকীর আবার পূর্ণ নিষ্কাম, মাদকত্যাগী এবং বাক্‌সংযত পুরুষ।

বাওয়াল বা বনজাত ব্যবসায়ে এক সময় যশোহর, খুলনা, ২৪ পরগণার অনেক নিম্নশ্রেণীর হিন্দু মুসলমান প্রভূত অর্থ উপার্জ্জন করিয়া গিয়াছে।

নলেগীত-রচয়িতা ফকীর কবিগণের গীতগুলি সাধকসঙ্গীত। তাহাতে ভাবের আবেগতা, প্রার্থনার জ্বলন্ত উচ্ছ্বাস, অন্তরের ব্যাকুলতা, সর্ব্বধর্ম্মের একীকরণতা এবং বিশ্বজনীন মহা প্রেমিকতা পরিস্ফুট। এই সকল কবিত্বে কঠোরতা আছে বটে, কিন্তু সর্ব্বশ্রেষ্ঠ গুণ সমদর্শিতা। সকল শ্রেণীর সাধকই এই নলেগীতের মতে চলিতে পারেন। এই সকল গীত-রচয়িতা নিরক্ষর ফকীর কবিগণ এক নিরাকার অদ্বিতীয় অখণ্ড ব্রহ্মের ছায়া লইয়া সাকার নিরাকারভেদে হিন্দু

বারাসিয়া—ধর্ম্মের গান, চণ্ডীর গান প্রভৃতি পালা-বাঁধা গায়কদলকে 'বয়াতি' বা 'বারাসি' বলে, তাহার সহিত ইহার সম্পর্ক কিছু আছে কি?

মুসলমানকে একপ্রাণতা শিখাইতে বড় সিদ্ধ। সঙ্গীতগুলির ভাব সংগ্রহ করিলে স্পষ্টই অনুমান হয় যে, যে সময় এই দেশে সাধারণ ধর্ম্মভাবগুলি মুহ্যমান হইয়া ব্যভিচার, পরপীড়ন, রমণীনিগ্রহ ও ধর্ম্মের পবিত্র নামে অধর্ম্মের প্রশ্রয় বৃদ্ধি পাইয়াছিল, তখন নলেগীত দ্বারাও একপ্রকার নিষ্কামধর্ম্মের মধুর ভাবটী মৃতবৎ ক্ষীণভাবে পড়িয়াছিল।

যে সকল ফকীর-কবি দেশে নাম এবং শিষ্যসংখ্যা বিস্তার করিয়াছেন, তাহার মধ্যে কুষ্টিয়ার "লালন ফকীর" সর্ব্বশ্রেষ্ঠ। তাহার সঙ্গীতগুলি প্রায়ই বর্ত্তমান ফকীরবেশী ব্যক্তি-বর্গের দ্বারা গীত হয়। এই গীতের অধিকাংশই সাধন-সঙ্গীত। ভাবের আবেগতা এবং গভীরতায় লালনের গীতগুলি অতি মধুর। আবশ্যক বোধে দুইটী গীত উদ্ধৃত হইল—

"আমি একদিনও দেখ্‌লাম তারে
আমার আড়শীনগর এক পড়সী বসত করে।
গেরাম বেড়ে অগাধ পাণি তার নাই কিনারা নাই তরণী পারে
মনে বাঞ্ছা করি দেখবো তারে আমি কেমনে সেথা যাই রে।
আমি বলবো কি পড়সীর কথা তার হস্ত পদ কন্দ মাথা নাই রে,
সে ক্ষণেক থাকে শূন্যের পরে ক্ষণেক ভাসে নীরে,
সে পড়সী যদি আমায় ছুঁতো তবে যম যাতনা সকল যেতো দূরে,—
সে আর লালন একখানে রয় থাকে লক্ষ যোজন ফাফরে।
আমার এ ঘর খানায় কে বিরাজ করে,—
আমি জনম ভরে তাঁরে একদিন দেখ্‌লেম নারে।
নড়ে চড়ে ঈশান কোণে,* দেখ্‌তে পাইনে এ নয়নে,
হাতের কাছে যার, ভবের হাট বাজার,
আমি ধর্‌তে গেলে হাতে পাইনে তারে।
সবে বলে "প্রাণ পাখী"— শুনে চুপে চাপে থাকি.
জল কি হুতাশন, মাটি কি পবন—আমায় কেউ বলেনা একটা নির্ণয় ক'রে।
আপন ঘরের খবর হয় না, ইচ্ছা করি পরকে চেনা—
লালন বলে পর বল্‌তে পরমেশ্বর, সে কেমন রূপ আমি কিরূপ রে॥"

এই সকল ফীকর-কবিগণের মধ্যে বর্ত্তমান খুলনা জেলার ডুমরিয়ার কামাই ফকীর, ফরিদপুর জেলায় খোলাবড়িয়ার নিমুফকীর, যশোহর জেলার মধুমতী-তীরবর্ত্তী পাঁচুড়িয়ার লোকনাথ ফকীর, বরিশালের নাজেরপুর গ্রামের রোসন ফকীর, ফরিদপুর কুসুমদির ফকীর সাহেব ও কুষ্টিয়ার লালন ফকীর লব্ধপ্রতিষ্ঠ কবি। ইহাছাড়া নড়াইল উপবিভাগের চাচড়ির ঈশান ফকীর, সরমপুরের দানেশ ফকীরও কবিপদ পাইতে পারে। আমার বাল্যশ্রুত কয়েকটি গীতের অপূর্ণ অংশ এই—

* হৃৎপিণ্ড।

১। "গুম্বজে ঠেকেছে মাথা সোণার মুকুট পরা
* * * আগুন-পানির গড়া মানুষ * * *
কোমরে ছুনে আটা—ওরে মানুষ খুন করা।
আচ্ছা চেহারা ধর্‌লি তুই না বেটি কি বেটা
মস্তের মা আস্‌মানের বাপ * * * চেনা যায় না তোরে এই বড় ল্যাটা।
হাওয়ার মাঝে পরাণ রেখে—চড়ে হাওয়ার পীঠে
আস্‌মানজমি পাতায় ফুলে বেড়াস্ হাওয়ায় জলে উঠে॥ ইত্যাদি
২। কি আর দেখিস্ কালা হাত্‌ড়ে তোর আঁধার ঘরে,
মনের কালি মুছে আলো জাল্লে পাবি তা যে তারে।
সে যে আলোর ঘরে আলোর ছবি, আলো বিনা তারে না লবি।
সে আলোর তেজে তোর কাণা চোক ফুটে যদি—
তাই ভেবে আলোক নামে ডাকে ঈশান নিরবধি।"

শুনা যায়, সুন্দরবনে নাকি দুইটী বয়ঃপ্রাপ্ত উলঙ্গ নির্ব্বাক্ পুরুষ আছেন। উহাঁরাই নাকি সুন্দরবনের "কানাই বলাই" নামক বাওয়ালি-গুরু। এই দুই পুরুষের একটী ভক্ত অর্দ্ধ-বাওয়ালী আমার প্রতিবাসী। তিনি এই গীতটী উপহার দিয়াছিলেন,—

১। "কি জানি কি কিসের জোরে প্রাণ করে আন্‌চান
ও তার, জগৎ-জোড়া নামের গুণে বাস করে নয় দ্বারের মাঝের থান।
তার হয় না কিছু জানা জ্ঞানে ভেতর বাহির আদি স্থান—
সে যে সকলের সকল কাজে করে রে আপনার টান।
আমার আর কেহ নাই এই ঘরেতে মাঝে দিছি তারে স্থান।
তাইতে ফকীর ঈশান কয় আমি করি সদা তারি গান॥
২। আয় রে বাদাড় ডাকে সাঁই হাওয়ায় দিয়ে পাল।
বাঘের পাছে ফেউ লেগেছে জোয়ারে ছোটে খাল॥
ডাকে ডাকে বুন পাখী উড়ে ফড়িঙ্গীর পাল।
কেওড়া গাছে বান্দর নাচে উব্‌ধো জটো তাল॥
লোণা জলে সোণা জলে ঢেউ লেগেছে গায়।
কানাই বলাই ডাকে তোদের আয় রে ব্যাল্লিক আয়॥
গাজির দরগায় কালীর ঘরে কচি লতার পর।
আমরা দু'ভাই আছি বসে চিম্‌টী ধরে তাঁর॥
দ্যাখ রে তোরা কত ফুলে কত ওড়ে দল * * *
বাঘের পাছে ফেউ লেগেছে জোয়ারে ছোটে খাল॥" ইত্যাদি।

এই গীতটীর মধ্যে গভীর ভাবের গাম্ভীর্য্যময় নলেগীতের মধুরতা এবং উদ্দেশ্য নাই অথচ

সরল শব্দবিন্যাসে কবিত্বের ছায়ামাখা অসম্বদ্ধ ঐশ্বরিকতত্ত্ব গ্রথিত আছে ; এইরূপ কবিত্বে নিরক্ষর খাওয়ালি কবিগণ কবি।

তাহার পর বারাসে অথবা ভাটেল গীত আলোচনা করিতে যাইয়া আমরা দেখিতে পাই, যে সময়ে বর্ত্তমান সভ্যতা-বিমণ্ডিত শিক্ষা-সূর্য্য ভারত-আকাশে প্রথম উদয়ের অরুণ কিরণে অশিক্ষারূপী ঘোর অন্ধকার বিনাশ করিতে কুসুম-কুন্তলা হাস্যময়ী উষার আরক্তিম ছটার সঙ্গে পূর্ব্বাকাশে পূর্ব্বাভাস দেখাইতেছিলেন, সেই সময়ের খৃষ্টধর্ম্মপ্রচারক মিশনারিগণের যথেচ্ছা-ভ্রমণকালীন শ্রুত অনেক নিরক্ষর কবির কবিত্ব দেশময় ছড়াইয়া পড়িয়াছিল। দুই একটী দৃষ্টান্ত এই—

১। "যা রে কোকিলা তুই আমার পতি গেছে যে দেশে,
অমন করে জ্বালাতন করিস্‌নে আর নিত্তি এসে।
শুনে তোর কুহুস্বর, উস্কে উঠে পরাণ আমার,
প্রাণপতি মোর দেশান্তর ছাড়্‌গে তথায় তোর কুহুস্বর,
কাচা বুকে লাগলে আঘাত পাইনে কোন দিশে॥ ইত্যাদি

২। তামাক খেয়ে গেলে না রে কবিরাজ কত দুঃখ মনে যে বল,
ঐ যে চান্দের পাশে তারা হাসে তেতুলপাত শুকাল।
মরাগাঙ্গে কুমীর ভাসে শুকায় সুন্দীর ফুল,
এই ভরাকালে হলেম্ রাঁড়ী, কবিরাজ যৌবনে ফুটল ফুল॥ ইত্যাদি

৩। দরদি নিগম কথা শুন্‌লিনে হেলায়,
আমি অচল পয়সা হলাম ভবের বাজারে,
তোরা বুঝ্‌লিনে দেখ্ রে বেলা যায়॥ ইত্যাদি

৪। এ ফুল পালি কনে লো ছোটবউ সাঁজের বেলায়,
জল আনিতে গিয়াছিলাম সানবান্ধা ঘাটে,
ভেসে যেতে চাঁপা ফুল তুলে নিলাম হাতে। ইত্যাদি

৫। ও ভাই রে ঝাকে ওড় ঝাকে পড় তারে বল সাড়া,
বল মোর বঁধুয়ার কাছে ভাই পিরীতি প্রাণ মরারে।
ওরে নলের আগায় নলফুল বাঁশের আগায় টিয়ে,
কইয়ো মোর বঁধুয়ার আগে না যেন করে বিয়ে রে
কি জঞ্জাল করিলি ভাই রে।
যথমে কল্লাম পেরেম্ সানবাঁধা ঘাটে,
আকাশের চন্দর যেন ভাই তুলে দিল হাতে রে,
তুলে দিল হাতে॥" ইত্যাদি

আর কত উদ্ধৃত করিব—এইরূপ ভাবের প্রেম, বিরহ, মিলন প্রভৃতি লইয়া নিরক্ষর

কবিগণ নবরসের শ্রেষ্ঠ আদিরসকে লইয়া অনেক সময় কবিত্ব বিকাশ করিয়া সমশ্রেণীর মধ্যে শ্রেষ্ঠতা লাভ করিয়াছে। এই সকল কবি প্রকৃতির প্রকৃত কবি—ইঁহাদের কবিত্ব প্রকৃতির সঙ্গে গাঁথা।

শিক্ষিত কবির ত কথাই নাই, অশিক্ষিত নিরক্ষর কবির হিন্দু-মুসলমানী ভাবে মোহন-গীতিকবিত্ব অদ্যাপিও ভাষায় পরিচালিত হইতেছে। লোকে উহাকে সাধারণতঃ "মাণিক-পীরের গীত" বা "পৌষপার্ব্বণ-গীতিকা" বলিয়া থাকে। নদীয়া জেলায় এই গীতের প্রথম প্রচার হয়। বঙ্গপ্রসিদ্ধ প্রতিভাশালী কবিনাট্যকার রায় ৺দীনবন্ধু মিত্র মহাশয় উক্ত সঙ্গীত একটী সংগ্রহ করিয়া বঙ্গীয় পাঠককে উপহার দিয়াছিলেন। যখন পৌষসংক্রান্তি উপস্থিত হয়, তখন কৃষকগণ দলবদ্ধ ভাবে অথবা কেহ একাকী গৃহস্থের দ্বারে দ্বারে গিয়া এই গীত গাইতে থাকে। যাহারা দলবদ্ধ হইয়া যায়, তাহারা দীনবন্ধু বাবুর সংগৃহীত গীতটী প্রায় গান করে না। একক ব্যক্তি প্রায়ই সেই গীত গাইয়া থাকে। ইহারা এই গীত গাইয়া গৃহস্থের নিকট হইতে চাউল, পয়সা লইয়া "মাণিক-পীর" নামক ফকীরের শির্ণী দিয়া থাকে। প্রায়ই কোন ময়দান অথবা মুক্ত প্রান্তরে পৌষ-সংক্রান্তির দিন সকলে এই উপলক্ষে উৎসব করে। ইসলামধর্ম্মে পৌত্তলিক ভাব নাই বটে, কিন্তু কোরাণের পরবর্ত্তী অনেকগুলি গ্রন্থে হিন্দুজাতির আদর্শভাব উদ্ধৃত হইয়া অনেক পীর, পয়গাম্বর, দরবেশ, ফকীর, সাঁই প্রভৃতির পূজা প্রবর্ত্তিত হইয়াছে। ইহার মধ্যে মাণিকপীর আর গাজিপীরের প্রভাব বেশী ; কিন্তু এই সকল পৌত্তলিক ছায়া বঙ্গীয় মুসলমানগণের মধ্যে ব্যতীত, উত্তর-পশ্চিমাঞ্চলের এবং বোম্বে মাদ্রাজি মুসলমানগণের সমাজে পতিত হয় নাই। নিরক্ষর মুসলমান কবিরা এই সকল পীর ফকীরগণের কাহিনী পুরাতন বঙ্গীয় কবিগণের আদর্শে ফল-শ্রুতি, উৎপত্তি, বিনয়, বন্দনা, মাহাত্ম্য প্রভৃতি অংশবিভাগে রচনা করিয়া থাকে। এজন্যই মাণিকপীরের গীতে অনেক ফলশ্রুতি আছে। আবার নিম্নশ্রেণীর কৃষক গৃহস্থের প্রধান সম্পত্তি গোধনের মঙ্গলামঙ্গল এই গীতের মধ্যে অতি বিস্তৃতভাবে বর্ণিত আছে। উদাহরণস্বরূপ কবি নাট্যকার দীনবন্ধু বাবুর উদ্ধৃত গীতটির গুটিদুই চরণ উদ্ধৃত করিতেছি,—

পৌষপার্ব্বণ গীতি, হাবুগীতি ও মাণিকপীরের গীত।

১। "কত কুদরূদ জান রে আল্লা কত কুদরূদ জান,
মাঝদরিয়ায় ফেলে জাল ডেঙ্গায় বসে টান।
দুর্গার ছাওয়াল কার্ত্তিকরে ভাই মোরগ চাপি যায়,
পূজা পালি বাজাবিবির ছাওয়াল করে দেয়।
কদু কুমড়া শশা ঝিঙ্গে উচ্ছে তাল ব্যাল,
সকল ফসল ফেলে আল্লা সরষের ভেতর ত্যাল।

* * * *

অবুদ্ধি গোয়ালা মেয়ের কুবুদ্ধি ঘটিল,
শিকের উপর দুদ রেখে পীরকে ফাঁকি দিল॥" ইত্যাদি

*আবার এই সকল মাণিকপীরের গীত গায়কগণ যখন কোন গৃহস্থের দ্বারে গিয়া উপস্থিত হয়, তখন তাহারা একটি সামান্য ঢোল ও কাঁসি বাজনার সঙ্গে সকলে ঘুরিয়া ঘুরিয়া নাচিতে নাচিতে একরূপ গীত গাইয়া থাকে। যথা—

২। "দোম্ দোম্ বলিয়া মান্দার ছাড়িল জীগির,
কবির ঘোষ উঠে বলে ওই এলো ফকীর।

৩। আরে ও কবির ঘোষ চিন্তে না পারিলে মাণিকপীর,
খড়ম পায়ে নড়ি হাতে হ্যাঙ্গড়া ফকীর,
গোয়ালার বাথানে এসে প্রথম জাহির।
দই দুগ্ধ ক্ষীর ছানা যত আছে ঘরে,
আনিয়া হাজির কর পীরের দরবারে।
কবির ঘোষ দই দুদ্ নাহি আনি দিল,
নয় লক্ষ ধেনু তার বাথানে মরিল।
বুকে গালে চড় মারি কান্দে গোয়ালার ঝি,
ফকীরে ভাঁড়ায়ে বুড় তুই কর্‌লি কি॥" ইত্যাদি

এইরূপ ভাবে কৃষকগণ নিরক্ষর কবির কথিত মাণিকপীরের গীত পৌষমাসে গাইয়া থাকে। ইহা ব্যতীত আরো অনেকরূপ গ্রাম্যগীতি বহুদিন হইতে বঙ্গদেশে প্রচলিত আছে। ইহাও পৌষসংক্রান্তিতে গীত হয়। শিক্ষিতশ্রেণীর লোকে এই গীতকে পৌষপার্ব্বণ গীত বলিয়া থাকেন, কিন্তু দেশের সাধারণ অধিবাসিগণ ইহাকে ব'লব'ল হালুই, সোনাহার এবং পিঠেগড়া প্রভৃতি নামে অভিহিত করে।

যখন নদীমাতৃক বঙ্গভূমি বর্ষার অজস্র বারিপতনপ্রক্রিয়া হইতে অব্যাহতি পাইয়া শরতে শস্যের সুন্দর সুবর্ণকিরণে দিক্‌সকল পরিশোভিত করিয়া প্রকৃতির মহিমান্বিত অচিন্ত্য ঐশীশক্তির পূর্ণ সমাবেশ শোভায় ভূষিত হইয়া উঠেন, তাহার পর হেমন্তের শিশির-শিকর-সিক্ত কলেবরে প্রজাকুল পরিশ্রান্ত চিত্তে সর্ব্বদা আমন-ধান্যক্ষেত্রের পর্য্যবেক্ষণে অবশাঙ্গ হইয়া উঠে,—তখন ধান্যধনের ভিখারী বাঙ্গালী কৃষক কোন উৎসব কি কোনরূপ চিত্তবিনোদন কার্য্যে মন নিয়োগ করিতে পারে না। যেই দেখে যে, তাহাদের পরিশ্রমের ফল সুসিদ্ধ হইয়াছে এবং সাংবৎসরিক খাদ্যের উপায় উপস্থিত হইয়াছে, অমনি তাহাদের অবশ মস্তিষ্ক, ক্ষেত্রের উর্ব্বরতার ন্যায় উৎসবকার্য্যে মহা উর্ব্বর হইয়া উঠে। গৃহে গাভীগণ সুস্থকায়ে দুগ্ধ দান করিতেছে, স্ত্রীপুত্র-পরিজন স্বচ্ছন্দমনে সুস্থশরীরে অন্যবিধ আবশ্যকীয় দ্রব্যের সংগ্রহে ব্যস্ত আছে। মাঠে সুবর্ণবর্ণ হৈমন্তিক-ধান্য-শীর্ষ, বায়ুতরঙ্গে দুলিয়া দুলিয়া যেন ইঙ্গিতে কৃষককে ডাকিতেছে। রত্ন-প্রসবিনী বঙ্গভূমি খর্জ্জুর-বৃক্ষরসে মধু দান করিয়া আবার শীতাতপ-তাপিত সন্তানগণকে উদর ভরিয়া মধু (গুড়) পান করিতে দিতেছেন। বিলে বিলে অগণিত মৎস্যজাতি নাতিগভীর জলে সন্তরণপূর্ব্বক খাদকের করে ধৃত হইতেছে। শীতাতপক্লিষ্ট জনসাধারণ সেই সময় সেই

ঘোর শীতকালের পৌষমাসে খাদ্যদ্রব্যের মধুর আস্বাদন করিতে শীতভয়ে ভীত রবিরাগরঞ্জিত রৌদ্রে বসিয়া উৎসব করিতে প্রস্তুত হয়। তাই এই পৌষসংক্রান্তিতে কৃষকশ্রেণীর যত আনন্দ, অপর উন্নতশ্রেণীর তত নহে।

পৌষমাস উপস্থিত হইলে কৃষকশ্রেণীর নিরক্ষর কবিগণ অগ্নিসম্মুখে অথবা কাম্থার তলে থাকিয়া আপন আপন প্রতিভানুযায়ী কল্পনাদেবীর অনুগ্রহে কবিত্বশক্তি স্ফুরিত করিতে আরম্ভ করে। শেষে যখন মাসের ১৫ দিন অতীত হয়, তখন কেহ বালকদল সংগ্রহ করিয়া কেহ বা যুবকদল সংগ্রহ করিয়া স্ব স্ব কবিতাশক্তির প্রসার বৃদ্ধি করিতে তাহাদিগকে শিক্ষা দিতে থাকে। শিষ্যগণের বা শিক্ষানবীশগণের শিক্ষা পূর্ণ হইলে, স্বয়ং কবি মহাশয় তাহাদিগকে একদিন নিজ বাড়ীতে পরীক্ষা লইয়া সাধারণের নিকট ছাড়িয়া দেন। শেষে অভ্যস্ত যুবক অথবা বালকগণ গৃহস্থের দ্বারে দ্বারে গিয়া গীত গাইতে থাকে।

মাসের শেষদিন যখন উন্নতশ্রেণীর গৃহস্থ সাধারণ পিষ্টকাদি খাদ্য আস্বাদন করিতে থাকেন, তখন এই সকল গায়কগণ কোন প্রান্তরে গিয়া উৎসব করে। ইহাদের এই উৎসবে অন্য কোন আমোদজনক কার্য্য নাই, কেবল হিন্দুজাতির নিম্নশ্রেণীর কৃষকগণ "বাস্তুদেবতা" পূজা উপলক্ষে সময় সময় মেষ বলিদান দিয়া পিষ্টকাদিখাদ্যে তৃপ্ত হইয়া স্থানে স্থানে হরিনামকীর্ত্তন করে। আর মুসলমানগণ "পীরের শির্ণী" দিয়া এক একবার প্রান্তরের মধ্যে "আমিন আমিন" শব্দে উৎসাহসূচক ধ্বনি করে।

এই পৌষপার্ব্বণ-প্রক্রিয়া উচ্চশ্রেণীর হিন্দুমুসলমান মধ্যেও বিরল নহে।

বঙ্গের এই পৌষপার্ব্বণ অতিপ্রাচীন রীতি, তাই বঙ্গীয় কৃষকগণ এই প্রাচীন রীতির এত পোষক। এই কারণেই কৃষকসমাজের নিরক্ষর কবির দল এই রীতির উপর অনেক কবিত্বশক্তি প্রদর্শন করিয়াছেন। যখন পৌষের হাড়ভাঙ্গা শীতে কৃষকবালকগণ দলবদ্ধ হইয়া গৃহস্থের বাড়ীতে বাড়ীতে সোনাহার গাইতে থাকে, তখন দেখা গিয়াছে এই গীতের দলে একটী অপেক্ষাকৃত বয়ঃপ্রাপ্ত বালক অগ্রে গাইয়া যায়, তাহার পর অপর বালকগণ ঝুমর গাইতে থাকে। যখন সামান্য মলিন বেশধারী বস্ত্রাচ্ছাদিত কৃষকপুত্রগণ এই গীত গাইতে থাকে, তখন অনেক সময় দেখা যায়, কত কত শিক্ষিত ব্যক্তি এমন কি ভদ্রঘরের অসূর্য্যম্পশ্যা ষোড়শী রূপসীগণ পর্য্যন্ত অতি ঔৎসুক্যের সঙ্গে এই গীত শ্রবণ করিয়া থাকেন।

সঙ্গীতগুলির মধ্যে শব্দের তত গাম্ভীর্য্য নাই। সহজাত সরল শব্দবিন্যাসে রচিত। ভাবের মধুরতা, কৌতুকের কোমলতা এবং আগ্রহের উচ্ছ্বাসে এই সমস্ত গীতি উচ্ছ্বাসিত। যাহারা এই সমস্ত সঙ্গীত রচনা করিয়া দেশের মধ্যে সমশ্রেণীর নিকট গণ্যমান্য হইয়াছে, তাহারা ভদ্র সাধারণের নিকট "চাষাপণ্ডিত" নামে অভিহিত। এই সকল চাষা পণ্ডিতগণ জীবনে কখনো কালিকলম হাতে করে নাই, কেবল প্রকৃতিজাত কল্পনাকৌশলে এবং ভাবের আবেগে, কখন কৃষিক্ষেত্রে, কখন নৌকাচালনে, কখন গৃহের বারেণ্ডায়, কখন শস্যের ভার মাথায় করিয়া কোন সময় সমবয়স্কের সঙ্গে পথগমনে এই সকল সঙ্গীত রচনা করিতেছে।

পৌষমাসের কতকগুলি অৰ্দ্ধভাঙ্গা 'সোনাহার' সঙ্গীতের নমুনা দিতেছি—

১। "চ্যাগা বলে চ্যাগীরে এবার বড় বান্,
উচু করে বাঁধব ভিটে খুটে খাব ধান।
ধান খাব না পাণ খাব না খাব সোণার নাড়ু,
দুই হাত ভরে নেব সুবর্ণের খাড়ু।
এক খাড়ু না দুই খাড়ু না খাড়ু পাঁচ ছয়,
রাজার বেটা জগন্নাথ ঘোড়া চড়ে যায়।
ঘোড়া চড়ে যেতে রে ভাই পাঁচ কাপড়া পায়।
জগন্নাথের নফর তাই মাথায় বান্ধে সাড়ী,
সে সাড়ী গে উড়ে পড়ে চাঁদখাঁয়ের বাড়ী।
চাঁদখাঁ—চাঁদখাঁ কি কর বসিয়ে,
তোমার পুত্র সভার মাঝে মার খায় আসিয়ে।
আর মেরনা আর মেরনা ফুলবেতের বাড়ি,
কাল সকালে দিব তোমার খাজনার কড়ি॥ ইত্যাদি।

২। হুঁ হুঁরে নড়িয়ে, হস্তীর পরে চড়িয়ে।
হস্তী দুল দুল করে, তার উপরে পায়রা উড়ে।
আয় পায়রা নাম্‌সে, লাফা বাগুণ ধর্‌সে।
লাফা বেগুণ থল্‌বলায়, খেড়ো ভাই খেড় খেড়ায়।
খেড় খেড়াতি লাগল হুড়, কে যাবি ভাই বেরামপুর।
বেরামপুর না পাকপাড়া, তিন ছয় আঠার ঘোড়া।
ঘোড়ায় গোড়ায় জুঝিব, চাল গুটা দুই খুঁজিব।
চেলের ভাত আজ্ঞি গুজি, ধরে মরদ পা'ড়ে বুঝি॥ ইত্যাদি

৩। দেশে এবার উঠ্‌লো বাহার, লোকের নাই নিদ্রা আহার।
যে যার কাম করে ভাই, আমি তাই গায়ে যাই।
পোষের হাড়-ভাঙ্গা শীতে, আমার সাথে আয় রে মিতে।
এই পয়ারের ক্ষান্ত হলো, দোহার সকল ব'ল ব'ল বল।

৪। গোপালা ধোপা কাপড় কাছে কস্তুরীর ফুল,
আশু মুহুরি পত্র লিখে মধ্যে মধ্যে ভুল।
চন্দ্র ঠাকুর পূজা করে খাবলা খাবলা ফুল,
কৈলাস নাপিত ক্ষৌরি করে সন্ত উঠে চুল।
বাদল কামার কাঁচি গড়ে পায় চারিটি আনী,
কচু গাছে বাদারে দিয়ে করে টানাটানি।

কচু গাছে উঠিয়ে বলে সামাল সামাল,
এত দুঃখ দিলিরে ভাই বাদল কামার।"

এইরূপ ভাবের কৃষকশিশুবোধ্য সুলভ সহজ শব্দ-বিন্যাসে এই সমস্ত গীতগুলি রচিত। এতদ্ব্যতীত কোন কোন অপেক্ষাকৃত উন্নত নিরক্ষর কবি দেশপ্রচারিত শুভ অশুভ সংবাদ লইয়া এবং কোন বিশেষ ঘটনা লইয়া এইরূপ ভাবের শব্দে পৌষপার্ব্বণগীত রচনা করিয়া থাকে। এক সময় নলডাঙ্গার রাজা প্রমথভূষণ দেব রায় বিধবার বিবাহ দিয়া সমাজে একটি মহা হুলস্থূল উপস্থিত করিয়াছিলেন। সেই সময় কোন একজন নিরক্ষর কবি গাইয়াছিল—

৫। "যত বুড়ো নড়ি হাতে চল্লো নলডাঙ্গায়,
যুবতী বিধবার বিয়ে করিবার আশায়।
বুড়ো হেটে যেতে থুব্ড়ে পড়ে তবু চলে যায়,
বাছিয়ে করিবে নিকে গিয়ে নলডাঙ্গায়।
রামী শ্যামী বামী জগী গৃহস্থের ঝি,
ডাকে তারা মালা লয়ে (আয়) গলায় পরায়ে দি।
একাদশী বগুনা পোড়া এড়ান যদি যায়,
তাই তারা বুড়ো যুবো কিছুর দিক্ না চায়॥" ইত্যাদি

আবার কোন কোন নিরক্ষর কবি হিন্দু-মুসলমানের পুরাণ, কোরাণ হইতে ঘটনাবিশেষ লইয়া এই পৌষপার্ব্বণগীতি রচনা করিয়াও প্রকাশ করিয়া থাকে। এই সকল গীতের মধ্যে স্থানে স্থানে মধুর কবিত্ব কেমন সুন্দরভাবে অলঙ্কারবিহীনা ষোড়শী রূপসীর ন্যায় মৃদু মন্থর গতিতে উন্মুক্ত প্রান্তরে যেন পদচারণ করিতেছে। যথা—

৬। "নন্দরাণী নন্দরাণী বড়ই ভাগ্যবান্,
সেই ঘরেতে জন্ম নিলেন কৃষ্ণ বলরাম।
রাত্ দুপুর্কালে রাণী ঘাটে চলে যান,
শূন্য ঘর পেয়ে কৃষ্ণ সকল ননী খান।
ননি খেলো কেরে গোপাল ননীখেলো কে,
আমিত খাইনেই ননী বলাই খেয়েছে।
এক গোপী উঠে বলে ওরে ননীচোর—
এই ত খালি, ভাণ্ড ভেঙ্গে হাতে মাখা তোর,
বলাই ত খায়নি ননী কৃষ্ণ বাণ্ডিল পুরেছে।
তখন রাগে রাণী উঠে গিয়ে ঝাপদে ছিড়ে নিয়ে,
গাভী-ছাদন-দড়ি দিয়ে বান্ধলেন কৃষ্ণে গিয়ে।
লাফ দিয়ে ধরলেন কৃষ্ণ কদম গাছের ডাল,
গোপীগণ বলে কৃষ্ণ সামাল সামাল।

আগায় পাতায় বেড়ান কৃষ্ণ ডালে না দেন পা,
নেমে আয় রে সোণার যাদু আর বাঁধ্‌ব না ॥" ইত্যাদি

যে সকল ভদ্রাভিমানী ব্যক্তি কোন সময় ঘটনাচক্রের আবর্ত্তনে পড়িয়া কৃষিসমাজে ভ্রমণ করিয়াছেন, তিনিই অপর অপেক্ষা কৃষিজীবনের ক্ষুদ্র ক্ষুদ্র রহস্য অনেকটা পরিজ্ঞাত আছেন। প্রকৃতির প্রিয়পুত্র কৃষক সকল অমার্জ্জিত অসংস্কৃত হৃদয়ের যে মহতী শক্তি দ্বারা শিক্ষিত সুসংস্কৃত হৃদয়ের সহিত সাংসারিক ব্যাপারে অসীম ঘাত-প্রতীঘাত নিয়ত সহ্য করিয়া আনন্দ-ময়ীর বিমল আনন্দরাজ্যে আংশিক আনন্দ লাভ করিতেছে, তাহা ভদ্রাভিমানী ব্যক্তিবর্গের ভাগ্যে বড় একটা ঘটিয়া উঠে না। হৃদয়ের আনন্দ উচ্ছ্বাস সময়ে সময়ে যখন নিরানন্দের ঘোর বিভীষিকাময়ী যন্ত্রণার করাল দংশনে জর্জ্জরিত হইয়া উঠে, তখনও নিরক্ষর কৃষক কবি কবিত্বের কোমল আস্বাদ ভুলিতে পারে না, এই জন্য এই সকল নিরক্ষর কবিগণ আপন আপন বালকগণকে পরস্পরের সহিত বিবাদ ছলে একরূপ কবিত্বময় কলহ শিক্ষা দিয়া থাকে। এই সঙ্গীতকলহ দুই বা ততোধিক বালকসমূহে গীত হয়। ইহাকে সাধারণতঃ 'হাবুগীত" কহে। ইহার ভাষা বড় অশ্লীল। কিন্তু স্থানে স্থানে শ্লীলতাময় শব্দ-বিন্যাসও আছে।

হাবুগীত।

এই হাবুগীত গাইবার সময় কৃষক শিশুগণ দুই চরণ বিস্তৃত করিয়া বামহস্ত বক্ষের সঙ্গে সংবদ্ধ করত দক্ষিণ হস্ত নাড়িয়া নাড়িয়া সুরের সঙ্গে গাইতে থাকে। আর সময় সময় মুখে এক প্রকার হাস্যোদ্দীপক শব্দের সঙ্গে বগল বাজাইয়া সঙ্গীতের উপসংহার করে। এই সমস্ত গীতগুলি অশ্লীল হইলেও ইহাতে রচয়িতার যথেষ্ট নিপুণতা আছে। পাঠকের কৌতূহল ব্যাধির প্রশমন জন্য দুইটি মাত্র গীতার্দ্ধ উদ্ধৃত করিলাম,—

১। "বাছুরে বাছুরে যুজ নেগেছে—
তোর এঁড়েতে ধুম ধ'রেছে।
তামাক খাবি ভাঙ্গা ডাবায়, বল্যায় কামড় দেবো— * * * *
তোর কল্লা কাণে টান মারিয়ে লেজ মুড়িয়ে দেবো ॥ ইত্যাদি

২। হাড় গিলেরে ভাই, চিঁড়া কোটরে খাই,
একটা চিড়ে কম পল্লে দাদার বাড়ি যাই,
দাদার আছে দোয়া গরু আমার আছে ভাই,
দুই ভায়েতে যুক্তি করে মধুপুরে যাই ॥" ইত্যাদি

আহা যখন কৃষককামিনীগণ পিতা ভ্রাতার সম্মুখে বসিয়া নিরক্ষর কবির কবিত্বময় গীতি-প্রবাহে ভাসিতে থাকে, তখন তাহাদিগের সেই স্বল্প সলজ্জ কৃষ্ণ তারকময় চক্ষুর দিকে চাহিলে প্রাণে যে কি অপূর্ব্ব বিমল আনন্দ উপস্থিত হয়—যিনি তাহা স্বচক্ষে না দেখিয়াছেন তিনি তাহার কণামাত্রও উপলব্ধি করিতে পারিবেন না। ধন্য প্রকৃতির প্রিয় নিরক্ষর কবিগণ, তোমাদের কবিতাই জাগতিক কবিতা—যে কবির কবিতা তোমার সঙ্গে ঘন সন্নিবিষ্ট হইয়া

ভাষায় মানবকে হৃদয়ের অন্তঃস্থল অধিকার করাইতে পারে, তিনিই কবিত্বময় জগতের গূঢ় রহস্য পরিজ্ঞাত আছেন। সেই জন্য একজন দার্শনিক কবি বলিয়াছেন—

"কবিরাই জানে ধরা তোর লীলা খেলা
তাতে আর তোতে ভেদ করে নাকো তারা
তোমার হৃদয়ে তিনি সদা জাগরিত,
নলিনীদলগত ফুল্ল সলিলের মত॥"

অতঃপর আমরা এই স্থানে এই অংশের উপসংহার করিতে বাধ্য হইলাম। কিন্তু একটি কথা আছে, আজকাল পুস্তকে কোন পুরাতন প্রাচীন রীতিনীতি বা আমোদ উৎসবের উল্লেখ না থাকিলে কালে তাহা একেবারে দেশ হইতে বিদূরিত হইবে। যেহেতু অধুনা পাশ্চাত্য সভ্যতার কুহকে ভারতীয় অকৃত্রিম ভাবগুলি প্রায়ই মুহ্যমান হইয়া পড়িয়াছে। আমরা এখন অনুকরণপ্রণালীর ক্রীতদাস—ইউরোপ আজ আমাদের জ্ঞানবিজ্ঞানের শিক্ষক। যে জাতি একদিন সমগ্র জগতের শিক্ষকস্থানে বসিয়া মানবে আর দেবতার তুল্যরূপ ক্ষমতা প্রদর্শন করিয়াছে, আজ সময়ের মহীয়সী শক্তির গুণে সেই জাতির বংশধরগণ বিদেশীর নিকট অধ্যয়ন করিয়া সভ্য হইলাম ভাবিয়া অহঙ্কারে স্ফীতবক্ষ। এইজন্য প্রাচীন ভাবগুলি পুস্তকাকারে রক্ষা করাই সঙ্গত বলিয়া গ্রথিত হইল।

সারীগীত।

"সারীগীত" অতি পুরাতন, যখন ভারতে হিন্দুগৌরবরবি অস্তমিতপ্রায় অথচ ইসলাম-গৌরবসূর্য্য প্রদীপ্ত প্রভায় সমুদ্ভাসিত, তখনও বঙ্গে সারিগীত ছিল। প্রমাণস্বরূপ প্রাচীনগণ বলেন যে, যে সময় নাটোররাজ্যাধীশ্বরী প্রাতঃস্মরণীয়া ভবানীর কন্যা সিরাজউদ্দৌলার ভয়ে যশোহর জেলার লুপ্তগৌরব মহম্মদপুরে অবস্থান করিতেন, তখনও দশভুজার পূজার পর বিজয়ার দিন সারীগীত গীত হইত। অদ্যাপিও মাগুরা মহকুমার পূর্ব্বাংশের লোকে গাইয়া থাকে যথা—

"হারে ও মাঝি বসে ভাবিস্ কি,
ধান দূর্ব্বা লয়ে হাতে দাঁড়ায়ে আছে ঝি।
ভালো দুদে চিনি দিয়ে রামসাগরের ধারে,
তারা দেবী রাণীর মেয়ে দাঁড়ায়ে পথের ধারে।
দশভুজা করে পূজা প্রসাদ লয়ে হাতে,
দশমীর আরতি দিতে দাঁড়ায়ে আছে পথে।"

এই সকল প্রচলিত সারিগীত দ্বারা বাস্তবিক আমরাও বুঝিতে পারি যে, সারিগীত বহু পুরাতন, কিন্তু ভাষার শব্দবিন্যাস দেখিলে অভিনব বলিয়াই অনুমান হয়। যাহা হউক সারী-গীতে অন্যান্য গ্রাম্যকবিতা হইতে শব্দমাধুর্য্য অধিক।

যশোহর জেলার প্রসিদ্ধ জমিদার নড়াইল রায়বংশের পুরুষসিংহ ৺রামরতন রায় জমিদারী প্রজার বলবত্তা প্রকাশের জন্য "জলযাত্রা" নামে একটি উৎসব করিয়া তাঁহাদের কুলদেবতা-

স্থাপিত বিগ্রহ "গোবিন্দরায়"কে শ্রাবণমাসে নৌকাপথে বাইচ্ দিয়া লইয়া বেড়াইতেন, যেহেতু এই জমিদারবংশের স্থাপয়িতা স্বনামখ্যাত কালীশঙ্কর দত্ত (রায়) যৎকালে প্রাতঃস্মরণীয়া দ্বিতীয়া অন্নপূর্ণা মহারাণী ভবানীর প্রতিনিধিরূপে চাকলে ভূষণার নায়েবী করিয়া নাটোর রাজবাড়ীতে আধিপত্য লাভ করিয়াছিলেন, শুনা যায় এবং কিম্বদন্তী প্রকাশ করে যে সেই সময় কালীশঙ্কর বঙ্গবিখ্যাত উত্তররাঢ়ীয় কায়স্থকুলতিলক যশোহর মহম্মদপুরের রাজা বীর সীতারামের স্থাপিত "লক্ষ্মীনারায়ণ" বিগ্রহ গোপনে নড়াইল রাজধানীতে আনয়ন করিয়াছিলেন। লক্ষ্মীনারায়ণের শ্রাবণ-পূর্ণিমায় আগমন হয় এবং জলপথে আসিতে আসিতে নবগঙ্গার সঙ্গমস্থান মধুমতীর তীরস্থ ভাটিয়া পাতার ত্রিমোহনায় গোবিন্দরায় নাম গ্রহণ করিয়া আগমন করিয়াছিলেন। এই ব্যাপার লইয়া রতনবাবু জলযাত্রা প্রথার সৃষ্টি করেন। দুঃখের বিষয়, এই জমিদারবংশের পূর্ণদেবতা গোবিন্দ রায় বিগ্রহ বাঙ্গালা ১২৮২ সালে নড়াইল বাড়ী হইতে দালানের ছাদ ভাঙ্গিয়া অনেক জীবহত্যার পর পূর্ণবিগ্রহত্ব হারাইয়া অন্তর্হৃত হইয়াছেন। এখন নামে গোবিন্দরায় আছেন—বিগ্রহের বিগ্রহত্ব কতদূর আছে তাহা তদীয় সেবকগণই জানেন। এই জলযাত্রা উৎসব গোবিন্দরায়ের একটি উৎসব বিশেষ। অদ্যাপিও ইহা নড়াইল জমিদারগণ কর্ত্তৃক আচরিত হইয়া থাকে। এই জলযাত্রার দিন নমশূদ্র মালো জালিয়া প্রভৃতি নিম্নশ্রেণীস্থ হিন্দুগণ সারীগীত গাইয়া থাকে। একদিন এই জলযাত্রার উৎসবে গ্রন্থকার কোন কার্য্য বিশেষে যোগ দিয়াছিলেন। সেই সময়ে শ্রুত গুটি কয়েক সারীগীত শুনিয়া গ্রন্থকার অতি মুগ্ধ হন। অদ্য তাহাই প্রসঙ্গাধীন মনে পড়িয়া এই অধ্যায়ে উদ্ধৃত হইল। এই সকল নিরক্ষর কবির গীতিকবিতায় ও শিক্ষিত কবির গীতিকবিতার কবিত্বে কত প্রভেদ, তাহা প্রীয় পাঠক দেখিতে পাইবেন।

"আরে ও কানাই পার করে দে আমারে,
আজিকার মথুরায় বিকি দান করিব তোমারে।
তুমি ত সুন্দর কানাই তোমার ভাঙ্গা না।
কোথায় রাখ্‌বো দইয়ের পশরা কোথায় রাখ্‌বো পা॥
শুনে কানাই বলে তখন শোন রসবতি,
ভরাকালে ভরা গাঙ্গে কেন এলে যুবতি।
আগা নায়ে রেখে দই মাঝখানেতে বস্
ফুটিক ফুটিক ফেল জল লজ্জায় কেন ভাস।
সর্ব্ব সখী পার করিতে নেব আনা আনা
রাধিকারে পার করিতে নেব কাণের সোণা॥

আর একদিন বিজয়ার বিসর্জ্জন প্রক্রিয়া সমাপনান্তে গৃহে ফিরিতেছি। মনে কেবল নিরাশার উপর নিরাশা একাধিপত্য করিতেছে। শুষ্ক বৈরাগ্য আর উদ্যমশূন্যতা লইয়া নৌকার এক কোণে বসিয়া অনন্ত আকাশের অনন্ত তারারাজির মাধুরীসহ শর্ব্বরীর চন্দ্র অক

যাইতেছে দেখিতেছি, এমন সময় একটি সারীগীতে আমার প্রাণের প্রাণ শ্রীগৌরসুন্দরের সন্ন্যাস-স্মৃতি জাগাইয়া আমারে একেবারে দশমীর চাঁদের অস্তগমনের সঙ্গে সঙ্গে ঘোর বৈরাগ্য প্রবৃত্তির অধীন করিয়া তুলিল। একজন কৃষক-গায়ক পায়ে ঘুঙ্গুর দিয়া নৌকার দাঁড়ের বন্ধনীতে লোহার কড়া লাগাইয়া প্রত্যেকবার নৌকা সঞ্চালন সহ গাইতেছে—

"কেমনে বাঁচিবে তোর মা—
আরে ও নিমাই সন্ন্যাসেতে যেও না।
যখনে জন্মিলে নিমাই নিম তরুতলে
আমি বাছিয়া রাখিলাম নাম নিমাইচাঁদ তোমারে।
সন্ন্যাসী না হইও নিমাই বৈরাগী না হইও
ওরে ঘরে বসে কৃষ্ণনাম আমারে শুনাইও।
সোণার নদীয়া ছেড়ে যাবে গোরা রায়,
ঘরে বিষ্ণুপ্রিয়ার বল কি হবে উপায়।
কাঁচাসোণার বরণ অঙ্গে ছাই যে মাখিবে,
শচী মায়ের বুকে তাহা কেমনে সহিবে॥" ইত্যাদি

এইরূপ অপূর্ব্বভাবব্যঞ্জক করুণরসপ্রবণ সারীগীত সেই বিজয়ার নিরাশ হৃদয়ে শুনিয়া কোন্ সহৃদয় ব্যক্তি অশ্রুপাত না করিয়া থাকিতে পারেন? যাহারা এই সকল আবেগময় গীতি-কাব্যের কবি, তাহারা নিরক্ষর হইয়াও শিক্ষিতের হৃদয় পূর্ণরূপ অধিকার করিতে শিখিয়াছে। ধন্য নিরক্ষর কবির কল্পনাপ্রবণ বিষয়নির্দ্দেশশক্তিকে! সমস্ত সারীগীতই পৌরাণিক দেবদেবীর কাহিনীপূর্ণ করুণা, প্রেম, ভক্তি এবং দৈন্য বা আর্ত্তিতে সংবদ্ধ। প্রসঙ্গাধীন আর একটি গীতের দুইটি চরণ স্মৃতিপথে উদিত হইতেছে, যথা—

"সোণার কমল ভাসিয়ে জলে আমার মা বুঝি কৈলাসে চলিল।
হাস ম'ষ দিয়ে মাগো ক'ল্লেম তোর পূজা,
কোথায় ফেলে গেলি এ সব ওমা দশভুজা। (সোণার কমল)
মাগো কার বাড়ী গিয়েছিলে কে ক'রেছে পূজা,
কার জনম ক'ল্লে সফল হ'য়ে দশভুজা। (সোণার কমল)
সন্ন্যাসী না হ'ব আমি বৈরাগী না হ'ব,
আমার মায়ের পায়ের রাঙ্গা জবা মাথায় তুলে নেব। (সোণার কমল)
কি দেখিতে এলে মাগো গেলে কি দেখিয়ে,
তোমার দুখের ছেলে মলো মাগো দুর্গাদুর্গা ব'লে॥" ইত্যাদি।

আহা মাতৃভক্ত সন্তানের ইহা অপেক্ষা শোকের সঙ্গীত আর কি হইতে পারে। মা চলিয়া গিয়াছেন, মাতৃভক্ত পুত্র মায়ের চরণালঙ্কার লইয়া কর্ত্তব্যের পথে সাংসারিক কার্য্য করিতে

লিল। এই বিবাদব্যাপমান কবিতা যে কবির কল্পনাপ্রসূত তিনি নিরক্ষর হইলেও পূর্ণ শিক্ষিত, কৃষক হইলেও ভদ্রাভিমানী ভদ্র হইতেও ভদ্রতর। (ক্রমশঃ)

শ্রীমোক্ষদাচরণ ভট্টাচার্য্য।

পয়ার ছন্দের উৎপত্তি।

বঙ্গসাহিত্যের প্রথমযুগের প্রথমাবস্থায় বঙ্গীয় আদি কবি "ফুলের মুখুটী" ফুলিয়ার ব্রাহ্মণ কবি কৃত্তিবাস ও বসুবংশাবতংস কায়স্থকবি মালাধর বসু গুণরাজ খাঁ এই উভয়ে যথাক্রমে "রামায়ণ" ও "শ্রীকৃষ্ণবিজয়ে" যে ছন্দের অবতারণা করেন, তাহারই নাম "পয়ার"। "পয়ার" ছন্দও সেই অবধি বঙ্গ-সাহিত্যসাগরে একটানা স্রোতে প্রবাহিত হইয়া আসিতেছে। যে ছন্দ এতদ্দিন বঙ্গসাহিত্যের উপর একাধিপত্য বিস্তার করিয়া আসিতেছে, তাহার উৎপত্তির ইতিহাস সম্বন্ধে এ পর্য্যন্ত কোন সাহিত্যতত্ত্ববিদ্ কোন কথাই বলেন নাই বলিলেও অত্যুক্তি হয় না।

কেহ কেহ বলিতে পারেন যে, এই সামান্য একটা বাঙ্গালা ছন্দের উৎপত্তি সম্বন্ধে মাথা ঘামাইয়া বৃথা সময় নষ্টের প্রয়োজন কি? কথাটা সাধারণ ব্যক্তির মুখেই শোভা পায় বটে; কিন্তু যাঁহারা সাহিত্যালোচনায় বিমল আনন্দ লাভ করেন, এরূপ সাহিত্যসেবিমাত্রেই স্বীকার করিবেন যে ছন্দ বঙ্গসাহিত্যের আদি স্তর হইতে আধুনিক স্তর পর্য্যন্ত সমান ভাবে বর্ত্তমান, তাহার উৎপত্তির একটা ইতিহাস জানিয়া রাখা প্রয়োজন। ইংরাজি সাহিত্যের আদি স্তরের আলোচনা করিতে হইলে তৎকালীন প্রথম ও প্রধান কবি চসারের কবিতার আলোচনা নিতান্ত প্রয়োজন; চসারের কবিতার আলোচনা না করিলে যেমন ইংলণ্ডের প্রথমযুগের সাহিত্যের আলোচনা অসম্পূর্ণ থাকে, তেমনি বঙ্গসাহিত্যের আদি স্তরের প্রথম ও প্রধান কবি কৃত্তিবাসের কবিতা পয়ারের আলোচনা না করিলে তাহা অসম্পূর্ণ থাকিবে; অধিকন্তু পয়ারের উৎপত্তির আলোচনা বাদ দিয়া বঙ্গসাহিত্যের আদি স্তরের আলোচনা হইতে পারে না।

পাশ্চাত্যজাতির নিকট ভাষাতত্ত্বের আস্বাদন পাইয়া অবধি আমাদের দেশের সাহিত্য-তত্ত্ববিদ্গণ বঙ্গভাষার আদ্যকাল হইতে বর্ত্তমান কাল পর্য্যন্ত বঙ্গসাহিত্যের একটা ধারাবাহিক ইতিহাসের আলোচনা করিতে আরম্ভ করিয়াছেন এবং তদ্দ্বারা কত প্রাচীন কাব্য কত প্রাচীন পুঁথির উদ্ধার সাধন হইয়াছে ও হইতেছে এবং সঙ্গে সঙ্গে তাহাদের রচনা কালও নিরূপিত হইয়াছে; কিন্তু দুঃখের বিষয় প্রাচীন বঙ্গসাহিত্যের সর্ব্বপ্রথম প্রাচীন বিষয় পয়ার ছন্দের কথা

এ পর্য্যন্ত কেহই কিছু বলেন নাই, এ কথা পূর্ব্বেই উক্ত হইয়াছে। কেবল "বাঙ্গালাভাষা ও সাহিত্যবিষয়ক প্রস্তাব"-লেখক পরলোকগত পণ্ডিত রামগতি ন্যায়রত্ন মহাশয় উক্ত পুস্তকে পয়ারছন্দের উৎপত্তি সম্বন্ধে যৎকিঞ্চিৎ আলোচনা করিয়াছিলেন এবং উক্ত পুস্তকের সমালোচনা উপলক্ষে প্রথম বর্ষের "বঙ্গদর্শনে" বঙ্গের সর্ব্বতোমুখী প্রতিভাসম্পন্ন সম্পাদক স্বর্গীয় বঙ্কিমচন্দ্র চট্টোপাধ্যায় এতৎ সম্বন্ধে কিঞ্চিৎ আলোচনা করেন; কিন্তু তাঁহাদের মধ্যে কোন মহাত্মাই কোনরূপ সমীচীন সিদ্ধান্তে উপনীত হইতে পারেন নাই।

চট্টগ্রামের প্রাচীন বাঙ্গালা পুঁথির অন্যতর অধিকারী শ্রীযুক্ত আবদুল করিম মহোদয়কে এই পয়ার সম্বন্ধে কতিপয় প্রশ্ন লিখিয়া পাঠাইয়াছিলাম, তিনি প্রত্যুত্তরে যাহা লিখিয়াছেন নিম্নে তাহা উদ্ধৃত করিলাম :—"পারস্যভাষায় পয়ার বলিয়া কোন শব্দের অস্তিত্ব নাই। চট্টগ্রামের ছেলেদের মধ্যে "বাথ্‌পয়ার" নামক এক খেলা প্রচলিত আছে বটে, কিন্তু তাহাতে পয়ার শব্দের উদ্দিষ্ট কি বুঝি না। বোধ হয় আলাওল সাহেবের রচিত "সপ্তপয়কর"* নামক পুঁথির কথা শুনিয়াছেন। তাহাকে সাধারণতঃ লোকে "সপ্তপয়ার" নামেই অভিহিত করিয়া থাকে। উক্ত স্থলে "পয়কর" শব্দের অর্থ ছবি। "পয়কর" শব্দটি পারসী। পয়করের পরিণতি লোকের মুখে "পয়ার" হইয়াছে দেখিলেন! এই হিসাবে পয়কর হইতে পয়ার উৎপত্তির একটা কারণ অনুমান করা যাইতে পারে। অনুমান হইলেও সেটা এখানে উল্লেখ করিলাম"। তাঁহার অনুমানের "ক" অংশ যথা :—

"আপনি জানেন যে, বিশেষ বিশেষ রসের বা ছন্দের অবতারণা স্থলে প্রায়ই ত্রিপদী একাবলী ত্রোটক প্রভৃতি ছন্দের ব্যবহার প্রাচীন কবিগণ করিয়া গিয়াছেন। এরূপ স্থানে বর্ণনীয় বিষয়ের বিশেষ কোন বর্ণনা থাকে না; অর্থাৎ গল্প বা ঘটনার বেশী বর্ণনা থাকে না। প্রাচীন পুঁথিমাত্রেই দেখিবেন, যে অংশ তথায় "পয়ার" চিহ্নিত হইয়াছে, তাহাতে স্থূল ঘটনা মাত্র বর্ণনা করিয়া দেওয়া গিয়াছে। অতি উচ্চশ্রেণীর কবি ভিন্ন পয়ার অংশে বিশেষ কোন রসের বা সৌন্দর্য্যের বিশ্লেষণ প্রায় থাকে না। চিত্রকরের ছবি ও কবির কাব্য বর্ণিত "ঘটনা" একই জিনিস বলিয়া, বোধ হয় কবির কাব্যখানি একটা ছবি ভিন্ন আর কিছুই নহে। আমার বোধ হয় ত্রিপদী প্রভৃতি ছন্দে কবি ছবির সৌন্দর্য্যমাত্র প্রদর্শন করেন, আর পয়ারে ঠিক ছবিটাই প্রদর্শন করেন। এই জন্য কাব্যের গল্পাংশটা "পয়কর" বা "পয়ার" নামে অভিহিত হইয়াছে বোধ হয়।"

তাঁহার অনুমানের "খ" অংশ যথা :—

"মুসলমানেরা "পদ্মাবতী" প্রভৃতি পুঁথি গানের সুরে পাঠ করিয়া থাকেন...। ভাল গায়কেরা (যাঁহারা পণ্ডিত নামে খ্যাত) রাগ ও ছন্দানুযায়ী গাইয়া থাকে; সাধারণ গায়কেরাও স্ব স্ব সাধ্যানুসারে গায়। "পয়ার" অংশ ভিন্ন অপরাপর স্থলে গায়কেরা রাগ ছন্দ ধরিয়া

---

* পরিষৎ-পত্রিকা ১০ম ভাগ ৩য় সংখ্যা ৮৪পৃঃ নং ১২১ দ্রষ্টব্য।

বিশেষ আয়াস সহকারে গান করে।.........সেই জন্য পয়ারে আনিয়া তাহারা সাধারণ ভাবে (কোন রাগ ছন্দ না ধরিয়াই) পড়িয়া কেবল গল্প শুনাইয়া যায়। ইহাতে যেমন পরিশ্রম কম হয় তেমনি দ্রুত পাঠ করা যায়। অন্য কথায় বলিতে গেলে ইহাতে শ্রোতৃ-দর্শকের "ছবি" দর্শনটা শীঘ্র শীঘ্র হইয়া থাকে। পয়ারে গল্পাংশের আধিক্য থাকে বলিয়া শ্রোতৃগণের মন গল্প শুনিবার জন্যই ব্যগ্র থাকে, গায়কের গানের মাধুর্য্যাদির দিকে তাহাদের বড় খেয়াল হয় না। এখানেও আমার বোধ হয় "পয়ারে" ছবিমাত্র দেখান হয় বলিয়া উহা "পয়কর" বা পয়ার নামে প্রচলিত হইয়া গিয়াছে"।

তাঁহার অনুমানের "গ" অংশ যথা :—

"চট্টগ্রামের "গাজীসাহেবের গান" প্রচলিত আছে। তাহারা গায়ককে "গাইন" বলে। গাইন ঠিক পুঁথি-পাঠকের মতই করে। স্থানে স্থানে ঘোষা (ধূয়া) ধরিয়া তাল ও নৃত্য সহকারে গীতের সুরে কোন রসযুক্ত কথার বা অংশের বর্ণনা করিয়া যায়। পরে যেন বিশ্রামার্থই বিনা তানলয়ে কথার মত ভাষায় দ্রুতভাবে কতকটা গল্প শ্রোতৃবর্গকে শুনাইয়া দেয়। সেকালের যাত্রা-পুস্তকে "পটী" অংশের যে কাজ উক্ত অংশে "গাজীর গাইনের"ও সেই কাজ। এখানেও বলা যাইতে পারে যে, এতক্ষণ সৌন্দর্য্য প্রভৃতি প্রদর্শন করিয়া গাইন "গল্পরূপ ছবি" প্রদর্শন করে! সুতরাং পয়ার চিত্রবোধক "পয়কর" হইতে আসিয়াছে অনুমান করা অসঙ্গত বোধ হয় না"।

তাঁহার অনুমানের "ঘ" অংশ যথা :—

"সাধারণতঃ গল্পযুক্ত অংশই যখন "পয়ার" বলিয়া চিহ্নিত হইয়াছে দেখা যাইতেছে এবং "গল্প" যখন কাব্যে "চিত্র" বাচক হইতে পারে, তখন "পয়কর" হইতে পয়ারের উৎপত্তি কিছুতেই অসম্ভব ও অসঙ্গত বোধ হয় না। বলা উচিত পয়ারে গল্প ভিন্ন অপর রসাদির বর্ণনা যে খুব কম, তাহা অসংখ্য প্রাচীন পুঁথির দ্বারা প্রমাণ করা যাইতে পারে। এ কথা সত্য যে অনেক কবি "পয়ারে" বিবিধ রাগরাগিণী সংযুক্ত করিয়া গিয়াছেন। তবে এখানে একটা কথা জিজ্ঞাস্য হইতে পারে যে, বঙ্গভাষায় গল্প বা চিত্রবাচক এত শব্দ থাকিতে পারস্যভাষার দ্বারস্থ হইতে হইল কেন? কেন যে হইল, সে বিষয়ের মীমাংসা সহজ না হইলেও তাহারও একটা কৈফিয়ৎ দেওয়া যাইতে পারে না এমন নয়! ইত্যাদি ইত্যাদি। * * * * * * * * বলিতে ভুলিয়াছি পারসীতে "পয়কার" ও "পয়গার" বলিয়া আরো দুইটী শব্দ আছে; "পয়কার" লড়াই এবং "পয়গার"ও লড়াই, এরেদা বা ইচ্ছা। "পয়কর" শব্দের অর্থ পারস্যাভিধানে "সফল" ও জিসিম্" বলিয়া লিখিত আছে।"

শ্রীযুক্ত আবদুল করিম মহোদয়ের উক্ত অনুমান চতুষ্টয় ভাষাতত্ত্ব হিসাবে অমূল্য হইলেও ইতিহাসের কষ্টিপাথরে টিকিবে কি না সন্দেহ এবং তাহা যথাস্থানে আলোচিত হইবে।

এ সম্বন্ধে আমার ক্ষুদ্র বুদ্ধির চেষ্টায় যতদূর অবগত হওয়া সম্ভব, তদ্বিষয় "বঙ্গীয় সাহিত্য

পরিষদে"র সাহিত্য-সেবী সদস্যবৃন্দের নিকট উপস্থিত করিবার পূর্ব্বে উক্ত পরলোকগত পণ্ডিত রামগতি ন্যায়রত্ন ও মনস্বী ৺বঙ্কিমচন্দ্র এই উভয় মহোদয়ের মতামত এস্থলে উদ্ধৃত করিলাম। ন্যায়রত্ন মহাশয় বলিতেছেন "কেহ কেহ বলেন বাঙ্গালার বর্ত্তমান "পয়ার" সংস্কৃত কোন ছন্দের অনুরূপ নহে, উহা পারসীর "বয়েৎ" নামক ছন্দের অনুকারক। একটি "বয়েৎ" উদ্ধৃত হইল—

"করমা ববথ্ সায় বরহালমা।
কে হাস্তেম আসিরে কমন্দে হাওয়া॥" (পন্দনামা)

দেখ, এই শ্লোক ত্রয়োদশাক্ষরে পরিমিত, ইহার পূর্ব্বার্দ্ধে অষ্টাক্ষরের পর যতি আছে বটে, কিন্তু পরার্দ্ধে সপ্তাক্ষরের পর ; পূর্ব্বার্দ্ধের যতির পর ৫টী অক্ষর এবং পরার্দ্ধের যতির পর ৬টী অক্ষর অবশিষ্ট থাকে এবং কর্ণেও পয়ারের সহিত একরূপতা বোধ হয় না"। মনস্বী বঙ্কিমচন্দ্র, ন্যায়রত্ন মহাশয়ের উক্ত মতের পোষকতা করিয়া বলিতেছেন "পয়ারের সহিত ইহার কিঞ্চিন্মাত্রও সাদৃশ্য নাই ; উপরে এক ছত্র ও নীচে এক ছত্র ইহাতেই যে কিছু সাদৃশ্য হউক, ছন্দোগত কোন সাদৃশ্য নাই।" তিনি আরও বলিয়াছেন পূর্ব্বোক্ত বয়েৎ লঘুগুরু ভেদাত্মক ছন্দ। পয়ার আধুনিক ছন্দ। না মাত্রাবৃত্তি না অক্ষরবৃত্তি। বঙ্কিম বাবুর মতে উক্ত বয়েৎ কিন্তু সংস্কৃত ভুজঙ্গপ্রয়াত ছন্দের অনুরূপ" এবং তজ্জন্য তিনি বিশেষভাবে বুঝাইতে চেষ্টা করিয়াছেন। ন্যায়রত্ন মহাশয়ের মতে "সংস্কৃত যে ছন্দের সহিত পয়ারের কতক সাদৃশ্য আছে তাহাকেই উহার মূল বলা সঙ্গত"। বঙ্কিমবাবু কিন্তু ঐ মত স্বীকার করেন নাই। পারসী ভাষা হইতে যে পয়ারের উৎপত্তি স্পষ্টতঃ একথাও যেমন তিনি স্বীকার করেন নাই, সংস্কৃতকেও তেমনি পয়ারের উৎপত্তিস্থান বলিতে কুণ্ঠিত হইয়াছেন। উপরি উক্ত পারসী বয়েৎ ঠিক পয়ারের অনুরূপ না হইলেও বিশ্ববিশ্রুত পারসী কবি "সাদী" বিরচিত নিম্নলিখিত কবিতাটি কিন্তু বাঙ্গালা পয়ার ছন্দের অনুরূপ বলিয়া বোধ হয় :—

"বনী আদম আজায় য়ক দীগরন্দ।
কেদর আক রীনশ জীরক জোহরন্দ॥
চু অজবে যদরদ ওরদ রোজগার।
দিগর অজব হারান্ মানদ কয়ার্॥
তুগর মেহনাত দীগরাঁ বেগমী।
ন শারদ কেনামৎ নেহন্দ আদমী॥"

ন্যায়রত্ন মহাশয়ের উক্ত বয়েৎ সম্বন্ধে যিনি যে আপত্তিই উত্থাপিত করুন না কেন, সাদী কবির উক্ত কবিতা সম্বন্ধে কিন্তু কোন আপত্তিই প্রযুজ্য হইতে পারে না। অধিকন্তু উহার সহিত প্রাচীন বাঙ্গালা পয়ার ছন্দের বিলক্ষণ সাদৃশ্য দৃষ্ট হয়। আধুনিক চতুর্দ্দশ অক্ষরে পরিমিত পয়ারের সহিত ইহার অক্ষরগত সাদৃশ্য না হউক এবং ইহার মাত্রাও আধুনিক পয়ার ছন্দের অনুরূপ না হইলেও প্রাচীন বাঙ্গালা পয়ারের সহিত কি মাত্রা কি অক্ষর এই উভয়

কৃত্তির সহিত ইহার বিলক্ষণ সাদৃশ্য আছে বলিয়া বোধ হয়। কৃত্তিবাসাদি প্রাচীন কবিগণের কবিতা যাহা হস্তলিখিত প্রাচীন পুঁথি প্রভৃতিতে দৃষ্ট হয়, তাহা পাঠে উক্ত সাদী কবির কবিতার সহিত অনেক বিষয়ে সাদৃশ্য আছে বলিয়া বোধ হয়। এরূপ সাদৃশ্য সত্ত্বেও আমরা কিন্তু উক্ত পারসী কবিতাকে বাঙ্গালা পয়ার ছন্দের উৎপত্তিস্থান বলিয়া স্বীকার করিতে পারি না; কেন না পূর্ব্বেই বলিয়াছি ইতিহাস ইহার অন্তরায়। আরও এক কথা এতদ্দেশে সাদী কবির কবিতা প্রসিদ্ধি লাভ করিবার বহুপূর্ব্বে* অর্থাৎ এদেশে পারসী ভাষা প্রচলনের বহুপূর্ব্বেই বঙ্গসাহিত্যের সূত্রপাত হইয়াছিল এবং বঙ্গসাহিত্যের সূত্রপাতের সঙ্গে সঙ্গে পয়ার ছন্দেরও আবির্ভাব দেখিতে পাওয়া যায়। পারসী ভাষা হইতে যে বাঙ্গালা পয়ার ছন্দের উৎপত্তি হওয়া সম্ভব নয়, তাহা মনস্বী বঙ্কিমচন্দ্র ঐতিহাসিক যুক্তিবলে অতি সুন্দররূপে তাঁহার অপূর্ব্ব ভাষায় বুঝাইয়াছেন। তিনি বলিয়াছেন "মুসলমানেরা ১২০৩ খৃঃঅঃ বঙ্গ জয় করেন। বঙ্গভাষায় বহুদিন পর্য্যন্ত কোন পরিবর্ত্তন করিতে পারেন নাই। কিন্তু বঙ্গভাষা যখন চৈতন্যদেবের ভক্তিবাহিনীতে নিজ তরণী সাজাইয়া একদিকে স্রোতোমুখে যাত্রা করিবার উদ্যোগ করিতেছিল, সেই সময়েই পারসী ভাষা আসিয়া সেই তরণীতে আপনার কতকগুলি কায়দা কতকগুলি রীতি শত শত শব্দ আনিয়া তুলিয়া দিল। ভাষা সেই বৈদেশিক গুরু ভারে আস্তে আস্তে চলিতে লাগিল। পারসী ভাষা ক্রমেই বোঝাই চাপাইতে লাগিল। এইরূপ ক্রমাগত দেড় শত কি দুই শত হইতে প্রায় সাড়ে তিনশ বর্ষ পারসী কেবল রাজদরবারের ভাষা ছিল। পরে তাঁহার (আকবরের) মহাচিহ্ন হিন্দু মুসলমানে এক করিবার কল্পনা করেন। এই চেষ্টায় অনেক গুলি ফলের মধ্যে "উর্দ্দু ভাষা" একটী ফল। * * * * বিখ্যাত হিন্দু রাজা তোড়রমল্ল আকবর সাহের রাজস্ব সচিব ছিলেন। * * * * রাজা তোড়র মল্ল হিন্দুজাতির কারণ জানিতে পারিয়া কিসে সকলে পারসী শিখেন তাহারই চেষ্টা করিলেন। তিনি রাজস্ব সচিব; তিনি তদীয় বিভাগে ১৫৭৬ অব্দে এই নিয়ম করিলেন যে সাম্রাজ্যের সমস্ত প্রদেশেই হিসাব ও বন্দোবস্তী কাগজ পত্র এবং অন্যান্য তাবৎ বিষয়ের নিরূপণ পত্র পারসীতে রাখিতে হইবে'। উক্ত ঐতিহাসিক তথ্য হইতে আমরা এই অংশ বুঝিলাম যে রাজা তোড়র মল্লের বিধি প্রচারিত হইবার পর হইতে এতদ্দেশীয় ভাষাসমূহে পারসী শব্দ প্রবেশলাভ করিতে থাকে। ইহার পূর্ব্বে এতদ্দেশীয়গণ পারসী ভাষা আলোচনা করিতেন কি না সন্দেহ। দুই একজন নবাব সরকারে কার্য্য উপলক্ষে পারসী শিখিয়া থাকিলে তাহা শিক্ষার মধ্যে গণ্যই নহে। আরও এক কথা, এখনকার ইংরাজি যেমন রাজভাষা তখনকার পারসী ভাষাও রাজভাষার সামিল ছিল, সুতরাং উদরান্নের ভাষা বলিয়া লোকে পেটের দায়ে মৌলবীর নিকট পারসী ভাষা (আদালতী ভাষা) শিখিত। এইরূপে যে কোন অর্থকরী ভাষা সাধারণ শিক্ষার সহিত সংশ্লিষ্ট না হইলে কোন

---

* আমরা এই প্রবন্ধে প্রাচীন কবিদিগের সময় নিরূপণ সম্বন্ধে কোন তর্কের অবতারণা না করিয়া মাঝামাঝি একটা সময় প্রবন্ধোক্ত বিষয়ের পৌর্ব্বাপর্য্য কাল ধরিয়া লইয়াছি।—লেখক।

ভাষাই তাহাকে গ্রহণ করিতে রাজী হইবে না। যে ভাষা যতদিন পর্য্যন্ত না অন্য ভাষাভাষীর সহানুভূতি প্রাপ্ত হয়, ততদিন সে ভাষা ঐ সকল ভাষাভাষীর সাহিত্য মধ্যে কখনই প্রবেশ লাভ করিতে পারে না। অতএব আকবরের সময়ের পূর্ব্ববর্ত্তী প্রচলিত পারসী ভাষা হইতে যে কোনরূপে হউক পয়ার শব্দের উদ্ভব হইলে তাহার পূর্ব্বে রচিত রতিদেবের মৃগলুব্ধ কাব্যে "পয়ার" শব্দের উল্লেখ কোথা হইতে আসিল? পারসী ভাষা হইতে যে পয়ার শব্দ বা ছন্দের উৎপত্তি হয় নাই, তাহা মুসলমানদিগের মধ্যে প্রাচীন বাঙ্গালা কবি আলাওলের কবিতা হইতে প্রমাণীকৃত হইতেছে। কবি "আলাওল" সপ্তদশ শতাব্দীর কবি। ইহার পূর্ব্বে একমাত্র মুসলমান কবি দৌলত গাজি ষোড়শ শতাব্দীতে বর্ত্তমান ছিলেন। ‡ সৈয়দ আলাওল সাহেব তাঁহার রচিত 'শেকেন্দর নামা'* নামক প্রাচীন বাঙ্গালা পুঁথির এক স্থানে বলিতেছেন :—

"স্থির করি আমারে করিল অঙ্গীকার।
ভাঙ্গিয়া "বয়েত" ছন্দ রচিতে 'পয়ার' ॥"

ইহার শেষ চরণের অর্থাৎ 'ভাঙ্গিয়া বয়েৎ ছন্দ রচিতে পয়ার' এই পদের অর্থ কি? ইহার অর্থ কি পারসী বয়েত ভাঙ্গিয়া বাঙ্গালা পয়ার ছন্দ রচনা নহে? তাহা হইলে "বয়েত ভাঙ্গিয়া পয়ার রচনা"র অর্থ কি? বয়েত ছন্দকে বাঙ্গালা অক্ষরে পরিণত (অক্ষরান্তর) করণ (Transliteration) বুঝিব? না বাঙ্গালা পয়ার ছন্দের অনুবাদ (ভাষান্তর) করণ (Translation) বুঝিব? কোন্‌টা ঠিক? আমাদের বিবেচনায় "বয়েত ভাঙ্গিয়া পয়ার' ছন্দ রচনা করা অনুবাদ (ভাষান্তর) অর্থেই প্রযুক্ত হইয়াছে। যদিও সৈয়দ আলাওলের 'শেকেন্দর নামা' নামক প্রাচীন বাঙ্গালা পুঁথি প্রাচীন পারস্য মহাকবি নেজামী রচিত 'শেকেন্দর নামা'র ঠিক অনুবাদ নহে—ছায়া অবলম্বনে রচিত; তথাপি তাঁহার "বয়েত ভাঙ্গিয়া পয়ার রচনা' আমরা অনুবাদ অর্থেই ধরিয়া লইলাম। ইহা দ্বারাও বুঝা যাইতেছে যে, বয়েত ছন্দ এবং পয়ার (পয়ার ছন্দ) উভয়ই স্বতন্ত্র জিনিস। অন্ততঃ সে সময় স্বতন্ত্র নামে ব্যবহৃত হইতেছিল।

আর বন্ধুবর আবদুল করিম মহাশয়ও আমাকে উক্ত পত্রের একস্থানে লিখিতেছেন যে "পারস্যাভিধানে 'পয়ার' বলিয়া কোন শব্দই নাই। এই কারণে আমাদের মনে হয় যে, পারসী ভাষা হইতে "পয়ার" শব্দ ও ছন্দ উভয়েরই উৎপত্তি হওয়া সম্ভবপর নহে। তবে এইমাত্র বলা যায় যে, পারসী ভাষার শব্দ ও ছন্দের কায়দা সংযুক্ত হইয়া বাঙ্গালা ভাষা ও বাঙ্গালা সাহিত্যের পরিপুষ্টির পক্ষে যথেষ্ট সহায়তা করিয়া থাকিবে।

† 'পরিষৎ-পত্রিকা' ৯ম অতিরিক্ত সংখ্যা ২৮ পৃঃ।

‡ 'পরিষৎ-পত্রিকা' ৯ম অতিরিক্ত সংখ্যা ৫১ পৃঃ।

* পরিষৎ-পত্রিকা ১০ম ৩।৪ সং ৭৪ পৃঃ পুঁথি নং ১০২ দেখ।

ভারতীয় ভাষা-নিচয়ের মধ্যে যে কয়টি ভাষার* সহিত বঙ্গভাষার ঘনিষ্ঠতা জন্মিয়াছে তন্মধ্যে আরবী, উর্দ্দু, হিন্দী, উৎকলী, আসামী, মারাট্টা এবং গুজরাটী এইগুলি প্রধান। এই সকল ভাষার আদান প্রদানে বঙ্গভাষা ক্রমশঃ পরিপুষ্ট হইয়াছে। উর্দ্দু ভাষা আকবরের সময়ে উৎপন্ন, সুতরাং তাহার বিষয় এস্থলে উল্লেখযোগ্য নয়। আরবী প্রভৃতি ভাষা মুসলমান-শাসন-কালে এদেশে প্রবেশ লাভ করে, কিন্তু বঙ্গভাষা তথা পয়ার ছন্দ তৎপূর্ব্বেই প্রাচীন বঙ্গসাহিত্য-ক্ষেত্রে অঙ্কুরিত হইয়াছিল। উৎকল বঙ্গভাষার পরবর্ত্তী ভাষা ;আসামীও তদ্রূপ। মারাট্টা বঙ্গ-ভাষার পরবর্ত্তী না হইলেও উহার সহিত যখন বঙ্গের সম্বন্ধ প্রতিষ্ঠিত হয় সেই "বর্গীর হাঙ্গামার" দিন হইতেই উহার সহিত বঙ্গভাষার আদান প্রদান হইতে থাকে, কিন্তু তৎপূর্ব্বেই পয়ার ছন্দ বঙ্গসাহিত্যে অধিক পরিমাণে প্রচলিত হইয়াছিল। হিন্দী বঙ্গভাষার প্রায় সমসাময়িক হইলেও উহার সাহিত্য বঙ্গসাহিত্যের অনেক পরে প্রচারিত হয়, সুতরাং তাহার নিকট সহজে ঋণগ্রহণ করিতে বঙ্গভাষা কখনই স্বীকার করিবে না। বিশেষতঃ হিন্দীতে মিত্রাক্ষর ছন্দ থাকিলেও ঠিক পয়ার ছন্দ বলিয়া কোন ছন্দের অস্তিত্বই নাই। তবে সত্যের অনুরোধে বলিতে হইবে যে, এই সকল ভাষা হইতে পয়ার ছন্দের উৎপত্তি না হইলেও ইহাদের সংস্রবে পয়ার ছন্দের সৌষ্ঠব সাধন হইয়াছে।

কিন্তু জিজ্ঞাস্য, প্রথমে কোন্ ভাষার নিকট পয়ার-রূপ ঋণ গ্রহণ করিয়া বঙ্গভাষা সাহিত্য-ধনে ধনী হইয়াছে ? এমন সৌভাগ্যশালী ভাষামহাজন কে ? অবশ্যই পয়ার ছন্দ স্বয়ম্ভূ বা ভূঁইফোড় নহে ! অবশ্যই ইহা প্রথমে কোন ভাষা-নিঝরিণী হইতে প্রথমে মন্দ মন্দ প্রবাহিত হইয়া পরিশেষে পরম পুণ্যতোয়া ভাগীরথীর ন্যায় বঙ্গসাহিত্যের হৃদয়ক্ষেত্র প্লাবিত করিয়া ইহাকে উর্ব্বর করিয়াছে। তবে বলিতে পারেন এ রত্নগর্ভা কে ? আমরা পৃথিবীর শীর্ষস্থানীয় দেব-ভাষা সংস্কৃতকে সমগ্র ভাষাসমূহের ন্যায় ইহারও (পয়ার ছন্দেরও) জন্মদাতা বলিয়া অভিহিত করিতে পারি; কিন্তু কেবল নামেই জন্মদাতা ; লালন-পালনের ভার অন্যে গ্রহণ করিয়াছিল। যাহা হউক, সংস্কৃতের কোন ছন্দের সহিত বাঙ্গালা পয়ার ছন্দের কোন সাদৃশ্য আছে কি না তাহা জানিবার জন্য কোন সংস্কৃতজ্ঞ পণ্ডিতের সাহায্য গ্রহণ বিধেয় বিধায় আমাদের পরিষদের লব্ধ-প্রতিষ্ঠ সদস্য পণ্ডিত শ্রীযুক্ত শরৎচন্দ্র শাস্ত্রী মহাশয়কে এ সম্বন্ধে কতিপয় প্রশ্ন লিখিয়া পাঠাইয়া-ছিলাম। উত্তরে তিনি এইরূপ লিখিয়াছেন "আমি অনুসন্ধান দ্বারা যতদূর জানিতে পারিলাম তাহাতে পয়ার শব্দটি সংস্কৃত অথবা প্রাকৃতমূলক বলিয়া বোধ হইল না।......আমি অনেক সংস্কৃত ছন্দের সহিত মিলাইয়া দেখিলাম, এক অনুষ্টুপ্ ছন্দ ব্যতীত আর কাহারও সহিত ইহার বিশেষ কোন সৌসাদৃশ্য অনুভব করিতে পারিলাম না ! অনুষ্টুপ্ ছন্দে অক্ষরসংখ্যা প্রত্যেক চরণে আটটী, কিন্তু পয়ার ছন্দের প্রত্যেক চরণে চৌদ্দটী। এই অক্ষর-সংখ্যার ন্যূনাতিরেক থাকিলেও লঘুগুরু সম্বন্ধে বিচার করিয়া দেখিলে অনেকাংশে

* এস্থলে এই সকল ভাষার "সাহিত্য" বলিয়া বুঝিতে হইবে।

সমান বলিয়া বোধ হয় ইত্যাদি ইত্যাদি।" সংস্কৃত অনুষ্টুপ ছন্দ যে কালক্রমে বাঙ্গালা ভাষায় পয়ার ছন্দ নাম ধারণ করিয়াছে, তাহা আমরা স্বীকার করিতে পারি না; কেননা অনুষ্টুপের সহিত পয়ারের না অক্ষরগত না মাত্রাগত, কোন সৌসাদৃশ্যই দেখিতে পাওয়া যায় না। পক্ষান্তরে সংস্কৃত ছন্দসমূহের প্রকৃতির আলোচনা করিলে আমরা দেখিতে পাই, উহারা এক হিসাবে অমিত্রাক্ষর আর এক হিসাবে মিত্রাক্ষর। অমিত্রাক্ষর ছন্দ বলিলেই যেন মিল্টনী আদর্শে মাইকেলী ছন্দ মনে পড়ে; বস্তুতঃ তাহা নহে। উক্ত সংস্কৃত ছন্দসমূহ মিত্রাক্ষরের শৃঙ্খলা ও যতি হইতে বিভিন্ন এবং উহাদের প্রতিচরণের শেষ শব্দ বা অক্ষরেরও পরস্পর মিল নাই। পক্ষান্তরে বাঙ্গালা পয়ারছন্দে মিত্রাক্ষরের শৃঙ্খলা ও যতি এবং উহার প্রতিচরণের শেষ শব্দ বা অক্ষরের পরস্পর মিল বর্ত্তমান। সংস্কৃত ও বাঙ্গালায় প্রভেদ এই।

সংস্কৃত ছন্দসমূহের মধ্যে "চতুর্দ্দশাক্ষরাবৃত্তি" নামে একটি ছন্দ দৃষ্ট হয়। অনেকে এই "চতুর্দ্দশাক্ষরা" নাম শুনিয়াই ইহাকে বাঙ্গালা চতুর্দ্দশাক্ষর পরিমিত পয়ারছন্দের উৎপত্তিস্থান বলিয়া স্থির করিতে পারেন, কিন্তু ইহার যতি প্রভৃতির নানা নিয়ম দেখিলে ইহাকে বাঙ্গালা পয়ারের উৎপত্তিস্থান বলা যায় না। এই চতুর্দ্দশাক্ষরাবৃত্তি আবার অনদ্ধাদা, বসন্ততিলক, অপরাজিতা, প্রহরণ, কলিকা, বাসন্তী, লোলো ও নান্দীমুখী প্রভৃতি পর্য্যায়ে বিভক্ত। অনেকে ইহাদের মধ্যে "বসন্ততিলক" ছন্দকে বাঙ্গালা পয়ারছন্দের সহিত সাদৃশ্য দেখান। কিন্তু ইহারও যতি ৫।৯, ৮।৯ এবং ৭।৭ প্রভৃতি নিয়মে গ্রথিত। বাঙ্গালা পয়ারের যতি-সংস্থাপনের নিয়মের সহিত সর্ব্বাংশেই বিভিন্ন। হইতে পারে কালক্রমে এই বসন্ততিলক ছন্দ বাঙ্গালা পয়ারছন্দে পরিণত হইয়াছে। ইহার সহিত পয়ারের অক্ষর বা মাত্রাগত যে প্রভেদ তাহা কালক্রমে বিদূরিত হইয়া হয় ত বাঙ্গালা পয়ারছন্দে পরিণত হইয়াছে; কিন্তু এ সম্বন্ধে বিশেষ প্রমাণ প্রয়োগ দ্বারা বুঝান অসম্ভব। এক্ষণে পয়ার ছন্দের উৎপত্তি সম্বন্ধে আপাততঃ আর অধিক আলোচনা না করিয়া ইহার ব্যুৎপত্তি সম্বন্ধে কিঞ্চিৎ আলোচনা করা যাইতেছে; কেননা পয়ার শব্দের ব্যুৎপত্তির নির্ণয় হইলে ইহার ছন্দেরও সন্ধান হইতে পারে। কিন্তু "পয়ার-শব্দ" যখন সংস্কৃতমূলক নহে, তখন প্রচলিত ব্যাকরণ অথবা অভিধানে ইহার ব্যুৎপত্তি সম্বন্ধে কোন উল্লেখই দৃষ্ট হয় না। প্রচলিত অভিধান-সঙ্কলনকর্ত্তারা সংস্কৃত নিদানে ইহার ব্যুৎপত্তির কোন বিধান না পাইয়া অবশেষে "অসারে জলসার্" ব্যবস্থার ন্যায় ইহাকে "দেশজ" শ্রেণীভুক্ত করিয়া ক্ষান্ত হইয়াছেন। "দেশজ" শব্দের অর্থ কি? ইহার কি কোন মূল নাই? বন্ধুবর আবদুল করিম মহাশয় পূর্ব্বোক্ত পত্রে লিখিয়াছেন "প্রচলিত অভিধানাদিতে"পয়ার যে "দেশজ" বলিয়া উল্লিখিত হইয়াছে, তাহা দেখিয়াছি। কর্ত্তাদিগকে জিজ্ঞাসা করিতে ইচ্ছা হয় যে, উহা কোন্ "দেশজ"?—স্বর্গের না মর্ত্ত্যের? আমার মতে ঐরূপ লিখিয়া কোষকারেরা কেবল গোঁজা-মিল করিয়া গিয়াছেন মাত্র। "দেশজ" শব্দের মূল নাই, এ ধারণা ঠিক নহে"। "দেশজ" শব্দের অর্থ দেশপ্রচলিত বা দেশজাত; এই অর্থে পয়ার শব্দকে "দেশজ" বলিতে আবদুল করিম মহাশয় আপত্তি করিয়াছেন।

যাহা হউক "পয়ার" যখন সংস্কৃত" শব্দ নহে অথবা আরবী ফার্সী ও ভারতীয় অন্যান্য ভাষার কোন ভাষা হইতে উৎপন্ন নহে, তখন ইহা কোথা হইতে আসিল?" "ছন্দঃকুসুম" নামক ছন্দোবিষয়ক পুস্তকে "পয়ার" শব্দ (ছন্দ) "প্রাকৃত" বলিয়া নির্দ্দেশিত হইয়াছে যথা :—

"পাঁচালী নাম বিখ্যাতা সাধারণ মনোরমা।
পয়ার ত্রিপদী আদি প্রাকৃতে হয় চালনা॥
দ্বিপদে শ্লোক সম্পূর্ণ তুল্য সংখ্যার অক্ষরে।
পাঠে দুই পাদমাত্র শেষ অক্ষর সদা মিলে॥"

"ছন্দঃকুসুম" আধুনিক গ্রন্থ; সুতরাং উহাকে প্রামাণিক বলিয়া গ্রহণ করা যায় না। কিন্তু ইহার বহুপূর্ব্বে অর্থাৎ ১১৩৮ সনে লিখিত কায়স্থ কবি রামচন্দ্র খাঁন কৃত "অশ্বমেধপর্ব্ব" নামক প্রাচীন পুঁথির শেষে এইরূপ পাঠ দৃষ্ট হয় যথা :—

"সপ্তদশ পর্ব্ব কথা সংস্কৃত বন্দ
মূর্খ বুঝাইতে কৈল প্রাকৃতের ছন্দ।"

* * * * মালোক্য প্রকৃত যথা প্রচার "সামান্য লোকবোধ কৃত ছন্দ। অশ্বমেধকথা সমাপ্ত" মহামেদসুপামকছন্দ"*। ৬ষ্ঠ খণ্ড "পরিষৎপত্রিকা"র ৬৪ পৃঃ উক্ত পুঁথির সংক্ষিপ্ত বিবরণ পাঠে দেখা গেল যে "মূর্খ বুঝাইতে" প্রভৃতির স্থলে "মূর্খ বুঝাবারে কৈল পরাকৃত ছন্দ" লেখা আছে। আর গদ্যাংশের "মালোক্যপ্রকৃত যথা" প্রভৃতির স্থানে "পত্রিকা"য় "শ্রীকান্তপুরাণমালোক্য প্রাকৃত কথা প্রচার সামান্যলোকবোধয়েৎ" লেখা আছে। ইহার দ্বারা স্পষ্ট বুঝা যাইতেছে যে এই প্রকৃতছন্দ (?) অথবা পরাকৃতছন্দ সম্ভবতঃ প্রাকৃতছন্দ অর্থাৎ পয়ারকেই বুঝাইতেছে। কেননা পয়ার তখনকার বঙ্গদেশের সর্ব্বজনবোধ্য ভাষা; এই কারণে বোধ হয় কবি রামচন্দ্র খাঁন পয়ারছন্দকে "সামান্যলোকবোধকৃতছন্দ" বলিয়া অভিহিত করিয়াছেন। যাহা হউক, আমাদের এরূপ অনুমানের একটা কারণও নির্দ্দেশ করিতে পারা যায়। তখনকার পণ্ডিতনামধারী সংস্কৃতজ্ঞ ব্রাহ্মণসম্প্রদায় সংস্কৃত পড়িতেন, সংস্কৃতভাষায় কথাবার্ত্তা কহিতেন এবং পুস্তকাদি লিখিতে হইলে সংস্কৃত ভাষাতেই লিখিতেন; কিন্তু অশিক্ষিত সাধারণ জনগণের শিক্ষার জন্য তাঁহারা কোন উপায়ই অবলম্বন করিতেন না। তখনকার সাধারণ লোকদিগের ভাষা তৎকাল-প্রচলিত কথিত ভাষা (সম্ভবতঃ গৌড়ীয়প্রাকৃত) প্রচলিত ছিল; সুতরাং সাধারণ লোকশিক্ষার জন্য কোন কিছু লিখিতে গেলে তখনকার কবিগণ গৌড়ীয় সাধুভাষায় তাহা ব্যক্ত করিতেন। উক্ত গৌড়ীয় সাধুভাষার তখনকার সংস্কৃত (বিশুদ্ধ) নাম বোধ হয় "সামান্যলোকবোধকৃতছন্দ" ছিল, সাধারণে বোধ হয় "পয়ার" বলিত। তাহা হইলে পয়ারছন্দ যে প্রাকৃতমূলক এতদ্দ্বারা তাহারও প্রমাণ হইতেছে; কিন্তু "পয়ার" শব্দের মূল কোথায়? এবং ইহা কোন্ সময়ে বাঙ্গালাভাষায় প্রবেশ লাভ করিয়াছে? পূর্ব্বে উক্ত

* প্রদীপ—মাঘ ও ফাল্গুন ১৩১০ সাল "রামচন্দ্র খানকৃত অশ্বমেধপর্ব্ব" প্রবন্ধ।

হইয়াছে যে, এ পর্য্যন্ত যত দিনের বাঙ্গালা পুঁথি পাওয়া গিয়াছে, ততদিনের বাঙ্গালা পুঁথিতেই "পয়ার" শব্দের ব্যবহার দৃষ্ট হয়; কিন্তু উক্ত পয়ার শব্দ ছন্দজ্ঞাপক হইল কেন? প্রাকৃত-ভাষার কোন প্রামাণিক পুস্তকে ইহার কোন উল্লেখ আছে কি না? ৯৭২ খৃঃ অঃ প্রচারিত "পাইলাচ্ছী নামমালা" (পৈশাচিকী নামমালা) নামক "প্রাকৃতকোষে" "পয়ার" শব্দের ন্যায় তিনটী শব্দ দৃষ্ট হয়, যথা—"পয়রো", "পয়ারিয়ং" এবং "পয়োরো"। মালবনিবাসী "ধনপৎ" নামক জনৈক পণ্ডিত উহার সঙ্কলনকর্ত্তা এবং সুপ্রসিদ্ধ ভাষাতত্ত্ববিদ্ বুলার (Buhler) সাহেব উপরোক্ত অভিধান সঙ্কলনকালে ঐ শব্দত্রয়ের এইরূপ অর্থ করিয়াছেন, যথা:—পয়রো = প্রকর Heap, quantity; পয়ারিয়ং = প্রতারিত Cheated; পয়োরো = প্রাকার Rampart*। ইহারদ্বারা বেশ বুঝা যাইতেছে যে খৃষ্টীয় দশমশতাব্দীতে বিরচিত প্রাকৃত-ভাষার অভিধানে পয়ারশব্দের কোন অস্তিত্বই নাই; অধিকন্তু উক্ত শব্দত্রয় ছন্দসম্বন্ধে কোন অর্থই প্রকাশ করিতেছে না। পরবর্ত্তী সময়ের কোন প্রাকৃতভাষার অভিধানে অথবা অন্য কোন প্রাদেশিক ভাষায় "পয়ার" শব্দের কোন কথা আছে কি না, তাহা জানি না। তবে ছন্দজ্ঞাপক "পয়ার" শব্দ কোথা হইতে আসিল? এবং এই ছন্দের নাম পয়ার কেন হইল?

আমাদের মনে হয় "পয়ার" নামে এই আদিগঙ্গা আজন্ম কাল হইতে বঙ্গসাহিত্যের আদিপ্রবাহরূপে প্রবাহিত হইতেছে; কিন্তু ইহার (পয়ার শব্দের) উৎপত্তি স্থান যে প্রাকৃতভাষা তাহাতে আর সন্দেহ নাই। এক্ষণে "পয়ার" শব্দের ব্যুৎপত্তিগত অর্থ লইয়া বিচার করিলে আমাদের বক্তব্য পরিস্ফুট হইবে। সংস্কৃতের "পদ" শব্দ ও প্রাকৃতের "পয়" শব্দ বোধ হয় একার্থবাচক। এ সম্বন্ধে আবদুল করিম মহাশয় আমার উক্ত পত্রের একস্থানে লিখিয়াছেন, "৺পণ্ডিত রামগতি ন্যায়রত্ন মহাশয় উহা (পয়ার) পাদ (চরণ) হইতে আসিয়াছে বলিয়া অনুমান করিয়াছেন। বিজ্ঞবর দীনেশ বাবুও উক্ত মতই গ্রহণীয় বলিতে চাহেন; কিন্তু বিপরীত মতস্থাপনে অপারগ হইলেও তাঁহাদের এ সিদ্ধান্তের সমীচীনতায় আমার ঘোর সন্দেহ আছে। পাদ হইতে "পয়ার" আসিল কিরূপে এবং কেন তাহা বুঝা দুষ্কর। পাদ হইতে পাও আসিয়াছে এ কথা ঠিক"। আমাদের বিবেচনায় "পয় (পদ) আছে যাহার" এই অর্থে "র" প্রত্যয় করিয়া "পয়ার" শব্দ নিষ্পন্ন হইয়াছে। আমাদের এ অনুমানের হেতু এই। হিন্দীভাষার "চৌপাই" প্রভৃতি শব্দের "পাই" শব্দও বোধ হয় প্রাকৃত "পয়" শব্দজাত। হিন্দী কবি তুলসীদাসের কবিতায় যে "চৌ পাই" ছন্দ ব্যবহৃত হইয়াছে, তাহাও প্রাকৃতভাষা হইতে গৃহীত; কেননা তাঁহার বহুপূর্ব্ববর্ত্তী পিঙ্গলাচার্য্য-সঙ্কলিত "প্রাকৃতপৈঙ্গল" ("প্রাকৃতপিঙ্গল") নামক প্রাকৃতভাষার ছন্দবিষয়ক পুস্তকে আমরা "চৌপৈয়া" নামে একটী ছন্দ দেখিতে পাই। আমাদের বোধ হয় প্রাকৃতভাষার "চৌপৈয়া"

---

* কৃতজ্ঞহৃদয়ে স্বীকার করিতেছি যে পরিষদের পরমশ্রদ্ধাস্পদ সদস্য পণ্ডিত শ্রীযুক্ত সতীশচন্দ্র বিদ্যাভূষণ এম, এ মহোদয় উক্ত প্রাকৃতকোষকথিত শব্দত্রয় আমাকে সংগ্রহ করিয়া দিয়াছেন।

হইতে হিন্দী "চৌপাই" ও ঐ "চৌপৈয়া" শব্দের "পৈয়া" শব্দ হইতে বাঙ্গালা "পয়ার" শব্দ উদ্ভূত হইয়া থাকিবে। প্রাকৃতের "চৌপৈয়া" হিন্দীর "চৌপাই"তে পরিণত হইয়াছে এবং বাঙ্গালায়ও চৌপদী নামে অভিহিত হইয়াছে। আর "চতুষ্পাঠী"ও যে সেই বাঙ্গালা "চৌপদী"র সংস্কৃত সংস্করণ তাহাতে আর কোন সন্দেহ নাই। এতদ্দ্বারা আরও একটি কথার মীমাংসা হইতেছে যে সংস্কৃত "পদ" বা "পদী" শব্দ প্রাকৃতের "পৈয়া" (পয়) অথবা হিন্দীর "পাই" শব্দ প্রভৃতি একার্থবাচক। তাহা হইলে প্রাকৃতের "চৌপৈয়া" শব্দের "পৈয়া" শব্দে অস্ত্যর্থে ("আছে এই অর্থে") "র" প্রত্যয় দ্বারা যদি প্রাকৃত "পৈয়ার" আর বাঙ্গালায় "পয়ার" এইরূপ শব্দ নিষ্পন্ন করা যায়, তাহা হইলে আমাদের অনুমানের সমীচীনতায় আর সন্দেহ থাকে না এবং উহা ব্যাকরণানুসারে সিদ্ধ হইল বলিয়া বোধ হয়*। এক্ষণে প্রশ্ন হইতে পারে যে, "পদ আছে যাহার" এই অর্থে "র" প্রত্যয় দ্বারা যদি পয়ার শব্দ সাধিত হইয়া থাকে, তাহা হইলে যাবতীয় ছন্দগুলিকে "পয়ার" বলা হয় না কেন এবং ছন্দবিশেষকে (চতুর্দ্দশ অক্ষর পরিমিত ছন্দকে) পয়ার বলা হয় কেন? ছন্দমাত্রেই তো পদবিশিষ্ট? ইহার উত্তরে এইমাত্র বলা যায় যে, বঙ্গভাষার আদিস্তরের কবিতামাত্রেই গীত উদ্দেশে রচিত হইত এবং লোকে তাহাদিগকে "পদ" কহিত। এই কারণে বাঙ্গালাভাষার আদি কবি বিদ্যাপতি ও চণ্ডীদাস প্রভৃতির গীতিকাব্য পদাবলী এবং তাঁহারাও "পদকর্ত্তা" নামে অভিহিত। এই সকল প্রাচীন কবিতামালার অধিকাংশই চতুর্দ্দশাক্ষর পরিমিত পয়ার, কোন কোন স্থলে ত্রিপদীও দৃষ্ট হয়। চৌপদী প্রভৃতি ছন্দ তাহার অনেক পরে বঙ্গভাষায় প্রবেশ লাভ করিয়াছে। বস্তুতঃ "পয়ার"ই তখনকার কবিতার জাতীয় পরিচ্ছদ। পয়ার ভিন্ন (কেবল দু'এক স্থলে ত্রিপদীর প্রয়োগ ভিন্ন) অন্য ছন্দের অস্তিত্বই ছিল না। পয়ারছন্দই তখনকার বাঙ্গালা কবিতারাজ্যের একচ্ছত্র সম্রাট্‌বংশের একমাত্র "দুলাল" যেমন আজীবন "খোকা" নামে সাধারণে অভিহিত হইয়া থাকে; চতুর্দ্দশ অক্ষরপরিমিত পদও তখনকার একমাত্র "দুলাল" ছিল বলিয়া আজ পর্য্যন্ত "পয়ার" নামে অভিহিত হইয়া আসিতেছে। আমাদের এরূপ সিদ্ধান্ত নিতান্ত অসঙ্গতও নহে এবং ইহার বিরুদ্ধে যতক্ষণ না অন্য কোন বলবৎ-যুক্তি (নজীর) পাইতেছি তখন ঐ মতই আমরা সমীচীন বলিয়া গ্রহণ করিব। বস্তুতঃ আমাদের এরূপ মতের অনুকূলে আরও একটি যুক্তির অবতারণা করা যাইতে পারে। যখন প্রাকৃত ব্যাকরণকার হেমচন্দ্র বলেন, "মূলভাষা সংস্কৃত, তাহা হইতে উৎপন্ন বা আগত ভাষা প্রাকৃত"*। তাহা হইলে সংস্কৃত হইতে উৎপন্ন ভারতীয় ভাষামাত্রেই প্রাকৃতভাষা আখ্যা পাইতে পারে, কিন্তু তাহা না হইয়া কেন কেবল ভাষাবিশেষকে প্রাকৃত বলা হয়? সেইরূপ, সকল কবিতারই "পদ"আছে, এই জন্য উহাদিগকে

---

* এস্থলেও কৃতজ্ঞহৃদয়ে প্রকাশ করিতেছি, "পরিষদের" অন্যতম সদস্য বহুভাষাবিদ্ বন্ধুবর শ্রীযুক্ত অমূল্যচরণ ঘোষ বিদ্যাভূষণ মহাশয় পয়ার শব্দের উক্ত ব্যুৎপত্তিগত অর্থ সম্বন্ধে প্রবন্ধলেখককে বিশেষ সাহায্য করিয়াছেন।—লেখক।

পদ্য বলে! এতৎসত্ত্বেও কিন্তু "পদ আছে যাহার" এই অর্থে কেবল পয়ারছন্দকেই বুঝাইতেছে। এরূপ বুঝাইবার কারণও যথেষ্ট আছে। আমাদের মনে হয় সংস্কৃতের কথিত ভাষা প্রাকৃত, যখন সংস্কৃতের কুক্ষিগত হইয়া সাহিত্যের ভাষায় পরিণত হইতেছিল, সে সময় হিন্দু ও বৌদ্ধ ধর্ম্মের পরস্পর সংঘর্ষ চলিতেছে; তজ্জন্য সাধারণজনগণকে হিন্দুধর্ম্ম বুঝাইবার জন্য মহাপ্রাজ্ঞ আর্য্য আচার্য্যগণ আর একটি ভাষার প্রয়োজন অনুভব করিলেন এবং এই প্রয়োজন হইতেই তাঁহারা প্রত্যেক প্রদেশের সাধারণ চলিত ভাষায় নানা পৌরাণিক উপাখ্যান, "ব্রতকথা" "ছড়া" প্রভৃতি রচনা করিয়া দেশীয় অশিক্ষিত ও স্ত্রীলোকদিগকে উপহার দিতে লাগিলেন। এইরূপে প্রত্যেকপ্রদেশের কথোপকথনের ভাষাসমূহ ক্রমে ক্রমে আবার স্বতন্ত্র ভাষায় পরিণত হইতে লাগিল। বঙ্গদেশের সে সময়ের নবঅঙ্কুরিত প্রাদেশিক ভাষার (প্রাকৃতের) বোধ হয় তখন কোন বিশেষ নামকরণ হয় নাই। তখন সাধারণে আপন আপন রুচি-অনুসারে ইহাকে 'গৌড়ীয় সাধুভাষা', সাধুভাষা "ভাষা প্রবন্ধ" "ভাষাকথা"প্রভৃতি নামে অভিহিত করিত। এই সময়ে কেন্দুবিল্বের অমরকবি শ্রীজয়দেব গোস্বামীর "গীতগোবিন্দ" কাব্যে "পয়ার" ছন্দের ডিম্ব হইতে পক্ষীশাবকের উৎপত্তির ন্যায়, অস্ফুটধ্বনি শুনিতে পাওয়া গেল। ক্রমে সেই অস্ফুটধ্বনি বঙ্গসাহিত্যের আদ্যকালের আদিকবি বিদ্যাপতি ও চণ্ডীদাসের পদাবলী এবং আর সেই মহাকবি কৃত্তিবাস প্রভৃতির কাব্যে প্রতিধ্বনিত হইয়া জগতের সম্মুখে বঙ্গসাহিত্যের তথা বঙ্গীয় আদিচ্ছন্দের জন্মকথা জ্ঞাপন করিল। কবিশ্রেষ্ঠ শ্রীজয়দেব গোস্বামীকে কেহ কেহ বঙ্গভাষার প্রথম কবি কেহবা সংস্কৃতের শেষ কবি বলিয়া গণ্য করেন। তিনি যে ভাষারই কবি হউন, আমরা কিন্তু তাঁহার অমর গীতিকাব্য "গীতগোবিন্দের চতুর্থ সর্গে" পয়ারছন্দের জন্মগ্রহণের সংবাদ পাই। ছন্দটী এই :—

সরস মসৃণমপি মলয়জ পঙ্কং।
পশ্যতি বিষমিব বপুষি সশঙ্কং॥
শ্বসিত-পবনমনুপম পরিণাহং।
মদনদহনমিব বহতি সদাহং॥ ইত্যাদি গীতগোবিন্দ—৪র্থ সর্গ।

এইরূপ ৬ষ্ঠ, ৭ম, ৯ম, এবং ১১শ সর্গেও পয়ার দৃষ্ট হয়। ইহাদের মধ্যে কোনটী ১৩, কোনটী বা ১৪ অথবা ১৫ অক্ষরমাত্রায় আবদ্ধ। সকলস্থলেই দুইচরণ ও শেষে মিলন এবং প্রতিচরণের মধ্যেই যতি অর্থাৎ বাঙ্গালা পয়ারছন্দের সহিত সর্ব্বাংশেই সমান। প্রভেদের মধ্যে উক্ত পদগুলি লঘুগুরু ভেদাত্মক ও সন্ধি-সমাস-সমন্বিত। ইহার কারণ গীত-গোবিন্দের ভাষা "সংস্কৃতাভিসারিণী"। জয়দেবের পরবর্ত্তী কবিগণের কাব্য আলোচনা করিলে আমরা দেখিতে পাই যে, তখনকার ভাষার উপর সংস্কৃতের প্রভাব কিঞ্চিন্মাত্র থাকিলেও প্রকৃত প্রস্তাবে তাহা তখন প্রাকৃতরূপিণী ধাত্রীর আশ্রয় গ্রহণ করিয়াছে, এ কারণ তাঁহাদের কবিতার ভাষা "সংস্কৃতাপসারিণী" অর্থাৎ তখনকার ভাষার গতি প্রাকৃতের (গৌড়ীয় প্রাকৃতের) দিকে যত অধিক সংস্কৃতের দিকে তত নহে। এইরূপে আবহমান কাল হইতে

বঙ্গভাষার উপর সংস্কৃতের জোয়ারভাঁটা খেলিতেছে। বস্তুতঃ দেবভাষা-সংস্কৃতমন্দাকিনী অমরকবি জয়দেবের মধুর কোমলকান্তগানে স্নেহবিগলিত হইয়া মহাদেবরূপী প্রাকৃতের জটামধ্যে প্রবেশ লাভ করে এবং কিঞ্চিদধিক প্রায় এক শতাব্দী ধরিয়া বহির্গমনের পথহারা হইয়া একপ্রকার অদৃশ্যাবস্থায় অবস্থিত করে, পরে বিদ্যাপতি ও চণ্ডীদাসের ভক্তিকমণ্ডলুতে পতিত হয়। পরিশেষে সগরবংশজ ভগীরথের ন্যায় কীর্ত্তিমান্ কবি কৃত্তিবাস বঙ্গসাহিত্যের খাত কাটিয়া তাহাকে (পয়ারছন্দকে) বহু বিস্তৃতভাবে প্রবহমান করেন।

পূর্ব্বে প্রমাণিত হইয়াছে যে, প্রাকৃতভাষা হইতে একটি স্রোত বহির্গত হইয়া বঙ্গভাষাভিমুখে প্রবাহিত হয়। এই প্রবাহই বোধ হয় "মাগধী প্রাকৃত"। তা'রপর মগধের যশঃসৌরভ নিষ্প্রভ হইলে উহাই আবার "গৌড়ীয় প্রাকৃত" নামে পরিচিত হয়। কালক্রমে তাহাই আবার বর্ত্তমান বঙ্গভাষায় পরিণত হইয়াছে। প্রাকৃতভাষার এই বঙ্গদেশাভিমুখী স্রোত দেশপ্রচলিত খাঁটি চলিত কথোপকথনের ভাষায় চলিত। কৃত্তিবাস প্রভৃতি প্রাচীন কবিগণ তৎকালীন দেশপ্রচলিত এই চলিত কথা অবলম্বনে "ভাষাকাব্য" রচনা করেন। এই ধারার প্রথমাবস্থায় বঙ্গভাষা মেয়েলীছড়া, মেয়েলীব্রত, ডাকের কথা, খনারবচন এবং প্রাচীন "প্রবাদমূলক ছড়া" (Proverbial sayings) প্রভৃতির দ্বারা পরিপুষ্ট হইতেছিল*। ইহারা বঙ্গীয় নারীসমাজে আবহমান কাল হইতে আদর পাইয়া আসিতেছে। ইহাদের ভিতরও পয়ারছন্দের একাধিপত্য! কতদিন হইতে যে ইহারা বঙ্গদেশের শিক্ষিত অশিক্ষিত ইতর ভদ্র প্রভৃতি সকলের নিকট সমভাবে আদর পাইতেছে, তাহার নির্ণয় করা দুষ্কর। বিশেষতঃ মেয়েলীছড়া, প্রাচীনপ্রবাদ, মেয়েলীব্রত প্রভৃতি যে কত দিনের তাহা কেহ নির্ণয় করিতে পারেন কিনা বলিতে পারি না। আমাদের বোধ হয়, যতদিন হইতে বঙ্গীয় নরনারী একত্র সমাজ বদ্ধ হইয়া বসবাস করিতেছে, ততদিন হইতেই এ সকল বর্ত্তমান! কেননা এই সকল শ্লোকাত্মক পদসমূহ চলিত কথোপকথনের ভাষায় পরিপূর্ণ এবং সমাজশাসনীশক্তিমূলক! বঙ্গসাহিত্যে এই সকল "বচন" ও "ছড়া"র প্রচলনে পয়ারছন্দ গঠনের পক্ষে কিছু না কিছু সাহায্য হইয়াছিল। ইহাদের রচনার প্রকৃতি ও বর্ত্তমানে অপ্রচলিত প্রাচীন শব্দসমূহের ব্যবহার দেখিয়া আমরা এরূপ সিদ্ধান্তে উপনীত হইয়াছি। উপরি উক্ত "বচন" ও "ছড়া"-গুলি অতি প্রাচীন কাল হইতে বঙ্গদেশে প্রচারিত হইলেও ইহারা কোন কাব্যের ন্যায় পরম্পরগ্রথিত নহে। কিন্তু তথাপি ইহারা যে বঙ্গীয় প্রাচীন কবিগণকে ছন্দ রচনায় বিশেষ সাহায্য করিয়াছিল, তাহাতে আর সন্দেহ নাই।

উপসংহারে বক্তব্য এই যে, পয়ার শব্দ ও ছন্দের উৎপত্তির আলোচনায় বঙ্গীয় সাহিত্যতত্ত্ববিদ্‌গণের কিছুমাত্র সন্তোষ উৎপাদন করিতে পারিয়া থাকি, তবে বারান্তরে ইহার "পরিণতি ও পরিপুষ্টি" সম্বন্ধে আরও কিছু বলিবার ইচ্ছা রহিল—নচেৎ এই পর্য্যন্ত।

শ্রীরমেশচন্দ্র বসু।

* বঙ্গীয় প্রবাদমালা সম্বন্ধে স্বতন্ত্র প্রবন্ধে বিশদভাবে আলোচনা করিবার ইচ্ছা রহিল।

বঙ্গীয় সাহিত্য-পরিষৎ

মাসিক কার্য্য-বিবরণী।

প্রথম বিশেষ অধিবেশন।

১৩১১

গত ১৪ই জ্যৈষ্ঠ (১৩১১), ২৭মে (১৯০৪), শুক্রবার অপরাহ্ন ৫॥০ টার সময় পটলডাঙ্গা ইউনিভারসিটি ইনষ্টিটিউট হলে পরিষদের একটি বিশেষ অধিবেশন হইয়াছিল, সভাস্থলে নিম্নলিখিত ব্যক্তিবর্গ উপস্থিত ছিলেন,—

শ্রীযুক্ত হীরেন্দ্রনাথ দত্ত এম্, এ, বি, এল্ (সভাপতি)

মাননীয় ডাক্তার শ্রীযুক্ত গুরুদাস বন্দ্যোপাধ্যায় এম্, এ, ডি, এল্

রায় শ্রীযুক্ত বৈকুণ্ঠনাথ বসু বাহাদুর

রায় শ্রীযুক্ত যতীন্দ্রনাথ চৌধুরী এম্,এ,বি,এল্

পণ্ডিত শ্রীযুক্ত সতীশচন্দ্র বিদ্যাভূষণ এম্, এ

" " সখারাম গণেশ দেউস্কর

শ্রীযুক্ত সতীশচন্দ্র রায় এম্,এ

" সুরেন্দ্রনাথ মৈত্র এম্,এ,

" আশুতোষ ভট্টাচার্য্য এম্, এ

" উপেন্দ্রনাথ বন্দোপাধ্যায় এম্এ, বিএল্,

" মোহিতচন্দ্র সেন এম্,এ,

" প্রমথনাথ বন্দ্যোপাধ্যায় এম্,এ

" শিবাপ্রসন্ন ভট্টাচার্য্য এম,এ, বি,এল্

" কালীপ্রসন্ন বন্দ্যোপাধ্যায় এম্,এ

" অমৃতকৃষ্ণ মল্লিক বি,এল্

" নিখিলনাথ রায় বি,এল্

" দীনেশচন্দ্র সেন বি, এ

ডাক্তার শ্রীযুক্ত সজনীকান্ত সরকার এল,এম্,এস্

শ্রীযুক্ত নগেন্দ্রনাথ বসু

" নগেন্দ্রনাথ গুপ্ত

" সুরেশচন্দ্র সমাজপতি

" মহেন্দ্রলাল মিত্র,

" গৌরহরি সেন

" মনিমোহন সেন

" ভূতনাথ ভাদুড়ী

" মন্মথনাথ চক্রবর্ত্তী

" দ্বারকানাথ বন্দ্যোপাধ্যায়

" নিবারণচন্দ্র মুখোপাধ্যায়

" চারুচন্দ্র বসু

" সত্যেন্দ্রনাথ দত্ত

" কুঞ্জমোহন চক্রবর্ত্তী

" কমলকৃষ্ণ সাহা

" জ্যোতিশ্চন্দ্র সান্যাল

" সুরেশচন্দ্র বসু

শ্রীযুক্ত মন্মথনাথ সেন বি,এ	শ্রীযুক্ত বামাচরণ চট্টোপাধ্যায়	
,, শচীন্দ্রনাথ মুখোপাধ্যায় বি, এ	,, ললিতমোহন মল্লিক	
,, যতীন্দ্রমোহন সেন এম্, এ	,, ব্যোমকেশ মুস্তফী	সহকারী সম্পাদকগণ
,, ফণীন্দ্রনাথ রায়	,, মন্মথমোহন বসু বি,এ	
,, নিকুঞ্জমাধব ঠাকুর।	,, নিত্যগোপাল বসু	

এতদ্ভিন্ন আরও প্রায় দুই শত ভদ্রলোক উপস্থিত ছিলেন।

সভাপতি মহাশয় ও সহকারি-সভাপতিগণের অনুপস্থিতিতে মাননীয় শ্রীযুক্ত গুরুদাস বন্দ্যোপাধ্যায় এম্,এ, ডি, এল্ মহাশয়ের প্রস্তাবে ও সমগ্র সভার অনুমোদনে শ্রীযুক্ত হীরেন্দ্রনাথ দত্ত এম্, এ, বি,এল্ মহাশয় সভাপতির আসনগ্রহণ করিলেন।

তৎপরে সভাপতি মহাশয়ের আদেশে সভার কার্য্য আরম্ভ হইলে শ্রীযুক্ত রবীন্দ্রনাথ ঠাকুর মহাশয় "ভাষার ইঙ্গিত" নামক প্রবন্ধ পাঠ করিলেন।

(এই প্রবন্ধটী ১৩১১ সালের আষাঢ় মাসের ভারতীতে প্রকাশিত হইয়াছে।)

তৎপরে পণ্ডিত শ্রীযুক্ত সতীশচন্দ্র বিদ্যাভূষণ এম্, এ মহাশয় বলিলেন, রবীন্দ্রবাবুর এই গবেষণাপূর্ণ সুন্দর প্রবন্ধ শুনিয়া আমরা বিশেষ পরিতৃপ্ত হইয়াছি; এজন্য তাঁহাকে ধন্যবাদ। সাহিত্য-পরিষদের পক্ষ হইতেও আমি তাঁহাকে ধন্যবাদ জানাইতেছি। তাঁহার গদ্য পদ্য যখন যে কোন লেখা পাঠ করি বা শুনি তখনই তাহাতে অপূর্ব্ব প্রীতি, আনন্দ ও রসবোধ করি। তাঁহার সকল প্রবন্ধই অপূর্ব্ব এক রসময়। অদ্যকার এই প্রবন্ধও রসময় এবং গদ্য হইলেও কাব্য। সংস্কৃত অলঙ্কার শাস্ত্রের মতে "বাক্যং রসাত্মকং কাব্যং"। অলঙ্কারশাস্ত্রে নবরসের উল্লেখ আছে, কিন্তু রবীন্দ্রবাবুর প্রবন্ধ পাঠে বা শ্রবণে আমরা আর একটি রস উপলব্ধি করি, তাহা প্রীতি বা আনন্দ রস। বাঙ্গালা ভাষার গতিনির্দ্দেশ ও লক্ষ্যকারীদিগের দুই দল। এক দলের নেতা রবীন্দ্রবাবু। সামান্য হইতে উচ্চশ্রেণীর লোকে কথাবার্ত্তার ভাষার যে সকল শব্দ ব্যবহার করে, সেগুলি লেখার ভাষায় আমরা ব্যবহার করি না। তৎপরিবর্ত্তে অন্য শব্দ সৃষ্টি করিয়া যদি ব্যবহার করি—তাহাহইলে ভাষার জীবনীশক্তি থাকে না। কথিতভাষার শব্দের শক্তি ও মাধুর্য্য রবীন্দ্রবাবুদ্বারা প্রকাশিত হইতেছে, তিনি তাহা অনুভব করিয়াছেন। তাঁহার "ধ্বন্যাত্মক শব্দ" প্রভৃতি প্রবন্ধ ইহারই ফল। এ সকল চলিত কথার শব্দ প্রদেশভেদে বিভিন্ন ভাবে বিভিন্ন অর্থেও ব্যবহৃত হয়। ধ্বন্যাত্মক শব্দ পরিবর্ত্তনশীল। সংস্কৃত সাহিত্যেও অল্প সংখ্যক ধ্বন্যাত্মক শব্দ দেখা যায়। এই সকল ধ্বন্যাত্মক শব্দ সাহিত্যে ব্যবহার করা বড় কঠিন। ধ্বন্যাত্মক শব্দগুলি জীবিত শব্দ। সে গুলিকে রবীন্দ্রবাবুর কথিত নিয়মাদি দ্বারা শ্রেণীবদ্ধ করিয়া ব্যাকরণের আবরণ দিয়া পাঠ করিতে গেলে, তাহাদের মাধুর্য্য নষ্ট হইবে বলিয়া মনে হয়। এ যুগের শব্দ রহস্য সংগৃহীত হউক কিন্তু সাহিত্যে তাহাদের বহুল ব্যবহার প্রার্থনীয় নহে।

শ্রীযুক্ত রবীন্দ্রনাথ ঠাকুর মহাশয় বলিলেন,—পণ্ডিত সতীশচন্দ্র বিদ্যাভূষণ মহাশয় যে সকল

কথার উল্লেখ করিয়াছেন, তজ্জন্য আমি কৃতজ্ঞতা জানাইতেছি। বাঙ্গালা ভাষার আকৃতি কিরূপ হইলে ভাল হয়, সে সম্বন্ধে আমার মত যে কি, তাহা আমি এ প্রবন্ধে বলি নাই, বলিতে আসিও নাই। সংস্কৃত ভাষার সাহায্য ভিন্ন বাঙ্গালা ভাষা যে সুসঙ্গত ভাবে প্রকাশ করা যায়, তাহা বিশ্বাস করি না। আমার এ প্রবন্ধ ব্যাকরণমূলক। চলিত কথাগুলির মধ্যে ব্যাকরণের যে একটি সূক্ষ্মসূত্র বর্ত্তমান আছে, আমি তাহাই টানিয়া বাহির করিয়া, আপনাদের দেখাইতেছি। আপনারা দেখুন আমি যাহা বাহির করিয়াছি, তাহা ঠিক কিনা, তাহা টেঁকে কি না? কেহ যেন মনে না করেন, আমি এই সকল শব্দ অবাধে যেখানে সেখানে সাহিত্যে ব্যবহার করিতে চাই। আমি সে পক্ষে বিধান দিবার চেষ্টা করি নাই। ভাষায় যাহা আছে, আমি তাহাই ব্যাখ্যা করিতে প্রয়াস পাইয়াছি। লিখিত ভাষায় এ সকল শব্দ চলিবে কি না, তাহা বিচার্য্য। আবশ্যক হয় চলিয়া যাইবে। প্রাদেশিকতা কথিত ভাষায় আছে সত্য, কিন্তু এই প্রাদেশিকতাগুলি কি আলোচ্য নহে? আমারও চেষ্টা আছে এবং পরিষৎও চেষ্টা করিতেছেন। সমস্ত প্রাদেশিক শব্দ সংগ্রহ করিতে পারিলে, ভাষার অভিধানাদি কি পূর্ণাবয়ব হইবে না? আমি ত বলিয়াছি, আমি এই প্রদেশের শব্দ লইয়াই আলোচনা করিয়াছি। আমার কার্য্য স্বতন্ত্র নহে, আমি পরিষদের চেষ্টাকেই অগ্রসর করিয়া দিতেছি। সংস্কৃত শব্দসকল বাঙ্গালায় ব্যবহারে বিদ্যাভূষণ মহাশয়ের সহিত আমার মতভেদ নাই। বিদ্যাভূষণ মহাশয় বলেন, ধ্বন্যাত্মক শব্দগুলি পরিবর্ত্তনশীল, কিন্তু আমার বিশ্বাস এ গুলি সহজে পরিবর্ত্তনীয় নহে। বড় বড় কথাগুলির অর্থ, ভাব ও ব্যবহারই পরিবর্ত্তিত হইয়া থাকে। সংস্কৃত অনেক শব্দ বাঙ্গালায় পরিবর্ত্তিত হইয়া গিয়াছে, তাহার উদাহরণ দেওয়া যাইতে পারে। ধ্বন্যাত্মক শব্দ পরিবর্ত্তিত হইবে কেন? বাঙ্গালী কি খিল্ খিল্ করিয়া হাসিবে না, প্যান্ প্যান্ করিয়া কাঁদিবে না, ঘ্যান্ ঘ্যান্ করিয়া চাইবে না? প্রাকৃত বাঙ্গালা লিখিত ভাষায় যে আমি চালাইতে চাহি, তাহা নহে, তবে চলিবে কি না, তাহাদের প্রয়োজন হইবে কি না বা আছে কি না, তাহার বিচারক পাঠকগণ।

মাননীয় শ্রীযুক্ত গুরুদাস বন্দ্যোপাধ্যায় এম্, এ, ডি, এল্ মহাশয় বলিলেন,—অনেক সময়ে দুরাশা করিয়া নিরাশায় পড়িতে হয়; আজ আমাদের তাহা ত হয়ই নাই বরং অনেক বেশী পরিমাণে লাভ হইয়াছে। প্রবন্ধে আপনারা শুনিলেন যোড়া যোড়া কথা ভিন্ন অনেক সময়ে অর্থ বোধ হয় না। তেমনি বিদ্যাভূষণ মহাশয়ের প্রদত্ত রবীন্দ্রবাবুর ধন্যবাদে যোড়া দিতে না পারিলে আজ তৃপ্তি হইতেছে না। আমিও রবীন্দ্র বাবুকে তাঁহার এই অপূর্ব্ব গবেষণামূলক প্রবন্ধের জন্য আন্তরিক ধন্যবাদ জানাইতেছি। আপনারা যোড়াতাড়া দিয়া লউন। ভাষার ইঙ্গিত সকল বিষয়েই আছে। ভাষাতত্ত্ববিদেরা বলেন, এই সকল ধ্বন্যাত্মক শব্দ দ্বিবিধ, একদলে বলে জন্তুধ্বনি হইতে, অপরদল বলেন মনুষ্যধ্বনি হইতে উৎপন্ন। ইহাদের ইংরাজী নাম Bow-Ow theory ও Pugh-Pugh theory। রবীন্দ্র বাবু লব্ধপ্রতিষ্ঠ কবি আর জগদীশ বাবু লব্ধপ্রতিষ্ঠ বৈজ্ঞানিক। জগদীশ বাবু বলেন, এমন অনেক রঙ্ আছে, যাহা এ চোখে দেখা

যায় না—এ চোখের ততটা বোধশক্তি নাই। শক্তির বৃদ্ধি হইলে, আবার এই চোখেই দেখা যায়। অব্যক্তধ্বনির শব্দগুলির রহস্যবোধ সেইরূপ সকলের কাণে হয় না। যে কাণের বোধশক্তি বৰ্দ্ধিত, সে কাণে হয়, কবি রবীন্দ্রবাবুর তাহা হইয়াছে। বিদ্যাভূষণ মহাশয় উহাদের ক্ষণভঙ্গুর বলিয়া মনে করেন। যদিই তাহা হয় তবে একটা দুইটা হইতে পারে কিন্তু তাহাদের দল সমস্তই নহে। বিদ্যাভূষণ মহাশয় উহাদের বহুল ব্যবহার ইচ্ছা করেন না। তিনি না করিলেও লিখিত ভাষায় উহাদের প্রয়োজন আছে। নাটকে তাহার যথেষ্ট উদাহরণ দেখা যায়। অপণ্ডিত ব্যক্তির কথোপকথন লিপিবদ্ধ করিতে হইলে, উহাদের প্রয়োজন। এই সকল শব্দ এত ছোট যে দু'একজন সহৃদয় কবি ইহাদের স্বরূপ দেখিতে চাহেন না। রবি বাবু একজন বৈজ্ঞানিক কবি। তিনি ইহাদের স্বরূপ যে ভাবে দেখাইয়াছেন, তাহাতে উহাদের আর ছোটত্ব নাই। তবে রবীন্দ্রবাবু বড় নজরে উহাদিগকে যতই ছোট দেখুন, আমাদের কাছে এ গুলি এখন অতি বড় জিনিষ। ভাষার প্রাকৃতত্ব এখন উহাদের উপরে নির্ভর করিতেছে। রবীন্দ্রবাবুর একটা কথার সহিত আমার মতভেদ আছে। বাঙ্গালা ও সংস্কৃত ভাষায় যে সম্বন্ধ তাহা দেহ-পরিচ্ছদ সম্বন্ধ নহে; দেহের উৎকৃষ্ট অংশ বটে। দেহ-পরিচ্ছদ সম্বন্ধ হইলে, বাঙ্গালাভাষাকে শবদেহ বলিতে হয়, কিন্তু তাহা নহে। জীবনীশক্তি বাঙ্গালাতেও আছে। শব্দরূপ ধাতুরূপ সব বাঙ্গালা। কোনটা একটু বৰ্দ্ধিত কোনটা একটু কৰ্ত্তিত। ইহা-দ্বারা আমি যেমন বাঙ্গালাভাষাকে একটু বাড়াইলাম তেমনি একটু কমাইয়াও দিলাম। তর্কের খাতিরে কাহাকেও অপদস্থ করিতে নাই। যাহার যে নাম, সেই নামে ডাকিলে শীঘ্র ডাক শোনা যায়।

অতঃপর সভাপতি মহাশয় বলিলেন,—প্রবন্ধপাঠকের সহিত আমার একটা বিশেষ মত-ভেদ আছে। তিনি বলেন এই সকল বিষয় অকিঞ্চিৎকর ও বিস্মরণযোগ্য, আমি তাহা কিছুতেই স্বীকার করি না। অন্য কোন বিষয়ে আমার সহিত তাঁহার কোন মতভেদ নাই। তাঁহার প্রবন্ধ রচনানির্দ্দেশের নিয়মপ্রকাশক নহে। বিদ্যাভূষণ মহাশয় আশঙ্কিত হইয়াছেন কেন বলিতে পারি না। সংস্কৃত ছাড়িয়া বাঙ্গালাভাষা চলে না; কিন্তু তাই বলিয়া সংস্কৃতের অনাবশ্যক প্রলেপ দিয়া, বাঙ্গালাকে ভারাক্রান্ত করিবার আবশ্যক কি? রবীন্দ্রবাবু যে সকল শব্দ সম্বন্ধে আজ নানাবিধ তথ্য প্রকাশ করিলেন, বিদ্যাভূষণ মহাশয় তাহাদিগকে ভঙ্গুর বলিতেছেন কেন? কতকগুলি শব্দ কেন, সমস্ত ভাষাই ত ভঙ্গুর। সংস্কৃতসাহিত্যে বৈদিক শব্দই আর এখন কি ব্যবহার হয়, না সে ভাষা চলে? সেক্সপীয়রের ভাষা, ড্রাইডেনের ভাষা এখানকার ইংরাজীসাহিত্যে অপ্রচলিত হইয়া গিয়াছে। সেক্সপীয়র অপেক্ষা ড্রাইডেন আধুনিক। তাঁহার শব্দগুলা পর্য্যন্ত অব্যবহার্য্য হইয়া যাইতেছে। যোগ্যতমের উদ্বর্ত্তন ভাষাতত্ত্বেও খাটে। রবীন্দ্রবাবু এই সকল শব্দকে চিরস্থায়ী করিতে চেষ্টা পান নাই। শব্দকে স্থায়ী করিতে কেহ পারে না। মহাকবি প্রয়োগে কতকটা হয়, সম্পূর্ণ হয় না। সেক্সপীয়র তাহার উদাহরণ, বিভক্তিও ভাষার ইঙ্গিত। ইংরাজীতে বিভক্তির (Preposition) পূর্ব্ব নিপাত এবং বাঙ্গালায়

পরনিপাত (Postposition) হয়। যেমন 'To me' ও 'গাছ থেকে'। রবীন্দ্রবাবু কবির দৃষ্টিতে মাতৃভক্তের ভক্তিতে এই সকল তত্ত্ব আবিষ্কার করিয়াছেন। খুট্‌খাট্ শব্দ, হুট্‌নাট্ হইয়া গেলে আত্মার দেহান্তরগ্রহণবৎ হয়। রবীন্দ্রবাবু আমাদের চিরপরিচিত শব্দগুলিকে বৈজ্ঞানিক প্রণালীতে দেখিয়াছেন এবং দেখাইয়াছেন। এই সকল শব্দের এখন ভাষায় বহুল ব্যবহার হইবে কিনা তাহা আর এখন জিজ্ঞাস্য হইতে পারে না। নাটকে এই সকল শব্দ গৃহীত হইতে আরম্ভ হইয়াছে। সুরচিত নাটক ভাষায় বহুকাল থাকিবে। বৈজ্ঞানিকের চক্ষে কিছুই নগণ্য হইতে পারে না। সেইরূপ ভাষাতত্ত্ববিদের নিকট কোন শব্দই উপেক্ষিত হইবার নহে। ব্যাকরণ আইন-নিগড় নয়। ভাষার স্বরূপ ভাষার ইঙ্গিত বিভক্তি প্রভৃতিকে ব্যাকরণ বৈজ্ঞানিক ভাব দেখাইয়া দেয়। সিংহ বর্ণনায় কেশর বাদ দেওয়া যাহা লাঙ্গুল বাদ দেওয়া তাহা। ধ্বন্যাত্মক শব্দ বাদ দিলে ভাষাতত্ত্বালোচকের দৃষ্টি ভ্রান্ত হইবে। রবীন্দ্র বাবুর প্রবন্ধের জন্য আমরা তাঁহার নিকট কৃতজ্ঞ। আমাপেক্ষা মান্যগণ্য পণ্ডিতগণের নিকট প্রশংসা ও ধন্যবাদ পাইয়াছেন। সভাপতিরূপে আমি তাহার প্রতিধ্বনি করিতেছি।

অতঃপর সভাপতি মহাশয়কে ধন্যবাদ জানাইয়া সভাভঙ্গ হইল।

শ্রীব্যোমকেশ মুস্তফী	শ্রীগুরুদাস বন্দ্যোপাধ্যায়
সহঃ সম্পাদক।	সভাপতি।

প্রথম মাসিক অধিবেশন।

গত ১৫ই জ্যৈষ্ঠ (১৩১১), ২৮শে মে (১৯০৪), অপরাহ্ন ৫।০ টার সময় ইউনিভার্সিটি ইন্‌ষ্টিটিউট হলে, বঙ্গীয় সাহিত্য-পরিষদের প্রথম মাসিক অধিবেশন হইয়াছিল। এই অধিবেশনে নিম্নলিখিত ব্যক্তিগণ উপস্থিত ছিলেন ;—

মাননীয় ডাক্তার শ্রীযুক্ত গুরুদাস বন্দোপাধ্যায় এম্, এ, ডি, এল্ (সভাপতি)

রায় ,, ,, চুনিলাল বসু এম্. বি, এফ্., সি, এস্।

শ্রীযুক্ত রাজকৃষ্ণ দত্ত	ডাক্তার শ্রীযুক্ত রসিকমোহন চক্রবর্ত্তী
" নিবারণচন্দ্র মুখোপাধ্যায়	" সতীশচন্দ্র রায় এম্,এ
" নগেন্দ্রনাথ গুপ্ত	" রঘুনন্দন সহায় এম্, এ, বি, এল্
" দীনেশচন্দ্র সেন বি, এ	" রাজেন্দ্রনাথ সিংহ
" নগেন্দ্রনাথ বসু	" কমলকৃষ্ণ সাহা
" ক্ষীরোদপ্রসাদ বিদ্যাবিনোদ এম্,এ	" কুলদাকিঙ্কর রায় বি,এল্
" শচীন্দ্রনাথ মুখোপাধ্যায় বি,এ	" সতীশচন্দ্র বিদ্যাভূষণ এম্, এ
" সরসীলাল সরকার এল,এম্,এস্	" যোগেন্দ্রনাথ মিত্র এম্ এ

শ্রীযুক্ত নিবারণচন্দ্র দত্ত
" সত্যভূষণ বন্দ্যোপাধ্যায়
" উপেন্দ্রনাথ বন্দ্যোপাধ্যায়
" প্রমথনাথ বন্দ্যোপাধ্যায় এম্, এ
" সুরেন্দ্রচন্দ্র বসু,
" দুর্গাচরণ মুখোপাধ্যায়
" শিবাপ্রসন্ন ভট্টাচার্য্য এম্,এ, বি,এল্
" গোপালচন্দ্র গুপ্ত।
" মৃণালকান্তি ঘোষ।

শ্রীযুক্ত ফণীন্দ্রনাথ রায়।
ডাক্তার " চন্দ্রশেখর কালী এল্, এম্,এস্
কবিরাজ " প্রবোধচন্দ্র বিদ্যানিধি।
" দ্বারকানাথ বন্দ্যোপাধ্যায়
" বামাচরণ চট্টোপাধ্যায়।
" নিকুঞ্জমাধব ঠাকুর।
" ব্যোমকেশ মুস্তফী
" মন্মথমোহন বসু বি,এ
" নিত্যগোপাল বসু,
} সহকারী সম্পাদকগণ।

এতদ্ভিন্ন আরও প্রায় দুইশত ব্যক্তি উপস্থিত ছিলেন।

এই অধিবেশনে নিম্নলিখিত বিষয়গুলি আলোচ্য ছিল ;—

১। গত অধিবেশনের কার্য্য-বিবরণ পাঠ।

২। সভ্য-নির্ব্বাচন।

৩। মাননীয় বিচারপতি শ্রীযুক্ত সারদাচরণ মিত্র এম্, এ, বি, এল্ মহাশয়কর্ত্তৃক "শ্রীচৈতন্যের উৎকল-যাত্রা" নামক প্রবন্ধ পাঠ। ৪। বিবিধ।

মাননীয় ভূতপূর্ব্ব বিচারপতি ডাক্তার শ্রীযুক্ত গুরুদাস বন্দ্যোপাধ্যায় এম,এ, ডি,এল্ মহাশয় সভাপতির আসন গ্রহণ করিয়া অদ্যকার প্রবন্ধপাঠক মহাশয়ের প্রবন্ধনির্ব্বাচন ও তাঁহার সাহিত্যজ্ঞান সম্বন্ধে বহু প্রশংসা করিয়া সভার কার্য্যারম্ভে আদেশ দিলেন। দশম বার্ষিক অধিবেশনের কার্য্য-বিবরণ পঠিত ও গৃহীত হইল।

তৎপরে নিম্নলিখিত ব্যক্তিগণ যথারীতি প্রস্তাব ও সমর্থনের পর সভ্য শ্রেণীভুক্ত হইলেন,—

প্রস্তাবক	সমর্থক	সভ্য
শ্রীব্যোমকেশ মুস্তফী	শ্রীনগেন্দ্রনাথ গুপ্ত	১। শ্রীগোপালচন্দ্র গুপ্ত, ৫ মীড্লটন ষ্ট্রীট্
"	শ্রীসতীশচন্দ্র বিদ্যাভূষণ	২। শ্রীসুরেন্দ্রনাথ সেন L.M.S. কানপুর।
"	"	৩। শ্রীপরেশচন্দ্র দত্ত, বর্দ্ধমান।
"	"	৪। শ্রীযামিনীরঞ্জন ভট্টাচার্য্য, পঞ্জাব।
শ্রীরমেশচন্দ্র বসু	শ্রীব্যোমকেশ মুস্তফী	৫। শ্রীযোগেন্দ্রনাথ সিংহ, বহুবাজার।
শ্রীব্রজলাল মুখোপাধ্যায়	শ্রীব্যোমকেশ মুস্তফী,	৬। শ্রীঅক্ষয়কুমার চট্টোপাধ্যায় কলেজষ্ট্রীট

অতঃপর মাননীয় শ্রীযুক্ত সারদাচরণ মিত্র মহাশয় স্বীয় প্রবন্ধ পাঠ করিলেন।

(এই প্রবন্ধটি ১৩১১ জ্যৈষ্ঠ মাসের প্রবাসী পত্রে প্রচারিত হইয়াছে।)

তৎপরে শ্রীযুক্ত দীনেশচন্দ্র সেন বি,এ মহাশয় বলিলেন,—দুরূহ রাজকার্য্যের অবসরে মাননীয় মিত্র মহাশয় যে গবেষণাপূর্ণ প্রবন্ধ লিখিয়াছেন, তাহা অতি মনোরম হইয়াছে। বৈষ্ণব ধর্ম্মের অপূর্ব্ব গ্রন্থাদি এতদিন ইতরশ্রেণীর বৈষ্ণবের হস্তে ছিল, কিছুদিন হইতে এই সকল

গ্রন্থের প্রতি যে শিক্ষিত সম্প্রদায়ের দৃষ্টি পড়িয়াছে, তাহারও মূল এই মাননীয় মিত্র মহাশয়। ইনিই সর্ব্বপ্রথমে বিদ্যাপতির পদাবলী টীকাটিপ্পনীসহ সাধারণে প্রকাশ করিয়াছিলেন। আবার ইঁহারই যত্নে সেই বিদ্যাপতির পদাবলীর এক বিশেষ সংস্করণ প্রকাশিত হইতেছে। ইহাতে বহু নূতন পদ থাকিবে ও অনেক প্রাচীন পদের সংশোধনাদি হইবে। আজ যে বিষয়ে প্রবন্ধ পঠিত হইল, তাহা হইতে আমরা বৈষ্ণবধর্ম্মের অনেক কথা জানিতে পারিলাম। অনেক বৈষ্ণব জয়ানন্দের গ্রন্থকে প্রামাণ্য বলিয়া গণ্য করেন না। সুখের বিষয় মাননীয় বিচারপতি মিত্র মহাশয় তাহাকে উপেক্ষা করেন নাই। তিনি তাঁহার প্রবন্ধে জয়ানন্দের গ্রন্থ হইতে প্রমাণ উদ্ধৃত করিয়াছেন। জয়ানন্দের প্রমাণ অনুসারে শ্রীচৈতন্যের পূর্ব্বপুরুষ উড়িষ্যানিবাসী ছিলেন, জনৈক রাজা ভ্রমরবর রায়ের ভয়ে বাঙ্গালায় আসেন। এতদ্ভিন্ন জয়ানন্দ মহাপ্রভুর তিরোধান সম্বন্ধে যে বিবরণ দিয়াছেন, তাহাও অন্য কোন বৈষ্ণবগ্রন্থে দেখা যায় না, ৺মহাপ্রভুর উৎকলযাত্রা স্বদেশপ্রেমের একটী জলন্ত নিদর্শন।

তৎপরে ডাক্তার শ্রীযুক্ত রসিকমোহন চক্রবর্ত্তী মহাশয় বলিলেন, "অদ্য যে প্রবন্ধ শুনা গেল, তাহাতে পরমানন্দ লাভ করিয়াছি। অপর যাঁহারা যে ভাবে আনন্দ লাভ করুন, আমরা বৈষ্ণব, গৌরাঙ্গ-কথায় আমাদের বিশেষ আনন্দ হয়। ঠাকুর নরোত্তম বলিয়াছেন—"গৌরাঙ্গ মধুর লীলা, যার কর্ণে প্রবেশিলা, হৃদয় পবিত্র ভেল তার"—শ্রীগৌর-কথা যেমনই হউক, বক্তা ও শ্রোতা উভয়কেই পবিত্র করে। মাননীয় বিচারপতি মিত্র মহাশয় স্বীয় প্রবন্ধে মহাপ্রভুর উৎকলযাত্রা বর্ণনায় মহাপ্রভুর চরণরেণুস্পৃষ্ট স্থানগুলির ঐতিহাসিক ও ভৌগলিক বিবরণ প্রদান করিয়া সাহিত্যের দিক্ হইতে যেমন প্রবন্ধটিকে গবেষণাপূর্ণ করিয়া তুলিয়াছেন, তেমনি তত্তৎস্থানে মহাপ্রভুর আচরিত লীলা বর্ণনা করিয়া প্রবন্ধটীকে মধুর ও পবিত্র করিয়া তুলিয়াছেন। দীনেশ বাবু যে জয়ানন্দের কথা বলিলেন, সেই জয়ানন্দের প্রামাণিকতা সম্বন্ধে মতভেদ আছে। মতভেদই বলি কেন, বৈষ্ণবসমাজে কোন মতভেদ নাই, উহা বৈষ্ণবের পরিত্যক্ত গ্রন্থ। বৈষ্ণবের প্রামাণিক গ্রন্থ যাহা—শ্রীচৈতন্যচরিতামৃত-শ্রীচৈতন্যভাগবতাদি—তাহা অপরের নিকটও প্রামাণিক। ইহার সহিত বিরোধ ঘটে বলিয়াই জয়ানন্দ বৈষ্ণবের পরিত্যজ্য। জয়ানন্দের গ্রন্থে মহাপ্রভুর পূর্ব্বপুরুষগণের উৎকল-বাসকথা সম্পূর্ণ কল্পিত, কারণ অন্য কোন বৈষ্ণবগ্রন্থে তাহার পোষক কোন কথা নাই বরং বৈষ্ণবের প্রামাণ্য গ্রন্থে এই সম্বন্ধে যেরূপ বিবরণ আছে, তাহাই অন্যান্য গ্রন্থদ্বারা সমর্থিত হইয়াছে। মহাপ্রভুর উৎকলযাত্রায় স্বদেশপ্রেমের আকর্ষণ কিছুই নাই। উহা জয়ানন্দের কল্পিত কথার উপর দীনেশ বাবুর কল্পনার সুন্দর খেলামাত্র আর কিছু নহে। চৈতন্য-ভাগবতাদি হইতে জানা যায়, মহাপ্রভু মাতৃভক্ত-শিরোমণি ছিলেন। মাতার আদেশেই তিনি উৎকলে গিয়াছিলেন।" এই বলিয়া বক্তা মহাপ্রভুর উৎকলযাত্রার কারণ বৈষ্ণবসম্মত-গ্রন্থে যেরূপ আছে, তাহা বিবৃত করেন।

অতঃপর শ্রীযুক্ত মনোরঞ্জন গুহ ঠাকুরতা বলেন, প্রবন্ধপাঠকের যেমন বিদ্যা, যেমন সম্মান এবং যেরূপ গবেষণা, তাহাতে আমাদের ন্যায় ব্যক্তির কোন কথা বলিতে সাহস করা উচিত

নহে। আমি কোন কথার প্রতিবাদ করিতে চাহি না, প্রতিবাদের কোন কথা প্রবন্ধেও নাই। তবে প্রবন্ধ শুনিয়া আমার একটা কথা মনে হইতেছে। মাননীয় মিত্র মহাশয় যেরূপ বিস্তৃত-ভাবে মহাপ্রভুর গমন-পথের বর্ণনা করিয়াছেন, সেরূপ বিস্তৃত-ভাবে তাঁহার লীলাংশ বর্ণনা করেন নাই। আমরা বিষয়াসক্ত ব্যক্তি, পার্থিব ব্যাপারের মধ্যে সর্ব্বদা ডুবিয়া আছি, ঘটনাক্রমে এইরূপ অবসরে যদি প্রবন্ধপাঠকের ন্যায় জ্ঞানীব্যক্তির নিকট মধ্যে মধ্যে এইরূপ বিষয় সকলের প্রবন্ধ শুনিতে পাই, তবে বিশেষ উপকৃত হইতে পারি। মহাপ্রভুর উৎকল-যাত্রার পথে কত অদ্ভুত শিক্ষাপ্রদ লীলা হইয়াছিল, তাহা ব্যাখ্যা করা অল্প সময়ের কাজ নহে। এই বলিয়া, বক্তা নিত্যানন্দের দণ্ড-ভঙ্গের ব্যাপার সুন্দর বর্ণনা করিয়া, মানুষ মানুষকে কত ভাল বাসিতে পারে, তাহার ব্যাখ্যা করিলেন। পরে বক্তা আবার বলিলেন,—দীনেশ বাবুর একটা কথার প্রতিবাদ আমি করিব—তিনি বলিয়াছেন "বৈষ্ণবগ্রন্থাবলী এতদিন ইতর-বৈষ্ণবশ্রেণীর হস্তে ছিল।"—তাঁহার ন্যায় বিজ্ঞ ব্যক্তির এরূপভাবে একটা সম্প্রদায়কে অবজ্ঞা করা ভাল হয় নাই। বৈষ্ণবশ্রেণীতে ইতর লোক থাকিতে পারে, কোন্ শ্রেণীতেই বা নাই—কিন্তু সে জন্য সমস্ত সম্প্রদায়কে "ইতর" বলিয়া উল্লেখ করা অনুচিত। ইতর হইলেও তাহারা যে যক্ষের ন্যায় এতদিন এই সকল গ্রন্থরত্ন রক্ষা করিয়া আসিতেছিল, এ জন্যও তাহারা ত আমাদের কৃতজ্ঞতার পাত্র!

তৎপরে শ্রীযুক্ত ক্ষীরোদপ্রসাদ বিদ্যাবিনোদ এম্, এ মহাশয় বলিলেন,—আমার বেশী বলিবার কিছু নাই। আজকার সভায় বিচারপতিই সভাপতি, বিচারপতিই প্রবন্ধপাঠক। প্রবন্ধের বিচার ভালই হইবে। মাননীয় মিত্র মহাশয় প্রবন্ধে ঐতিহাসিক ও ভৌগোলিক বর্ণনায় বহু গবেষণার পরিচয় দিয়াছেন। তিনি প্রবীন সাহিত্য-সেবী, বাঙ্গালা-সাহিত্যে তিনি বহুকাল হইতে লেখনী ধরিয়াছেন, তাঁহার প্রবন্ধে যে আমরা তৃপ্তিলাভ করিয়াছি, ইহা বলাই বাহুল্য। আমরা আশা করি, ধর্ম্মাধিকরণের কার্য্যের অবসরে তিনি মধ্যে মধ্যে আমাদিগকে এইরূপে অনুগৃহীত করিলে আমরা বিশেষ কৃতজ্ঞ থাকিব।

তৎপরে শ্রীযুক্ত সতীশচন্দ্র বিদ্যাভূষণ এম্, এ মহাশয় বলিলেন,—এমন সম্মিলন বহুদিন হয় না। তাহার উপর মাননীয় মিত্র মহাশয়ের ন্যায় ব্যক্তির লিখিত এরূপ ধর্ম্মকথাপূর্ণ ঐতিহাসিক ও ভৌগোলিক বিবরণময় প্রবন্ধও প্রায় শুনা যায় না। মিত্র মহাশয় অল্প কথায় চৈতন্যের ভ্রমণ-কথা বর্ণনার সঙ্গে সঙ্গে যে ভাবে গৌরলীলার কথা ও উড়িষ্যার ইতিহাসের অনেক কথা বর্ণনা করিয়াছেন, তাহা চমৎকার হইয়াছে। তাঁহার উল্লিখিত শবরজাতির কথা গ্রীকদিগের বর্ণনায় পাওয়া যায়। তাহারা মগধেও ছিল। উৎকল নাম গ্রীক বর্ণনায় নাই। উড়িজাতির উল্লেখ আছে, স্থানের নাম নাই। ত্রিকলিঙ্গ রাজ্যের মধ্যে ওড্ দেশ ছিল। মনুতে ওড্জাতির উল্লেখ আছে, তাহারা শূদ্রভাবাপন্ন। উড়িষ্যায় কোন্ সময়ে আর্য্যবাস হয়, তাহা জানা যায় না। পঞ্চগৌড়-ব্রাহ্মণের মধ্যে উৎকল-ব্রাহ্মণের নাম আছে সুতরাং এই পঞ্চব্রাহ্মণবিভাগের বহুপূর্ব্বে এখানে আর্য্যবাস হইয়াছিল। পালিগ্রন্থে উড়িষ্যার স্থানে

উপনয়ন রাজ্য ছিল। ষোড়শ শতাব্দীতে এখানে বৌদ্ধধর্ম্মের প্রবলতা ছিল। ব্রাহ্মণেরা বৌদ্ধ তান্ত্রিকতা অবলম্বন করিয়াছিলেন। চৈতন্যের তিরোধান সম্বন্ধে একটা প্রবাদ আছে—পূর্ণিমার রাত্রিতে ভাবাবেশে তিনি সমুদ্রে ঝাঁপ দিয়া তিরোহিত হন। ইহার মূল কি? আধ্যাত্মিকতার না আর কিছু?

তৎপরে শ্রীযুক্ত চন্দ্রশেখর কালী এল্,এম্,এস্ মহাশয় বলিলেন মহাপ্রভুর দেহত্যাগের বিবরণ লইয়া বৈষ্ণবেরা জয়ানন্দকে অপ্রামাণিক করিয়া তুলিতেছেন কেন বুঝি না। তাঁহার অপরাধ তিনি মহাপ্রভুর দেহত্যাগের কারণ লিখিয়াছেন; তিনি সংকীর্ত্তনে নাচিতে নাচিতে হোঁচট লাগিয়া জ্বরগ্রস্ত হন এবং তাহাতেই দেহত্যাগ করেন। ভগবান্ রামচন্দ্র সরযূতে নিমজ্জিত হইয়াছিলেন। শ্রীকৃষ্ণের সম্বন্ধে কথা আছে ক্ষুদ্র ভক্তের প্রার্থনা পূর্ণ করিবার জন্য তিনি ব্যাধরূপী ভক্তের বাণাহত হইয়া তিরোধান করেন। ইহা যদি হয় তবে হোঁচটজ্বর ইত্যাদির জন্য ভক্তগণের দুঃখ করিবার কি আছে? এই দেহত্যাগের জন্য যখন তিনি অন্য অন্য অবতারে এই দেহোচিত উপায় অবলম্বন করিয়াছিলেন, তখন এবারেও সেরূপ প্রথায় দেহত্যাগ করিলে তাঁহার কি ক্ষতি হইবে? এখনকার দেহ এখনকার দেহের মত করিয়া ত্যাগ করিলে ভক্তপ্রাণে কেন ব্যথা লাগিবে? তিনি দেহাতীত, নিত্য, শুদ্ধ।

এই কথার উত্তরে শ্রীযুক্ত রসিকমোহন চক্রবর্ত্তী মহাশয় জানাইলেন, ভগবানের অবতার-দেহ সামান্য মানব-দেহের ন্যায় রক্তমেদমাংসমজ্জাস্থিযুক্ত ও স্ত্রীপুরুষসঙ্গমজাত নহে। তাঁহার দেহও অপার্থিব, তাঁহার আবির্ভাব-তিরোভাব যে পার্থিব নিয়মে সর্ব্বত্র হইবে, তাহা নহে।

অতঃপর সভাপতি মহাশয় বলিলেন,—অন্যকার বক্তা সম্বন্ধে যাহা বলিবার তাহা পূর্ব্বেই বলিয়াছি। অন্যান্য বক্তাও সে বিষয়ে আমারই কথার প্রতিধ্বনি করিয়াছেন মাত্র। অদ্য সভায় যে সকল কথা লইয়া বাদানুবাদ উপস্থিত হইয়াছে, তাহা প্রবন্ধের কোন কথা নহে। ইহাও প্রশংসার কথা, কারণ প্রবন্ধটি বাদানুবাদের অতীত হইয়াছে। প্রবন্ধের আনুষঙ্গিক যে কথা লইয়া প্রতিবাদ তাহা অনিবার্য্য। দেহ ও দৈহিক নিয়ম, অবতার-দেহ সম্বন্ধে খাটে কি না তাহা বিচার্য্য বটে কিন্তু এখন সে সময়ও নহে আর এস্থানও নহে। এখন প্রবন্ধ সম্বন্ধে বলিব। প্রবন্ধের দুটিভাগ। ঐতিহাসিক ভাগ একটা কথা আছে। আমরা হিন্দু, ইতিহাস রাখি না, সুতরাং আমাদের উন্নতি নাই। এ অপবাদ মানিতে পারি না। সত্যই আমাদের ইতিহাস নাই? সত্যই কি আমরা ইতিহাসে আস্থাবান নহি? তাহা নহে—'পুরাণ' কি? পুরাণে কত কালের অতীত কথা আছে, অতীতের কত কত মহাজনের ইতিহাস আছে। অতীতের ক্ষুদ্রব্যক্তির, ক্ষণিকযুদ্ধের, সামান্য রাজ্যবিপ্লবের কথা ধারাবাহিক নাই বটে, সেরূপ খবরে আমাদের অনাস্থা দেখা যায় বটে। আমাদের পুরাণেতিহাসে দৃষ্টিপাত কর, তাহাতে দেখিবে কত মহাজন কিরূপে এই সংসারে রিপুদলের সহিত যুদ্ধ করিয়া জয়ী হইয়া গিয়াছেন, তাহার সূক্ষ্মাতিসূক্ষ্ম বিবরণ দেওয়া আছে। মহাপ্রভু অংশই হউন, পূর্ণই হউন, আর ভক্তই হউন তিনি রিপুদলের সহিত যেরূপে যুদ্ধ (সে যুদ্ধ নিজের জন্যই হউক আর আমাদের জন্যই

হউক) করিয়া জয়ী হইয়া গিয়াছেন, তাহার ইতিহাস কি নাই ? আর সে ইতিহাস পাঠ করিয়া সেই সংসারজয়ী বীরের প্রতি কে না ভক্তি করিবে ? আমাদের পুরাণেতিহাস কোন রাজার ক্ষুদ্র রাজত্বকালের কথা, শাসনপ্রণালীর কথা ধারাবাহিক নাই কিন্তু তাহা অপেক্ষা বৃহৎ রাজ্য—এই সংসার রাজ্য—যে রাজ্যে আমরা সকলেই প্রজা, সে রাজ্যের বিপুল বিবরণ আছে। ব্যক্তিগত রাজ্যের আইনকানুনের আলোচনা আমাদের Politics নহে। আমাদের Politics ধর্ম্ম; যাহাতে সমাজ ধৃত ও বদ্ধমূল হইয়া আছে, তাহাই হিন্দুর Politics। এই Politics এর আলোচনা চাই এবং করাও উচিত। মাননীয় মিত্র মহাশয় ঐতিহাসিক ও ভৌগোলিক তত্ত্বের আলোচনায় এই প্রবন্ধে যেমন আধুনিক ইতিহাসপ্রিয়তার ও তৎসম্বন্ধে গবেষণার প্রমাণ দেখাইয়াছেন, মধুর গৌরাঙ্গকথার আলোচনায় তেমনি হিন্দুর Politics—সার্ব্বভৌম Politics এর আলোচনায় অপূর্ব্ব কৃতিত্ব দেখাইয়াছেন। উৎকলযাত্রায় গৌরাঙ্গের যে সকল লীলার কথা জানা যায়, তাঁহার যে সকল যুদ্ধের কথা পাঠ করা যায়, তাহার প্রতিদ্বন্দ্বী কোন পাঠান বীর নহে, কিন্তু সে সকল যুদ্ধে যিনি জয়ী, তিনিই প্রকৃত বীর। চৈতন্যদেব কাজে কথায় যে উদ্দীপনা চিরকালের মত জাগাইয়া গিয়াছেন তাহা এখনকার কোন বক্তৃতাবাগীশের অপেক্ষা অল্প উদ্দীপক নহে। যাহা হউক মাননীয় মিত্র মহাশয়কে আমাদের অশেষ ধন্যবাদ জানাইতেছি। তাঁহার এই মনোজ্ঞ প্রবন্ধ উপলক্ষে আমরা অনেক সারগর্ভ কথা শুনিয়া তৃপ্তিলাভ করিলাম।

অতঃপর গ্রন্থোপহারদাতৃদিগকে ও সভাপতি মহাশয়কে ধন্যবাদ জানাইয়া সভাভঙ্গ হইল।

শ্রীব্যোমকেশ মুস্তফী
সহঃ সম্পাদক।

শ্রীরাজকৃষ্ণ তর্কপঞ্চানন
সভাপতি।

দ্বিতীয় মাসিক অধিবেশন।

গত ৫ই আষাঢ় (১৩১১), ১৯ শে জুন (১৯০৪), রবিবার অপরাহ্ণ ৬ টার সময় বঙ্গীয় সাহিত্য-পরিষদের দ্বিতীয় মাসিক অধিবেশন হইয়াছিল। সভাস্থলে নিম্নলিখিত ব্যক্তিবর্গ উপস্থিত ছিলেন,—

মহামহোপাধ্যায় শ্রীযুক্ত রাজকৃষ্ণ তর্কপঞ্চানন (সভাপতি) নদীয়া

"	"	কামাখ্যানাথ তর্কবাগীশ
পণ্ডিত	"	কালীবর বেদান্তবাগীশ
"	"	কৃষ্ণদাস বেদান্তবাগীশ
"	"	জানকীনাথ তর্কপঞ্চানন
মাননীয় ডাক্তার	"	স্যার গুরুদাস বন্দ্যোপাধ্যায়, কে, টি, এম্, এ, ডি, এল্

		শ্রীযুক্ত রায় যতীন্দ্রনাথ চৌধুরী, এম্, এ, বি, এল্
পণ্ডিত	„	সতীশচন্দ্র বিদ্যাভূষণ, এম্, এ
	„	ভাগবতকুমার শাস্ত্রী, এম্, এ
	„	ক্ষীরোদপ্রসাদ বিদ্যাবিনোদ, এম্, এ
	„	যোগেন্দ্রনাথ মিত্র, এম্, এ
	„	ব্রজলাল মুখোপাধ্যায়, এম্, এ
পণ্ডিত	„	বীরেশ্বর পাঁড়ে

শ্রীযুক্ত সারদাপ্রসাদ ঘোষ
„ দীনেশচন্দ্র সেন, বি, এ
„ রমেশচন্দ্র বসু
„ নগেন্দ্রনাথ গুপ্ত
শ্রীযুক্ত নগেন্দ্রনাথ বসু
„ সত্যভূষণ বন্দ্যোপাধ্যায়
„ যতীশচন্দ্র সমাজপতি

এতদ্ভিন্ন আরও প্রায় শতাবধি লোক সভাস্থলে উপস্থিত ছিলেন।

নিম্নলিখিত বিষয়গুলি এই অধিবেশনে আলোচ্য ছিল,—

১। গত অধিবেশনের কার্য্য-বিবরণ পাঠ।

২। সভ্য-নির্ব্বাচন।

৩। মাননীয় ডাক্তার শ্রীযুক্ত আশুতোষ মুখোপাধ্যায় মহাশয়ের পদোন্নতিতে আনন্দপ্রকাশ।

৪। কার্য্য-নির্ব্বাহক-সমিতি সম্বন্ধে শ্রীযুক্ত নগেন্দ্রনাথ গুপ্ত মহাশয়ের প্রস্তাব।

৫। পণ্ডিতবর শ্রীযুক্ত কালীবর বেদান্তবাগীশ মহাশয় কর্ত্তৃক "গৌতম মুনি ও ন্যায়দর্শন" নামক প্রবন্ধ পাঠ। ৬। বিবিধ।

সভাপতি মহাশয় ও সহকারিসভাপতি মহাশয়গণের অনুপস্থিতিতে শ্রীযুক্ত নগেন্দ্রনাথ বসু মহাশয়ের প্রস্তাবে, পণ্ডিত শ্রীযুক্ত সতীশচন্দ্র বিদ্যাভূষণ মহাশয়ের সমর্থনে এবং সমগ্র সভার অনুমোদনে নবদ্বীপের প্রধানাচার্য্য মহামহোপাধ্যায় শ্রীযুক্ত রাজকৃষ্ণ তর্কপঞ্চানন মহাশয় সভাপতির আসন গ্রহণ করেন।

তৎপরে সভাপতি মহাশয়ের আদেশে কার্য্য আরম্ভ হইলে শ্রীযুক্ত রায় যতীন্দ্রনাথ চৌধুরী মহাশয়ের প্রস্তাবে গত অধিবেশনের কার্য্য-বিবরণ পাঠ স্থগিত রহিল।

তৎপরে যথারীতি প্রস্তাব ও সমর্থনে নিম্নলিখিত ব্যক্তিগণ সভ্যশ্রেণীভুক্ত হইলেন,—

প্রস্তাবক	সমর্থক	সভ্য
শ্রীমন্মথমোহন বসু	শ্রীহীরেন্দ্রনাথ দত্ত	১ শ্রীজ্ঞানেন্দ্রনাথ ঘোষ বি,এ শ্যামবাজার ষ্ট্রীট,
„	„	২ শ্রীক্ষিতীশচন্দ্র সরকার এম্,এ,ডেঃ মাঃ পাবনা
„	শ্রীরায় যতীন্দ্রনাথ চৌধুরী	৩ শ্রীনরেন্দ্রনাথ চৌধুরী বি,এল্ উকীল „
„	„	৪ শ্রীরণজিৎচন্দ্র লাহিড়ী এম্,এ,বি,এল „ „
„	„	৫ শ্রীদুর্গাকান্ত চৌধুরী, সবরেজিষ্ট্রার „

শ্রীনগেন্দ্রনাথ বসু	শ্রীরায় যতীন্দ্রনাথ চৌধুরী	৬ মৌঃ এ,কে,এম, মহতসমবিন্না চৌধুরী, সরুসাদী জমিদারবাটী, ফেণী, চট্টগ্রাম।
শ্রীব্যোমকেশ মুস্তফী	”	৭ শ্রীআনন্দগোপাল ঘোষ, বাগবাজার।
শ্রীক্ষীরোদপ্রসাদ বিদ্যাবিনোদ	শ্রীব্যোমকেশ মুস্তফী	৮ শ্রীযতীশচন্দ্র মুখোপাধ্যায়, বহুবাজার।
”	”	৯ শ্রীশচন্দ্র মুখোপাধ্যায় বি,এ হেঃ মাঃ আন্দুল
শ্রীরমেশচন্দ্র বসু	শ্রীনিত্যগোপাল বসু	১০ শ্রীবনমালী দত্ত, রাজা রাজেন্দ্র মল্লিকের ষ্ট্রীট
শ্রীনিত্যগোপাল বসু	শ্রীনগেন্দ্রনাথ বসু	১১ শ্রীসতীশচন্দ্র বসু, শাঁকদার বাগান ষ্ট্রীট,
”	”	১২ শ্রীশশিভূষণ মুখোপাধ্যায়, মীরজাফরস্ লেন
”	”	১৩ শ্রীনির্ম্মলচন্দ্র মিত্র, বৃন্দাবন মল্লিকের লেন
”	”	১৪ শ্রীব্রহ্মানন্দ সিংহ, এম্,এ, লক্ষ্ণৌ পেপারমিল
”	”	১৫ শ্রীকৈলাসচন্দ্র বন্দ্যোপাধ্যায়, এম্,এ, বি,এল্
শ্রীসুরেশচন্দ্র সমাজপতি	শ্রীনিত্যগোপাল বসু	১৬ শ্রীদিব্যেন্দুসুন্দর বন্দ্যোপাধ্যায়,
”	”	১৭ শ্রীপুরেন্দুসুন্দর বন্দ্যোপাধ্যায় এম্, এ

অতঃপর অন্য কার্য্যারম্ভের পূর্ব্বে শ্রীযুক্ত রায় যতীন্দ্রনাথ চৌধুরী এম্,এ, বি,এল্ মহাশয় প্রস্তাব করিলেন বাঙ্গালার প্রসিদ্ধলেখক ভূতপূর্ব্ব "আর্য্যদর্শন" সম্পাদক পণ্ডিত শ্রীযোগেন্দ্রনাথ বিদ্যাভূষণ এম্,এ মহাশয়ের সম্প্রতি মৃত্যু হইয়াছে। তাঁহার মৃত্যুতে বাঙ্গালা ভাষার ক্ষতি হইল, তাঁহার মৃত্যুতে সাহিত্য-পরিষৎ এবং সমস্ত বঙ্গবাসী বিশেষ দুঃখিত। এই বলিয়া পরলোকগত বিদ্যাভূষণ মহাশয়ের নিকট বাঙ্গালা ভাষা কিরূপ ঋণী ও তাঁহার মৃত্যুতে বাঙ্গালা ভাষার কিরূপ ক্ষতি হইল, তাহা যতীন্দ্রবাবু সংক্ষেপে বুঝাইয়া দিলেন এবং প্রস্তাব করিলেন,—"বঙ্গসাহিত্যে সুপ্রথিতনামা, চিন্তাশীললেখক, দেশহিতৈষী, গদ্যসাহিত্যে স্বজাতিপ্রীতি ও জাতীয় উদ্দীপনার প্রবর্ত্তক পণ্ডিতপ্রবর যোগেন্দ্রনাথ বিদ্যাভূষণ এম্,এ মহাশয়ের মৃত্যুতে বঙ্গীয় সাহিত্য-পরিষৎ বিশেষ দুঃখ প্রকাশ এবং তাঁহার শোকসন্তপ্ত পরিবারবর্গকে সমবেদনা জানাইতেছেন।"

পণ্ডিত শ্রীযুক্ত সতীশচন্দ্র বিদ্যাভূষণ এম্,এ মহাশয় এই প্রস্তাবের সমর্থন করিয়া বলিলেন, আজ দশবারো বৎসর আমি পণ্ডিত বিদ্যাভূষন মহাশয়ের সহিত পরিচিত ছিলাম। তাঁহার লিখিত আর্য্যদর্শনের প্রবন্ধাদি পড়িয়া আমি মোহিত হইয়াছিলাম। তাঁহার সহিত পরিচয় হইলে তাঁহার গুণে ও জ্ঞানে আমি আরও মুগ্ধ হইয়াছিলাম। বয়সের পরিণতির সঙ্গে সঙ্গে বিদ্যাভূষণ মহাশয়ের অনেক বিষয়ের ধারণা ইদানীন্তনকালে পরিবর্ত্তিত হইয়া গিয়াছিল। সর্ব্বসম্মতিক্রমে প্রস্তাব গৃহীত হইল।

অতঃপর সভার নির্দ্দিষ্ট তৃতীয় কার্য্য আরম্ভ হইল। মাননীয় ডাক্তার সার শ্রীযুক্ত গুরুদাস বন্দ্যোপাধ্যায় এম্, এ, ডি, এল্ মহাশয় বলিলেন, আজ এই সভায় এইমাত্র একটী শোকের প্রস্তাব হইয়া গেল। আমি যে প্রস্তাবটি করিতে উঠিয়াছি এটি নিরতিশয় আনন্দসূচক।

ডাক্তার আশুতোষ যোগ্যব্যক্তি তাঁহায় বিচারপতিপদে নিয়োগ—যোগ্যব্যক্তির উচ্চপদলাভে সকলেই আনন্দিত তাহাতে আর সন্দেহ নাই। ডাক্তার আশুতোষের অশেষবিধ সদ্‌গুণ আছে, তিনি পণ্ডিত, গণিতশাস্ত্রে তাঁহার পাণ্ডিত্য এদেশে একপ্রকার তুলনারহিত। বিদ্যার ভাণ্ডারে তিনি কতকগুলি অমূল্য রত্ন দান করিয়াছেন, তাহার জন্য সকলেই তাঁহার নিকট কৃতজ্ঞ। ডাক্তার আশুতোষ উচ্চগণিতশাস্ত্রে অনেকগুলি মৌলিক তত্ত্বের আবিষ্কার করিয়া পাশ্চাত্য গণিতবেত্তাদিগের প্রশংসাভাজন হইয়াছেন। ডাক্তার আশুতোষ সাহিত্যেও পণ্ডিত ও বুদ্ধিমান্; বড়লাট সাহেব তাঁহার তীক্ষ্ণবুদ্ধির প্রশংসা করেন। তিনি নির্ম্মলচরিত্র, বিনয়ী কৃতজ্ঞ। এই বলিয়া গুরুদাস বাবু ডাক্তার আশুতোষের এই সকল গুণের নানা উদাহরণ বিবৃত করেন। তৎপরে বলিলেন, জগদীশ্বর ডাক্তার আশুতোষকে বড় করিয়াছেন, তিনি যোগ্যব্যক্তি, ক্ষমতাবান ব্যক্তি। তিনি তাঁহার উচ্চপদ সুশোভিত করিবেন এবং দেশের মুখ উজ্জ্বল করিবেন, ইহাই আমার বিশ্বাস। এই সূত্রে আমি প্রস্তাব করিতেছি "বঙ্গীয় সাহিত্য পরিষদের অন্যতম সহকারি-সভাপতি নানা-শাস্ত্রবিৎ, মাতৃভাষানুরক্ত বঙ্গের গৌরব ডাক্তার আশুতোষ মুখোপাধ্যায় সরস্বতী এম্,এ, ডি,এল্; এফ,আর, এ,এস; এফ,আর,এস,ই; মহাশয় হাইকোর্টের বিচারকপদে প্রতিষ্ঠিত হওয়ায় বঙ্গীয় সাহিত্য-পরিষৎ বিশেষ গৌরবান্বিত হইয়াছেন এবং তাঁহার পদোন্নতিতে সমগ্র বঙ্গবাসীর সহিত বিশেষ আনন্দ প্রকাশ করিতেছেন।"

শ্রীযুক্ত রায় যতীন্দ্রনাথ চৌধুরী এম্, এ, বি, এল্ মহাশয় এই প্রস্তাব সমর্থন করিয়া বলিলেন, তাঁহার মাতৃভাষার প্রতি অনুরাগ বড়ই প্রশংসনীয়। ডাক্তার মুখোপাধ্যায় নিজব্যয়ে কাশীদাসী মহাভারতের মুদ্রাঙ্কণের এবং নিজে সম্পাদনের ভার লইয়াছেন। পরিষদের ইহা বড়ই আনন্দ ও শ্লাঘার কথা।

প্রস্তাব সর্ব্বসম্মতিক্রমে গৃহীত হইল।

তৎপরে সভার চতুর্থ নির্দ্দিষ্ট কার্য্য উপস্থিত হইলে, প্রস্তাবক শ্রীযুক্ত নগেন্দ্রনাথ গুপ্ত মহাশয় তাঁহার প্রস্তাব এই অধিবেশনে স্থগিত রাখিবার প্রস্তাব করিলে, প্রস্তাব গৃহীত হইল।

অতঃপর পণ্ডিতপ্রবর শ্রীযুক্ত কালীবর বেদান্তবাগীশ মহাশয় তাঁহার প্রবন্ধ পাঠের জন্য উপস্থিত করিয়া জানাইলেন যে, তিনি নিজে অসুস্থ, তাঁহার বন্ধু সঙ্গীতশাস্ত্রপারদর্শী, বিদ্বান সারদাপ্রসাদ ঘোষ মহাশয় তাঁহার হইয়া প্রবন্ধ পাঠ করিবেন। তদনুসারে সারদাবাবু বেদান্ত-বাগীশ মহাশয়ের প্রবন্ধ পড়িয়া শুনাইলেন।

[এই প্রবন্ধ ১৩১১ সালের শ্রাবণ সংখ্যায় বঙ্গদর্শনে প্রকাশিত হইয়াছে।]

বেদান্তবাগীশ মহাশয়ের প্রবন্ধের সারাংশ এই :—

ষড়দর্শনের মধ্যে গৌতমের দর্শন "ন্যায়"। ন্যায় বলিতে আমরা অনেক কথা বুঝি কিন্তু "ন্যায়শাস্ত্র" বলিলে গৌতমের দর্শন বুঝি, অন্য কিছু বুঝি না। ন্যায়শাস্ত্র বা ন্যায়দর্শন গৌতম প্রণীত এই টুকুমাত্র সর্ব্বজনবিদিত; কিন্তু তাহার বিষয় বহু লোকের অবিদিত। আজকাল বাঙ্গালা ভাষার এত উন্নতি যে, যে স্থানেই যাই, সেই স্থানেই সাংখ্যপাতঞ্জলাদি দর্শনের আলো-

লন শুনিতে পাই, কিন্তু কুত্রাপি ন্যায়দর্শনের প্রসঙ্গ ত শুনিতে পাই না। তবে কোন কোন বিষয়ী লোক আছেন যাঁহাদের কাছে পণ্ডিতমণ্ডলী যাতায়াত করেন, যদিও তাঁহারা জানেন যে ন্যায়শাস্ত্র ঈশ্বরানুমানের শাস্ত্র তথাপি সে জানা ঠিক্ নহে। তাঁহারা নব্য নৈয়ায়িকের মুখে মাত্র শুনিয়া ঐরূপ বলেন, ফলতঃ গৌতমের গ্রন্থে ঈশ্বর-প্রতিপাদক কোন সূত্র নাই। ঈশ্বর উপাস্য কি বিজ্ঞেয় তাহা গৌতমের দর্শনে বিচারিত হয় নাই। এই দর্শনের প্রথমেই প্রতিজ্ঞা-সূত্র তন্মধ্যে প্রমাণ-প্রমেয় প্রভৃতি ষোলপদার্থের উল্লেখ, ঈশ্বরের উল্লেখ নাই। প্রমেয় বিভাগে যে আত্মার উল্লেখ আছে, লক্ষণ ও পরীক্ষাসূত্র দৃষ্টে স্পষ্টই প্রতীত হয়, সে কথা জীবাত্মা-পর। গৌতমের মতে জীবাত্মবিষয়ক তত্ত্বজ্ঞানই মোক্ষপ্রদ কি না, তাহা গৌতমের গ্রন্থদ্বারা জানা যায় না; তবে চতুর্থ অধ্যায়ে প্রসঙ্গক্রমে ঈশ্বরের উল্লেখ দেখা যায় বটে, পরন্তু সে উল্লেখ উল্লেখমাত্র। অন্যান্য দর্শনের কথা প্রচারিত হইল, ন্যায়ের কথা হয় না কেন? কেহ বলেন ন্যায় বড় কঠিন, বড় দুর্ব্বোধ্য, পণ্ডিতসমাজ ব্যতীত সাধারণ সমাজে তাহার প্রচার হইতে পারে না। অন্যে বলেন,—ন্যায়ের বিষয় বা উদ্দেশ্য পদার্থ তত কঠিন বা দুর্ব্বোধ্য নহে, তাহার ভাষাই নিতান্ত দুর্ব্বোধ্য। বেদান্তবাগীশ মহাশয় শেষোক্ত কারণকেই ঠিক্ বলেন। তাঁহার মতে ন্যায়শাস্ত্রের ভাষা যৎপরোনাস্তি দুর্ব্বোধ্য ও দুরনুবাদ্য। সংস্কৃতানভিজ্ঞ লোকের কথা দূরে থাক, সংস্কৃতজ্ঞ কিন্তু ন্যায়শাস্ত্রানভিজ্ঞ, এরূপ লোকেও তাহার বিন্দুবিসর্গও বুঝিতে পারে না। বেদান্তবাগীশ মহাশয় ইহা উদাহরণাদি দ্বারা বিশদ করিয়া বুঝাইয়া দেন। তাঁহার মতে নৈয়ায়িক পণ্ডিতগণ ইচ্ছা করিয়া ন্যায়শাস্ত্রের ভাষা দুর্ব্বোধ করিয়াছেন। এ কথার প্রমাণও তিনি শ্রীহর্ষের "খণ্ডনখণ্ডখাদ্য" নামক গ্রন্থ হইতে উদ্ধৃত করিয়া শুনাইলেন। অন্যান্য দর্শনের সূত্রভাগ যেমন পদ্ধতিতে লিখিত, ন্যায়সূত্রও ঠিক সেই পদ্ধতিতে লিখিত। অন্যান্য দর্শনের ভাষ্য প্রভৃতি ব্যাখ্যাগ্রন্থের ভাষা যেরূপ, ন্যায়দর্শনের ভাষ্যগ্রন্থের ভাষাও তদ্রূপ। ন্যায় বঙ্গদেশে আসিয়াই রূপান্তর প্রাপ্ত হইয়াছে। অতঃপর তিনি ন্যায় কি, তাহা এবং তাহার অবয়ব পঞ্চকের ব্যাখ্যা করেন। তৎপরে ন্যায়দর্শনকার গৌতমের প্রসঙ্গ উত্থাপন করিয়া তিনি বলেন গোত্রকার, স্মৃতিকার, ন্যায়দর্শনকার, রামায়ণের অহল্যাপতি ও বুদ্ধ প্রভৃতি অনেক ব্যক্তি গৌতম নামে অভিহিত। বেদান্তবাগীশ মহাশয়ের মতে ইঁহারা সকলে এক ব্যক্তি নহেন। ন্যায়দর্শনকার গৌতমের শাস্ত্রানুসন্ধানে "অক্ষপাদ" নামে আর একটি নাম পাওয়া যায়। ছাপ্‌রা জেলার গৌতমাশ্রম নামে পরিচিত বর্ত্তমান স্থানই যদি যথার্থ গৌতমবাস হয় তবে রামায়ণের বর্ণনানুসারে অহল্যাপতি গৌতম ও ন্যায়শাস্ত্রকার গৌতম একব্যক্তি হইতে পারেন। ন্যায়ভাষ্যকার বাৎস্যায়ন ও চাণক্যপণ্ডিত একব্যক্তি। তিনি ২৪০০ বৎসর পূর্ব্বের লোক। ন্যায়দর্শনকার কাজেই তাহার বহু পূর্ব্বের। গৌতম মৈথিল ঋষি। তাঁহার ভাষ্য-কার বাৎস্যায়ন মৈথিলী এবং বার্ত্তিক উদ্দ্যোতকরাচার্য্যও মৈথিলী। ন্যায়বার্ত্তিকের তাৎপর্য্য-নাম্নী টীকাকার বাচস্পতি মিশ্র মৈথিলী এবং এই টীকার আবার তাৎপর্য্য লেখক উদয়নাচার্য্য, এই পর্য্যন্ত মূল ন্যায়দর্শনের বিস্তৃতি হইয়াছে। তৎপরে মিথিলাবাসী পক্ষধর মিশ্র, গঙ্গেশ

উপাধ্যায় এবং বঙ্গবাসী রঘুনাথ শিরোমণি, গদাধর ভট্টাচার্য্য, মথুরেশ ভট্টাচার্য্য, এবং জগদীশ তর্কালঙ্কার প্রভৃতি যাহা করিয়া গিয়াছেন, তাহাতে গৌতমদর্শন অপেক্ষা বৈশেষিকদর্শনেরই সম্যক্ উৎকর্ষ ও বিস্তৃতি সাধিত হইয়াছে। তৎপরে তিনি সংক্ষেপে গৌতমদর্শনের বিবরণ দিয়া প্রবন্ধ শেষ করিয়াছেন।

অতঃপর কোঁড়কদীনিবাসী পণ্ডিত শ্রীযুক্ত জানকীনাথ তর্করত্ন বেদান্তবাগীশ বলিলেন,—আজ যে প্রবন্ধ শুনিলাম ইহাতে ন্যায়ের ভাষার জটিলতা সম্বন্ধে কটাক্ষপাত আছে। ন্যায়ের ভাষা যতদূর গ্রাম্যভাষায় হইতে পারে, তাহা হওয়া উচিত এবং তাহাই হইয়াছে। প্রত্যেক ব্যক্তি বহ্নির বিষয় জানেন, ঘট, পট কি তাহা বুঝেন। উহাদের সামান্যার্থ প্রকাশ করা ন্যায়ের কার্য্য নহে। ন্যায়ের যাহা কার্য্য তাহা করিতে হইলে ন্যায়শাস্ত্রে ব্যবহৃত ভাষাই অবলম্বন না করিলে তাহা সিদ্ধ হইবে কেন? তদ্ধিতের ত্ব ও তা প্রত্যয়ান্ত কতকগুলি বিশেষ্য-পদের প্রয়োজনানুসারে ক্রমিক প্রয়োগে ভাষা কতকটা দুর্ব্বোধ্য হয় বটে। প্রবন্ধকার বলিয়াছেন, এ ভাষা এত জটিল কেন বুঝি না। দুর্ব্বোধ্য হইতে পারে কিন্তু অবোধ্য নহে। গুরুবাক্য দ্বারা এই ভাষার অর্থ সহজেই বোধ হইয়া থাকে। অক্ষপাদ নামের কোন প্রমাণ নাই এমন নহে। অক্ষপাদ সম্বন্ধে প্রবন্ধকার যে প্রবাদ শুনাইলেন, তাহা এই নূতন শুনিলাম। আমরা শুনিয়াছি গৌতম এই সমস্ত পদার্থ ঠিক কি না এই চিন্তা করিয়া ভাবিলেন, অন্ধভাবে বিশ্বাস না করিলে এ সকল কিছুই বুঝা যায় না। সুতরাং গৌতম যুক্তি প্রমাণ অন্বেষণ করিতে লাগিলেন। একদিন গৌতম চক্ষু বুজিয়া এই সকল ভাবিতে ভাবিতে যাইতে ছিলেন, পথে কূপে পড়িয়া যান। অতঃপর ব্রহ্মা বর দিলেন তোমার পা আর অস্থানে পড়িবে না। তদবধি গৌতমের অক্ষপাদ নাম হইল। অতঃপর বক্তা ন্যায়শাস্ত্রে ঈশ্বর ও মুক্তি সম্বন্ধে কি কি কথা আছে তাহা ব্যাখ্যা করিলেন। অনুমানের প্রয়োজনীয়তা বুঝাইতে গিয়া বলিলেন, নাস্তিক সমাজ যত অকল্যাণ লইয়াই আছে। ইহার উদাহরণস্বরূপ বলিলেন বনবাসে আসিয়া রামচন্দ্র চিত্রকূটে বাস করিতেন। ভরত তাঁহাকে ফিরাইয়া লইতে আসেন। জাবালি যুক্তিপথ অবলম্বনে রামচন্দ্রকে বন গমন হইতে নিরস্ত করিতে চেষ্টা করিলে রামচন্দ্র বলিয়াছিলেন,—"আমি ধর্ম্মবুদ্ধি-প্রণোদিত হইয়া ব্রতগ্রহণ করিয়াছি, আপনি কতকগুলি অসার যুক্তি দ্বারা আমাকে তৎপথ-হইতে বিচলিত করিতে আসিয়াছেন। ন্যায়শাস্ত্রের মত এরূপ ধর্ম্মহীন শাস্ত্র যাঁহারা অধ্যয়ন করিবেন, আমার অভিশাপে তাঁহারা জন্মান্তরে শৃগালযোনি প্রাপ্ত হইবেন।" পণ্ডিত মহাশয় বলিলেন এই ক্রূর কটাক্ষ কেবল প্রত্যক্ষবাদী নাস্তিক বৌদ্ধনৈয়ায়িকগণের প্রতি। বস্তুতঃ ন্যায়শাস্ত্র, বুদ্ধিকে মার্জ্জিত করিয়া উহাকে ধর্ম্মমুখী করে। নাস্তিকেরা অনুমান প্রমাণ স্বীকার করে না। অনুমানের মধ্যে কি আছে, তাহা দেখাইয়া দেওয়া চাই। ইন্দ্রিয়সাধ্য জ্ঞানও প্রত্যক্ষ জ্ঞান। নাস্তিকেরা বলে প্রত্যক্ষ যাহা দেখিতেছি তাহার অস্তিত্বে সন্দেহ হয় না, অনুমান মানি না, কিন্তু অনুমান বিশ্বাস না করিলে নিজের যে চক্ষু আছে তাহা বিশ্বাস হয় না। দর্পণাদিতে দৃষ্ট প্রতিবিম্ব চক্ষু বলিয়া অনুমান না করিলে চলে না।

অতঃপর মহামহোপাধ্যায় শ্রীযুক্ত কামাখ্যানাথ তর্কবাগীশ মহাশয় বলিলেন,—"ন্যায়ের ভাষা পণ্ডিতগণ ইচ্ছা করিয়া জটিল করেন নাই। ঘট নাই বলিতে ঘটাভাব এবং নীলঘট নাই বলিতে ঘটাভাব বুঝায়, কিন্তু এই দুই ঘটাভাবের মধ্যে পার্থক্য আছে, তাঁহা বুঝাইতে কতকগুলি পারিভাষিক শব্দ গ্রহণ করা ভিন্ন উপায়ান্তর নাই।" এই ব্যাপারের জন্য মহামহোপাধ্যায় পণ্ডিতগণ যে সকল পারিভাষিক শব্দগ্রহণ করিয়াছেন তদপেক্ষা সহজভাষায় যদি কেহ ঐ সকল কথা বুঝাইতে পারেন তাহা হইলে তর্কবাগীশ মহাশয় নিজ পুঁথিপত্র গঙ্গাগর্ভে বিসর্জ্জন দিতে প্রস্তুত হইবেন। তৎপরে তিনি বলেন,—বেদান্তবাগীশ মহাশয় অক্ষপাদ শব্দের কারণবোধক যে কিম্বদন্তীর উল্লেখ করিলেন তাহা নূতন। ন্যায়শাস্ত্র যে বৌদ্ধবিদ্যা এ যুক্তি অমূলক। গুরু-পরম্পরাক্রমে এ বিদ্যা চলিয়া আসিতেছে। ন্যায়ের ভাষা জটিল বটে, আর সেই জন্য নবদ্বীপের টোলের তিন চারি শত ছাত্রের মধ্যে বৎসরে তিন চারিটীর অধিক উত্তীর্ণ হয় না। ন্যায়ের ভাষা জটিল না হইলে চলে না।

তৎপরে পণ্ডিত শ্রীযুক্ত সতীশচন্দ্র বিদ্যাভূষণ এম্, এ মহাশয় বলিলেন,—আজ পরিষদে এই পণ্ডিতের অপূর্ব্ব সম্মিলন দেখিয়া আনন্দে আপ্লুত হইতে হয়। অদ্যকার প্রবন্ধপাঠক বেদান্তবাগীশ মহাশয় অগাধ পণ্ডিত। তাঁহার পাতঞ্জল ও সাংখ্যদর্শনের গ্রন্থাদি বাঙ্গালা ভাষার কি উপকার সাধন করিয়াছে তাহা বলা যায় না। আজকার সভাপতি যিনি, তিনি সমস্ত বঙ্গদেশের পণ্ডিতমণ্ডলীর মাননীয় এবং বলিতে কি স্বয়ং গৌতমই যেন আজ সভাপতি হইয়াছেন। মহামহোপাধ্যায় শ্রীযুক্ত কামাখ্যানাথ তর্কবাগীশ মহাশয় একাই সহস্র, শ্রীকৃষ্ণদাস বেদান্তবাগীশ মহাশয় বেদান্তবাদী হইলেও ন্যায়ের বিরোধী নহেন। অদ্যকার সভায় দুইদল উপস্থিত, একদল বলিতেছেন ন্যায়ের ভাষা সরল হউক, অপর দল বলিতেছেন ন্যায়ের ভাষা ন্যায়ের মত না হইলে চলে না। উভয় পক্ষেই কিঞ্চিৎ সত্য আছে। পারিভাষিক শব্দে জটিলতা থাকা সম্ভব। বেদান্তবাগীশ মহাশয় বেদান্তের প্রতি যে সহানুভূতি দেখাইয়াছেন, তাহা অসঙ্গত নহে। গৌতম যে মিথিলার অধিবাসী ছিলেন তাহা ঠিক্ নয়। চাণক্য বাৎস্যায়ন ভিন্ন বাৎস্যায়ন আরও ছিলেন।

অতঃপর তিনি বলিলেন, নবদ্বীপে ন্যায়ের একটী বিশেষত্ব আছে। ইতিপূর্ব্বে ন্যায় শাস্ত্র ধর্ম্মের অঙ্গীভূত ছিল। কিন্তু নবদ্বীপের জগদ্বিখ্যাত নৈয়ায়িকগণ ধর্ম্ম হইতে স্বতন্ত্র করিয়া সুধু বুদ্ধিবৃত্তি ও যুক্তির অনুশীলনের উপায়ে পরিণত করেন।

অতঃপর দিঙ্নাগাচার্য্য গঙ্গেশ উপাধ্যায় প্রভৃতি পণ্ডিতগণের সময়াদি নিরূপণ সম্বন্ধে কিছু কিছু আলোচনা করেন।

অতঃপর শ্রীযুক্ত কৃষ্ণচন্দ্র বেদান্তবাগীশ মহাশয় বলিলেন, অক্ষপাদ শব্দে পায়ে চক্ষুরুৎপত্তির কথা বিশ্বাস করা যায় না। অতঃপর প্রবন্ধের বিষয় সম্বন্ধে অল্পবিস্তর আলোচনা করেন।

তৎপরে সভাপতি মহাশয় বলিলেন, শাস্ত্রের যথার্থ কাল উপলব্ধি করিতে হইলে ন্যায়ের সহায়তা চাই। ন্যায়ের যে সকল বিষয় উপযোগিতা আছে, তাহা জানিতে হইলে ন্যায়ের চর্চ্চা

আবশ্যক। বেদান্তবাগীশ মহাশয় সাধারণের বোধগম্য করিবার জন্য ন্যায়শাস্ত্র সম্বন্ধে আজ এই প্রবন্ধ পাঠ করিয়া সেই আলোচনার সূত্রপাত করিলেন। আশা করি, এই আলোচনা বিস্তৃত হইবে।

অতঃপর মাননীয় ডাক্তার শ্রীযুক্ত গুরুদাস বন্দ্যোপাধ্যায় কে, টী মহাশয় সভাপতি ও প্রবন্ধ-পাঠককে এবং সাহিত্য-পরিষদে এই অপূর্ব্ব পণ্ডিতমণ্ডলীর সম্মিলন উপলক্ষে পণ্ডিতমণ্ডলীকে ধন্যবাদ জানাইলে সভাভঙ্গ হইল।

শ্রীরামেন্দ্রসুন্দর ত্রিবেদী	শ্রীশিবনাথ শাস্ত্রী
সম্পাদক।	সভাপতি

তৃতীয় মাসিক অধিবেশন।

শনিবার, ৮ই শ্রাবণ, ২২শে জুলাই।

উপস্থিত ব্যক্তিগণ।

পণ্ডিত	শ্রীযুক্ত	শিবনাথ শাস্ত্রী এম্,এ, (সভাপতি)	শ্রীযুক্ত	হেমচন্দ্র দাস গুপ্ত, এম্ এ; M.R.A.S.
	„	নগেন্দ্রনাথ বসু	„	বিশ্বেশ্বর ভট্টাচার্য্য এম্ এ
	„	নিখিলনাথ রায় বি, এল্	„	কামিনীনাথ রায়
	„	দীনেশচন্দ্র সেন বি, এ	„	পঞ্চানন বন্দ্যোপাধ্যায় বি, এ
	„	হীরেন্দ্রনাথ দত্ত এম্ এ; বি, এল্	„	যোগেন্দ্রনাথ মিত্র এম্ এ,
রায়	„	যতীন্দ্রনাথ চৌধুরী এম এ, বি এল্	„	চারুচন্দ্র ঘোষ
পণ্ডিত	„	সতীশচন্দ্র বিদ্যাভূষণ এম,এ	„	অমূল্যচরণ ঘোষ বিদ্যাভূষণ
	„	নগেন্দ্রনাথ গুপ্ত	„	অমরাপতি বন্দ্যোপাধ্যায়
	„	ক্ষীরোদপ্রসাদ বিদ্যাবিনোদ এম, এ	„	পূর্ণচন্দ্র দে বি, এ
	„	পূর্ণচন্দ্র গোস্বামী এম, এ	„	যোগেশচন্দ্র ঘোষ
	„	রমেশচন্দ্র বসু	„	রামেন্দ্রসুন্দর ত্রিবেদী এম,এ (সম্পাদক)
	„	সত্যভূষণ বন্দ্যোপাধ্যায়	„	মন্মথমোহন বসু } সহঃ সম্পাদকদ্বয়
ডাক্তার	„	চুনীলাল সরকার এম, এ; L.M.S.	„	ব্যোমকেশ মুস্তফী } সহঃ সম্পাদকদ্বয়

সভাপতি মহাশয়ের অনুপস্থিতিতে শ্রীযুক্ত শিবনাথ শাস্ত্রী এম্, এ মহাশয় অনুরুদ্ধ হইয়া সভাপতির আসন গ্রহণ করিলেন।

১। গত অধিবেশনের কার্য্য-বিবরণ পঠিত ও অনুমোদিত হইল।

২। নিম্নোক্ত সভ্যগণ যথারীতি নির্ব্বাচিত হইলেন।

প্রস্তাবক	সমর্থক	সভ্য
শ্রীব্যোমকেশ মুস্তফী	শ্রীরামেন্দ্রসুন্দর ত্রিবেদী	(১) শ্রীসুরেন্দ্রনাথ গোস্বামী
শ্রীবিহারীলাল মুখোপাধ্যায়	শ্রীব্যোমকেশ মুস্তফী	(২) মৌলবী শ্রীসিরাজউলইস্লামখাঁ বাহাদুর

প্রস্তাবক	সমর্থক	সভ্য
শ্রীনগেন্দ্রনাথ বসু	শ্রীব্যোমকেশ মুস্তফী	(৩) শ্রীহরিচরণ সারকেল, উকীল, হাইকোর্ট
শ্রীরামেন্দ্রসুন্দর ত্রিবেদী		(৪) শ্রীরাজেন্দ্রনাথ চক্রবর্ত্তী উকীল, ঐ
		(৫) শ্রীমহেন্দ্রলাল চট্টোপাধ্যায়, শিবপুর
		(৬) শ্রীঅমরকৃষ্ণ দত্ত, ৯ রামতনু বসুর লেন
		(৭) শ্রীবিশ্বেশ্বর ভট্টাচার্য্য, ডেপুটিম্যাজিষ্ট্রেট, ৯৫।১ বারাণসী ঘোষের ষ্ট্রীট
		(৮) শ্রীকেদারনাথ দাস গুপ্ত, ৭ কর্ণওয়ালিস ষ্ট্রীট

৩। সভ্য-নির্ব্বাচনের পর সভাপতি শ্রীযুক্ত শিবনাথ শাস্ত্রী মহাশয় নিম্নোক্ত প্রস্তাব উপস্থিত করিলেন ;—

"বঙ্গীয় সাহিত্য-পরিষদের পরম হিতৈষী সদস্য ও বঙ্গসাহিত্যের অনুরক্ত ভক্ত স্বদেশবৎসল নানাশাস্ত্রবিৎ সর্ব্বজনপ্রিয় পরমধার্ম্মিক সার্ গুরুদাস বন্দ্যোপাধ্যায় এম্, এ; ডি, এল মহোদয়ের মহামান্য হাইকোর্টের বিচারাসন বহুদিন অলঙ্কৃত করিয়া অবসরগ্রহণান্তে রাজসম্মান-লাভ উপলক্ষে সাহিত্য-পরিষৎ পরম আনন্দ প্রকাশ করিতেছেন। পরিষদের প্রার্থনা যে, তিনি দীর্ঘজীবী হইয়া স্বদেশের ও স্বদেশীয় সাহিত্যের কল্যাণ অনুষ্ঠানে নিরত থাকুন"। সভাপতি মহাশয় এই প্রসঙ্গে মান্যবর বন্দ্যোপাধ্যায় মহাশয়ের গুণকীর্ত্তন করিয়া উপবেশন করিলে, উপস্থিত সভ্যগণকর্ত্তৃক অতীব আহ্লাদসহকারে ঐ প্রস্তাব গৃহীত হইল।

৪। প্রস্তাবকর্ত্তা শ্রীযুক্ত নগেন্দ্রনাথ গুপ্ত মহাশয় তখনও সভাস্থলে উপস্থিত না হওয়ায় পূর্ব্ব অধিবেশনে তাঁহার যে প্রস্তাব স্থগিত ছিল, তাহা এবারও স্থগিত রহিল।

৫। শ্রীযুক্ত নগেন্দ্রনাথ গুপ্ত মহাশয় তখনও উপস্থিত না হওয়ায় তৎপ্রেরিত বিদ্যাপতির তাম্রশাসন শ্রীযুক্ত নগেন্দ্রনাথ বসু কর্ত্তৃক সভাস্থলে উপস্থাপিত ও প্রদর্শিত হইল। নগেন্দ্রবাবু বলিলেন,—মাননীয় বিচারপতি শ্রীযুক্ত সারদাচরণ মিত্র ও শ্রীযুক্ত নগেন্দ্রনাথ গুপ্ত মহাশয়েরা পরিষদের জন্য বিদ্যাপতির পদাবলীর সংগ্রহে ও সঙ্কলনে নিযুক্ত আছেন। শ্রীযুক্ত দ্বারবঙ্গাধিপ এ বিষয়ে তাঁহাদের সাহায্য করিতেছেন। দ্বারবঙ্গাধিপতি বিদ্যাপতির দৌহিত্রবংশীয়দের নিকট হইতে এই তাম্রশাসনখানি সংগ্রহ করিয়া মাননীয় সারদাবাবুর নিকট পাঠাইয়াছেন। কিছুকাল পূর্ব্বে গ্রিয়ার্সন্ সাহেব এসিয়াটিক সোসাইটিতে বিদ্যাপতির তাম্রশাসনের আবিষ্কারের বিবরণ দিয়াছিলেন। বক্তা সেই তাম্রশাসনের প্রতিলিপির সহিত এই নূতন আবিষ্কৃত তাম্রশাসন মিলাইয়া দেখিয়াছেন। দেখা গিয়াছে উভয় তাম্রশাসনে পাঠের পার্থক্য নাই, কিন্তু খোদন কার্য্যে উভয়ের পংক্তিবিন্যাস ভিন্নরূপ। অতএব একখানিকে অন্যখানির অনুলিপি বলা চলিতে পারে। রাজা শিবসিংহ বিদ্যাপতিকে বিসপী গ্রাম প্রদান করিয়াছিলেন, তাহাই তাম্রশাসনের বিষয়। সেই মূল তাম্রশাসন এ পর্য্যন্ত অনাবিষ্কৃত রহিয়াছে। এই দুইখানিই তাহার জাল অনুকরণ। যে কারণে গ্রিয়ার্সনের তাম্রশাসন জাল বলিয়া অনুমিত হয়, সেই কারণ এস্থলেও

প্রযোজ্য। তাম্রশাসনে তারিখের স্থানে সংবৎ, শকাব্দ ও সনের উল্লেখ আছে। বিদ্যাপতি যে সময়ে বর্ত্তমান ছিলেন, তখনও মুসলমানি সনের প্রচলন হয় নাই। জালকর্ত্তা এ তথ্য জানিতেন না, এই সংবৎ ও শকাব্দের স্থানে সনও বসাইয়া দিয়াছেন। এতদ্ব্যতীত এই নূতন তাম্রশাসনের লিপি দেখিয়া ত ইহাকে অপেক্ষাকৃত আধুনিক কালে খোদিত বলিয়া মনে হয়। বিদ্যাপতির সময়ে এরূপ লিপি চলিত ছিল না। নূতন তাম্রশাসনে দেবনাগর অক্ষর ব্যবহৃত। সম্ভবতঃ সম্পত্তি লইয়া কোন বিবাদ উপস্থিত হইলে বিদ্যাপতির কোন বংশধর আদালতে দাখিল করিবার জন্য এই তাম্রশাসন প্রস্তুত করাইয়াছিলেন। মূল তাম্রশাসন তখন হারাইয়া গিয়াছিল, তাহার স্মৃতিমাত্র বর্ত্তমান ছিল। তাম্রশাসনে যে তারিখ দেওয়া হইয়াছে, তাহার উপর নির্ভর করিতে না পারিলেও তাম্রশাসনে বিদ্যাপতির যে বিবরণ দেওয়া হইয়াছে, তাহার ঐতিহাসিকতা অপ্রামাণিক মনে করিবার কারণ নাই।

শ্রীযুক্ত সতীশচন্দ্র বিদ্যাভূষণ ও শ্রীযুক্ত দীনেশচন্দ্র সেন মহাশয়েরাও এই নূতন তাম্রশাসন দেখিয়া, উহাকে কৃত্রিম বলিয়াই অনুমান করিলেন।

শ্রীযুক্ত রামেন্দ্রসুন্দর ত্রিবেদী মহাশয় অনুরোধ করিলেন, পরিষদের জন্য নগেন্দ্রবাবু যে বিদ্যাপতির পদাবলী বাহির করিতেছেন, তাহার ভূমিকায় যেন এই তাম্রশাসনের ফটোগ্রাফ বাহির করা হয় এবং এই তাম্রশাসন ও পূর্ব্বাবিষ্কৃত গ্রিয়ার্সনের তাম্রশাসন সম্বন্ধে বিচার-বিতর্ক প্রকাশিত হয়।

৬। শ্রীযুক্ত দীনেশচন্দ্র সেন মহাশয় "কাবুলীওয়ালা" নামক প্রবন্ধ পাঠ করিলেন। 'ঐ প্রবন্ধে দীনেশবাবু কাবুলীর নিকট সংগৃহীত তাহাদের দেশের ও তাহাদের সামাজিক প্রথার ও আচারাদির বিবরণ সঙ্কলন করিয়াছেন।* কাবুলের নারীগণের বর্ণনাপ্রসঙ্গে লেখক বলিলেন, আমাদের গান্ধারী, মাদ্রী, কৈকেয়ী প্রভৃতি রাজ্ঞীরা কাবুল ও তৎসন্নিহিত প্রদেশ হইতে আসিয়াছিলেন ও আমাদের মহাদেবী পার্ব্বতীর পৌরাণিক রূপ কল্পনায় সম্ভবতঃ কাবুলীনারীর ছায়া বিদ্যমান আছে। কাবুলী-দিগের প্রকৃতিগত ও আচারগত বিশিষ্টতা অতি হৃদয়গ্রাহী ভাষায় এই প্রবন্ধে বর্ণিত হইয়াছে। প্রবন্ধ-পাঠের পর শ্রীযুক্ত রায় যতীন্দ্রনাথ চৌধুরী, পণ্ডিত শ্রীযুক্ত সতীশচন্দ্র বিদ্যাভূষণ ও শ্রীযুক্ত পঞ্চানন বন্দ্যোপাধ্যায় দীনেশ বাবুর প্রবন্ধের মনোজ্ঞতার ও ভাষার কবিসুলভ চমৎকারিতার প্রশংসা করিয়া, তাঁহার নিকট কৃতজ্ঞতা জানাইলেন। পার্ব্বতী সম্বন্ধে দীনেশবাবুর উক্তিতে পঞ্চানন বাবু আপত্তি করায় দীনেশবাবু তাহার উত্তর দিলেন। সতীশবাবু কাবুলীদের সম্বন্ধে বলিলেন, ঐ প্রদেশ বহুদিন গ্রীকদিগের অধিকারে ছিল; কাবুলীদের শরীরে ও চরিত্রে সম্ভবতঃ গ্রীক উপাদান অদ্যাপি বিদ্যমান আছে।

৭। শ্রীযুক্ত হেমেন্দ্রপ্রসাদ ঘোষ মহোদয়ের অনুপস্থিতিতে তাঁহার "ভারতচন্দ্রীয় যুগের রাজনৈতিক অবস্থা" সম্পাদক কর্ত্তৃক পঠিত হইল। এই প্রবন্ধে হেমেন্দ্র বাবু ভারতচন্দ্রের

* ঐ প্রবন্ধ ১৩১১ সালের ভাদ্র মাসের ভারতীতে প্রকাশিত হইয়াছে

জন্মগ্রহণের পরবর্ত্তী কালে ভারতবর্ষের ও বঙ্গদেশের রাজনৈতিক অবস্থার বিবরণ সঙ্কলন করিয়াছেন এবং মোগলসাম্রাজ্যের অধঃপতন ও তাহার আনুষঙ্গিক ঘটনাগুলি বর্ণিত হইয়াছে।*

প্রবন্ধ-পাঠের পর শ্রীযুক্ত পঞ্চানন বন্দ্যোপাধ্যায় মহাশয় প্রবন্ধ সম্বন্ধে কিঞ্চিৎ আলোচনা করিলেন। প্রবন্ধ-পাঠক মহাশয় অনুপস্থিত থাকায় প্রবন্ধের বিশেষ আলোচনা উপস্থিত সভ্যগণের মতে আবশ্যক বিবেচিত হইল না।

৮। সম্পাদক শ্রীযুক্ত রামেন্দ্রসুন্দর ত্রিবেদী সাহিত্যপরিষদে উপহৃত গ্রন্থগুলি প্রদর্শন করিয়া উপহারকর্ত্তাদিগকে ধন্যবাদের প্রস্তাব করিলেন। উহা সভাকর্ত্তৃক অনুমোদিত হইল। "বঙ্গবাসী" স্বত্বাধিকারী শ্রীযুক্ত যোগীন্দ্রনাথ বসু মহাশয়ের প্রদত্ত বঙ্গবাসী কার্য্যালয় হইতে প্রকাশিত মূল সানুবাদ বাল্মীকি রামায়ণ, নীলকণ্ঠের টীকা সহিত মূল মহাভারত, ব্রহ্মবৈবর্ত্ত-পুরাণের বঙ্গানুবাদ, রামেশ্বরের শিবায়ন প্রভৃতি একরাশি গ্রন্থের জন্য পরিষদ বিশেষরূপে কৃতজ্ঞ হইলেন।

৯। সভাপতি শ্রীযুক্ত শিবনাথ শাস্ত্রী মহাশয় প্রবন্ধপাঠক দীনেশবাবুর প্রবন্ধের বিশেষ প্রশংসা করিয়া সভাভঙ্গ করিলেন।

শ্রীরামেন্দ্রসুন্দর ত্রিবেদী,	শ্রীসতীশচন্দ্র বিদ্যাভূষণ,
সম্পাদক।	সভাপতি।

চতুর্থ মাসিক অধিবেশন।

১১ ই ভাদ্র, ২৭ আগষ্ট, শনিবার, বেলা ৫॥ টা।

উপস্থিত ব্যক্তিগণ।

শ্রীযুক্ত সতীশচন্দ্র বিদ্যাভূষণ এম্,এ (সভাপতি)	শ্রীযুক্ত যোগেশচন্দ্র ঘোষ
" রায় যতীন্দ্রনাথ চৌধুরী এম্, এ; বি, এল্	" মুনীন্দ্রনাথ সাংখ্যরত্ন
" নগেন্দ্রনাথ গুপ্ত	" পঞ্চানন বন্দ্যোপাধ্যায় বি, এ
" নগেন্দ্রনাথ বসু	" যাদবচন্দ্র মিত্র
" সুরেশচন্দ্র সমাজপতি	" চারুচন্দ্র বন্দ্যোপাধ্যায়
" যতীশচন্দ্র সমাজপতি	" আনন্দনাথ রায়
" নিখিলনাথ রায় বি, এল্	" যোগীন্দ্রচন্দ্র বসু বি, এ
" কেদারনাথ ভট্টাচার্য্য	" আনন্দগোপাল ঘোষ
" হীরেন্দ্রনাথ দত্ত এম্, এ; বি, এল্	" বামাচরণ চট্টোপাধ্যায়
" অমৃতকৃষ্ণ মল্লিক বি, এল্	" বীরেশ্বর গোস্বামী বি, এল্
" দীনেশচন্দ্র সেন বি,এ	" তারকেশ্বর পাল চৌধুরী বি, এল্

* এই প্রবন্ধ ১৩১১ সালের ভাদ্র মাসের সাহিত্যে প্রকাশিত হইয়াছে।

শ্রীযুক্ত বাণীনাথ নন্দী	শ্রীযুক্ত তারকেশ্বর ভট্টাচার্য্য
„ ললিতচন্দ্র মিত্র এম্, এ	„ বিশ্বেশ্বর ভট্টাচার্য্য এম্, এ
„ রমেশচন্দ্র বসু	„ রামেন্দ্রসুন্দর ত্রিবেদী এম্, এ (সম্পাদক)
„ সরসীলাল সরকার এম্, এ; এল, এম্, এস্	„ মন্মথমোহন বসু B.A. } (সহঃ সম্পাদকদ্বয়)
„ হেমেন্দ্রচন্দ্র ঘোষ	„ ব্যোমকেশ মুস্তফী }

এতদ্ভিন্ন সভাস্থলে বহুলোক উপস্থিত ছিলেন। সভাপতি ও সহকারী সভাপতি মহোদয়গণের অনুপস্থিতিতে শ্রীযুক্ত নিখিলনাথ রায়ের প্রস্তাবে অধ্যাপক শ্রীযুক্ত সতীশচন্দ্র বিদ্যাভূষণ এম্, এ মহাশয় সভাপতির আসন গ্রহণ করিলেন।

১। গত অধিবেশনের কার্য্যবিবরণ পঠিত ও অনুমোদিত হইলে নিম্নলিখিত সভ্যগণ যথারীতি নির্ব্বাচিত হইলেন,—

প্রস্তাবক	সমর্থক	সভ্য
শ্রীসুরেশচন্দ্র সমাজপতি	শ্রীরামেন্দ্রসুন্দর ত্রিবেদী	১ শ্রীসিদ্ধমোহন মিত্র, হায়দরাবাদ
শ্রীরাজকৃষ্ণ দত্ত	শ্রীব্যোমকেশ মুস্তফী	২ শ্রীনগেন্দ্রনাথ বন্দ্যোপাধ্যায়, ৮ কেদারদত্তের লেন
শ্রীসরসীলাল সরকার	শ্রীহীরেন্দ্রনাথ দত্ত	৩ শ্রীশৈলেন্দ্রনাথ বসু, ১৪ বলরাম ঘোষের ষ্ট্রীট
শ্রীরমণীমোহন মল্লিক	শ্রীব্যোমকেশ মুস্তফী	৪ শ্রীবিশ্বেশ্বর সান্যাল, ৬ চৌধুরীর লেন
		৫ শ্রীসুরেন্দ্রনারায়ণ রায়
শ্রীরামেন্দ্রসুন্দর ত্রিবেদী	শ্রীমন্মথমোহন বসু	৬ শ্রীনগেন্দ্রনাথ বন্দ্যোপাধ্যায় বি,এল উকীল, ছাপরা
		৭ শ্রীউমেশচন্দ্র ঘোষ বি,এল, উকীল, ছাপরা
		৮ শ্রীকৃষ্ণকিশোর অধিকারী এম্,এ পুরুলিয়া
শ্রীমন্মথমোহন বসু	শ্রীব্যোমকেশ মুস্তফী	৯ শ্রীকানাইলাল বসু, রেঙ্গুন
		১০ শ্রীযতীশচন্দ্র সিংহ বি,এ ৫৫।৫ গ্রে ষ্ট্রীট
শ্রীঅতুলচন্দ্র গোস্বামী	শ্রীনগেন্দ্রনাথ বসু	১১ পণ্ডিত শ্রীনিত্যস্বরূপ ব্রহ্মচারী, বৃন্দাবন
		১২ শ্রীশশিভূষণ বন্দ্যোপাধ্যায়, কাল্না

২। শোকপ্রকাশ,—শ্রীযুক্ত রামেন্দ্রসুন্দর ত্রিবেদী এম্,এ সম্পাদক মহাশয় পরিষদের সভ্য ৺রমানাথ ঘোষ মহাশয়ের অকালমৃত্যুর জন্য এই প্রস্তাব উপস্থিত করিলেন :—বঙ্গীয় সাহিত্য-পরিষদের সদস্য ও পরম সুহৃৎ ও বঙ্গীয়সমাজের পরম হিতৈষী ৺রমানাথ ঘোষ মহাশয়ের অকালমৃত্যুতে সাহিত্য-পরিষৎ গভীর শোকসন্তপ্ত হইয়াছেন ও তাঁহার শোকার্ত্ত পরিবারবর্গের সহিত আন্তরিক সমবেদনা প্রকাশ করিতেছেন।" প্রস্তাবকর্ত্তা ৺রমানাথ বাবুর সহিত পরিষদের সম্বন্ধের, পরিষদের প্রতি তাঁহার অনুগ্রহের ও পরিষদের গৃহনির্ম্মাণার্থ ৫০০্ পাঁচশত টাকা সাহায্যের প্রতিশ্রুতির বিষয় উল্লেখ করিয়া ঐ প্রস্তাব উপস্থিত করিলে পর শ্রীযুক্ত রায় যতীন্দ্রনাথ চৌধুরী এম্,এ; বি,এল্, মহাশয় মৃত মহাত্মার সমাজহিতৈষিতা ও বিবিধ গুণরাশির উল্লেখ করিয়া উক্ত প্রস্তাব সমর্থন করিলেন। প্রস্তাব গৃহীত হইল ও ৺রমানাথ বাবুর পরিবারবর্গের নিকট তাহার প্রতিলিপি প্রেরণের আদেশ হইল।

৩। যবদ্বীপে হিন্দুপ্রভাবের নিদর্শন প্রদর্শন। শ্রীযুক্ত নগেন্দ্রনাথ বসু মহাশয় Wilsen's Elephant Folio On Barabodor ও অন্যান্য গ্রন্থ হইতে যবদ্বীপে হিন্দু-সভ্যতার নিদর্শন-স্বরূপ বিবিধ দেবমন্দির ও দেবদেবীর প্রতিকৃতি প্রদর্শন করিলেন। তদুপলক্ষে নগেন্দ্রবাবু যবদ্বীপের বড়বদর ও ব্রহ্মবনম্ নামক দুই মন্দিরের সবিশেষ উল্লেখ করিয়া বলিলেন, উহার কিয়দংশ খৃষ্টীয় ১ম ও ৫ম শতাব্দীর মধ্যে নির্ম্মিত। বড়বদর মন্দিরের প্রথম ও দ্বিতীয় মঞ্চে বৌদ্ধস্থাপত্যের নিদর্শন আছে ও তৃতীয়, চতুর্থ ও পঞ্চম মঞ্চে হিন্দুদেবদেবীর লীলাদির চিত্র ও হিন্দুর সামাজিক ও পারিবারিক চিত্র অঙ্কিত আছে। ব্রহ্মবনের বহু প্রতিমূর্ত্তি মধ্যে ব্রহ্মা, বিষ্ণু, মহেশ্বর, গণেশ ও মহিষমর্দ্দিনীর মূর্ত্তি সবিশেষ উল্লেখযোগ্য। উহাতে ১ম শতাব্দীর শিলালিপি আবিষ্কৃত হওয়ায় যবদ্বীপে হিন্দুপ্রভাবের প্রাচীনত্ব সপ্রমাণ হইতেছে।

চিত্রপ্রদর্শনের পর শ্রীযুক্ত পঞ্চানন বন্দ্যোপাধ্যায় মহাশয় সুদীর্ঘ ও সুন্দর বক্তৃতায় যবদ্বীপে আবিষ্কৃত হিন্দুমন্দির, হিন্দুদেবমূর্ত্তি ও হিন্দু-সভ্যতার বিবিধ নিদর্শনের বিস্তৃত পরিচয় দিয়া সভাকে অনুগৃহীত করিলেন। যবদ্বীপস্থিত হিন্দু মন্দির প্রভৃতির বিশালতা ও বিস্ময়জনকতার বিবরণ সভ্যগণের কৌতূহলোদ্দীপক হইয়াছিল।

নগেন্দ্রবাবু ও পঞ্চানন বাবুকে ধন্যবাদ দিয়া ঐ প্রসঙ্গে সভাপতি মহাশয় বলিলেন, খৃঃ পূঃ তৃতীয় শতাব্দীতে অশোকের প্রেরিত কতিপয় বৌদ্ধপ্রচারক যবদ্বীপে উপস্থিত হইয়াছিলেন। পরবর্ত্তী কালে তান্ত্রিক বৌদ্ধধর্ম্ম যবদ্বীপে প্রচারিত হয়। যবদ্বীপে ভারতবর্ষীয় সভ্যতার বিস্তার প্রথমে সম্ভবতঃ চীনবাসী নাবিক ও পরিব্রাজকদ্বারাই ঘটিয়াছিল। প্রথম হইতে সপ্তম শতাব্দীর মধ্যে প্রধানতঃ বৌদ্ধ ও তৎপরে হিন্দু-প্রভাব প্রসারিত হইয়াছিল। যবদ্বীপে যে সকল দেবমূর্ত্তি পাওয়া যায়, তাহা মুখ্যতঃ তান্ত্রিক উপাসনা-প্রচারের নিদর্শন। রামায়ণে যবদ্বীপের উল্লেখ আছে, কিন্তু কোন বিবরণ নাই। ভারতবর্ষের সহিত যবদ্বীপের সম্বন্ধ কত প্রাচীন তাহার নির্দ্দেশ কঠিন।

৪। প্রবন্ধ পাঠ,—শ্রীযুক্ত নগেন্দ্রনাথ গুপ্ত মহাশয় "বৈষ্ণব কাব্যে মিথিলার অংশ" প্রবন্ধ পাঠ করিলেন।*

উক্ত প্রবন্ধের সারাংশ এই:—ত্রিশবৎসর পূর্ব্বে বিদ্যাপতি বাঙ্গালী বলিয়াই পরিচিত ছিলেন। ৺রাজকৃষ্ণ মুখোপাধ্যায় প্রথমে তাঁহাকে মিথিলাবাসী বলিয়া প্রচার করেন। এদেশে প্রচলিত বিদ্যাপতির পদে অনেক অশুদ্ধ পাঠ রহিয়াছে; মিথিলায় প্রচলিত পাঠ শুদ্ধ। উদাহরণ "রস নাহি হোয়ল, করল যে শাতি। মদন লতা জনু দংশল হাতি॥" এই বঙ্গদেশপ্রচলিত পাঠের কোন সদর্থ হয় না। দ্বিতীয়চরণে মিথিলার পাঠ—"দমন লতা জনু দমসল হাত্তি" স্বীকার করিলে অর্থ হয়, কেন না "দমনলতা" অর্থে "দ্রোণলতা"; "দমসল" অর্থে "দলিত করিল"। এইরূপ আরও উদাহরণ আছে। প্রসিদ্ধ কবীশ্বর চণ্ডা ঝা (চন্দ্রকবি) কর্ত্তৃক

* ঐ প্রবন্ধ বঙ্গভাষা পত্রিকার গত আশ্বিন সংখ্যায় প্রকাশিত হয়।

সংগৃহীত ও তাঁহার স্বহস্তলিখিত বিদ্যাপতির অনেক পদ লেখক সংগ্রহ করিয়াছেন। উক্ত পণ্ডিত প্রাচীন পুঁথি দেখিয়া লিখিয়াছেন। এ দেশের সঙ্কলনকর্ত্তারা সেই পাঠ সংশোধন করিতে গিয়া ছন্দ পর্য্যন্ত নষ্ট করিয়াছেন। চন্দ্রকবির সাহায্যে লেখক বিদ্যাপতির অনেক ভণিতাশূন্য পদ পদকল্পতরু মধ্যে আবিষ্কার করিয়াছেন। ভূপতিসিংহ ভণিতার পদগুলিও বিদ্যাপতির। ভূপতি সিংহ, ও হরি সিংহ শিবসিংহের পিতৃব্য। কবিশেখর উপাধি অন্যের থাকিলেও বিদ্যাপতিরও ঐ উপাধি ছিল। পদকল্পতরুর কবিশেখর ভণিতাযুক্ত পদের মধ্যে শতাবধি পদ বিদ্যাপতির। মিথিলায় ঐ সকল পদ বর্ত্তমান।

এদেশে পরিচিত গোবিন্দদাসগণের মধ্যে যিনি সর্ব্বশ্রেষ্ঠ গোবিন্দ দাস, তিনিও মিথিলাবাসী। চন্দ্রকবির সাহায্যে এই তথ্যও আবিষ্কৃত হইয়াছে। তাঁহার পদাবলীও এদেশে বিকৃত হইয়াছে ও তিনিও গোবিন্দ দাস কবিরাজ বলিয়া পরিচিত হইয়াছেন। প্রকৃতপক্ষে ইনি মিথিলাবাসী শ্রোত্রিয় ব্রাহ্মণ, নাম গোবিন্দদাস ঝা। দ্বারবঙ্গের বর্ত্তমান মহারাজ তাঁহার বংশে উৎপন্ন যথা—

কুঞ্জপল্লী নিবাসী কাত্যায়ন গোত্র

শুচিকর ঝা
|
শিবদাস
|
কৃষ্ণদাস
|
গঙ্গাদাস (কবি) — গোবিন্দদাস (কবি) — হরিদাস (কবি) — রামদাস (কবি)

গঙ্গাদাস (কবি)
|
চন্দ্রশেখর
|
মেধাকর
|
শোভনাথ
|
টেকনাথ

টেকনাথের কন্যা মহারাজ লক্ষ্মীশ্বর সিংহ ও মহারাজ রামেশ্বর সিংহের জননী। কবি চণ্ডা ঝা গোবিন্দদাসের পদাবলী সম্পাদন করিতে স্বীকৃত আছেন। গোবিন্দদাসের আনুমানিক কাল ১৫৪৮ শকাব্দ।

প্রবন্ধপাঠের পর শ্রীযুক্ত দীনেশচন্দ্র সেন মহাশয় প্রবন্ধকারের নবাবিষ্কার ও মৈথিল কবি গোবিন্দদাসের কবিত্ব-গৌরব স্বীকার করিয়া লইয়া বলিলেন, বাঙ্গালী কবি গোবিন্দদাস কবিরাজ ও ঐতিহাসিক ব্যক্তি এবং তিনি বৈদ্যবংশে উৎপন্ন হইয়াছিলেন। মৈথিল কবির অনেক পদ এই কবিরাজের নামে চলিয়া থাকিলেও তাঁহার কৃতিত্ব অস্বীকার করা যায় না।

শ্রীযুক্ত রায় যতীন্দ্রনাথ চৌধুরী মহাশয় গোবিন্দদাসের নামে প্রচলিত পদাবলীর তুলনায় সমালোচনা দ্বারা মৈথিলী ও বাঙ্গালী উভয় কবির কৃতিত্ব নির্ব্বাচনার্থ অনুরোধ করিলেন।

সভাপতি মহাশয় নগেন্দ্রবাবুকে প্রবন্ধটি পরিষৎ পত্রিকায় প্রকাশে অনুরোধ করিলে জানা গেল, উহা অন্যত্র প্রকাশের বন্দোবস্ত হইয়া গিয়াছে।

৫। বিবিধ।—সম্পাদক অন্যান্য পত্রের মধ্যে হায় দরাবাদনিবাসী শ্রীযুক্ত সিদ্ধমোহন মিত্র মহাশয়ের পত্র পাঠ করিয়া বলিলেন উক্ত মহোদয় আরবী, পারসী প্রভৃতি হইতে গৃহীত বাঙ্গালা শব্দের অক্ষরান্তরিত করিবার ভার গ্রহণ করিয়া পরিষৎকে অনুগৃহীত করিয়াছেন ও এতদুপলক্ষে পায়োনিয়র প্রভৃতি বহু পত্রিকা সন্তোষ প্রকাশ করিয়াছেন। পরিষৎও সিদ্ধমোহন বাবুর প্রতি কৃতজ্ঞতা জ্ঞাপন করিলেন। তৎপরে শ্রীযুক্ত ললিতকুমার বন্দোপাধ্যায় মহাশয় প্রদত্ত Indian Nation চারিখণ্ড ও অন্য উপহারদাতাদের প্রদত্ত গ্রন্থ প্রদর্শন ও তাঁহাদিগকে কৃতজ্ঞতা-জ্ঞাপনের পর সভাভঙ্গ হইল।

শ্রীরামেন্দ্রসুন্দর ত্রিবেদী,	শ্রীকালীবর বেদান্তবাগীশ,
সম্পাদক।	সভাপতি।

পঞ্চম মাসিক অধিবেশন!

১৫ই আশ্বিন, ১লা অক্টোবর, শনিবার, অপরাহ্ন ৬টা।

উপস্থিত ব্যক্তিগণ।

শ্রীযুক্ত কালীবর বেদান্তবাগীশ (সভাপতি)	শ্রীযুক্ত নীলমণি মুখোপাধ্যায়
„ রায় যতীন্দ্রনাথ চৌধুরী এম্, এ; বি, এল্	„ হরিনারায়ণ বন্দ্যোপাধ্যায়
„ সুরেশচন্দ্র সমাজপতি	„ যাদবচন্দ্র মিত্র
„ হীরেন্দ্রনাথ দত্ত এম্ এ; বি, এল্	„ কিরণচন্দ্র দত্ত
„ ধীরেন্দ্রনাথ দত্ত	„ অন্নদাপ্রসাদ নন্দী
„ নগেন্দ্রনাথ গুপ্ত	„ অমৃতলাল বসু
„ নগেন্দ্রনাথ বসু	„ বঙ্কবিহারী রায় কবিরাজ
„ রমেশচন্দ্র বসু	„ তারানাথ সেন গুপ্ত
„ মুনীন্দ্রনাথ সাংখ্যরত্ন	„ ভূপেন্দ্রনাথ সেন গুপ্ত
„ গঙ্গাচরণ বেদান্তবিদ্যাসাগর	„ অমূল্যচরণ বন্দ্যোপাধ্যায়
„ নিখিলনাথ রায় বি, এল্	„ সিদ্ধেশ্বর দত্ত
„ রাজকৃষ্ণ দত্ত	„ শশিভূষণ সিংহ
„ সতীশচন্দ্র বিদ্যাভূষণ এম্, এ	„ পঞ্চানন বন্দ্যোপাধ্যায় বি, এ
„ রাখালদাস বন্দ্যোপাধ্যায় এম্, এ	„ রামেন্দ্রসুন্দর ত্রিবেদী M.A. (সম্পাদক)

শ্রীযুক্ত নিখিলনাথ রায়ের প্রস্তাবে শ্রীযুক্ত পণ্ডিত কালীবর বেদান্তবাগীশ মহাশয় সভাপতির আসন গ্রহণ করিলেন।

১। সম্পাদক কর্ত্তৃক গত অধিবেশনের কার্য্য-বিবরণ পঠিত হইলে পর নিম্নোক্ত ব্যক্তিগণ সভ্য নির্ব্বাচিত হইলেন,—

প্রস্তাবক	সমর্থক	সভ্য
শ্রীরামেন্দ্রসুন্দর ত্রিবেদী	শ্রীরায় যতীন্দ্রনাথ চৌধুরী	শ্রীআশুতোষ ব্রহ্ম, ৫ অক্রূর দত্তের লেন
শ্রীনিখিলনাথ রায়	শ্রীসুরেশচন্দ্র সমাজপতি	শ্রীগোবিন্দ সেন, এম্, এ ৯১ দুর্গাচরণ মিত্রের ষ্ট্রীট
শ্রীসতীশচন্দ্র বিদ্যাভূষণ	শ্রীরায় যতীন্দ্রনাথ চৌধুরী	শ্রীরাখালদাস বন্দ্যোপাধ্যায় ৭৯ মুক্তারামবাবুর ষ্ট্রীট

২। শোক-প্রকাশ। শ্রীযুক্ত পণ্ডিত সতীশচন্দ্র বিদ্যাভূষণ পরিষদের অন্যতম সভ্য ডাক্তার ৺বিপিনবিহারী মৈত্র এম্, বি মহাশয়ের অকালমৃত্যুর জন্য শোক-প্রকাশ প্রস্তাব করিলে, উহা গৃহীত হইল।

৩। কৃতজ্ঞতাপ্রকাশ। সম্পাদক শ্রীযুক্ত রামেন্দ্রসুন্দর ত্রিবেদী লালগোলার শ্রীযুক্ত রাজা যোগেন্দ্রনারায়ণ রায় বাহাদুরের প্রদত্ত সাহায্যে মুদ্রিত ও শ্রীযুক্ত নগেন্দ্রনাথ বসু কর্ত্তৃক সম্পাদিত "কাশীপরিক্রমা" পুস্তকের একখণ্ড প্রদর্শন করিয়া রাজাবাহাদুরকে ও নগেন্দ্রবাবুকে কৃতজ্ঞতা-জ্ঞাপনের প্রস্তাব করিলেন। রাজাবাহাদুর বর্ত্তমানবর্ষেও ৩০০৲ টাকা পরিষৎকে প্রাচীন গ্রন্থপ্রকাশার্থ প্রদান করিতে ইচ্ছুক আছেন, সম্পাদক এই সংবাদ প্রদান করায় পরিষৎ পরম আহ্লাদ প্রকাশ করিলেন ও রাজাবাহাদুরকে তজ্জন্য পত্রদ্বারা আন্তরিক কৃতজ্ঞতা-জ্ঞাপনে আদেশ করিলেন।

৪। প্রবন্ধপাঠ। শ্রীযুক্ত রাখালদাস বন্দ্যোপাধ্যায় Archæologist মহাশয় "বৈশালী" প্রবন্ধ পাঠ করিলেন।*

উক্ত প্রবন্ধে লেখক মহাশয় বৈশালীনগরে বুদ্ধদেবের জীবনের ও বৌদ্ধ ইতিহাসের ঘটনাগুলি বর্ণনা করিয়া উহার প্রসিদ্ধির কারণ নির্দ্দেশ করিলেন। তৎপরে চীনবাসী বৌদ্ধ-পরিব্রাজকেরা বৈশালীর যেরূপ বর্ণনা দিয়াছেন, তাহার বিবরণ দিয়া বলিলেন, হিউয়েংচাং-এর সময় বৈশালীর অবস্থা অবনত হইয়াছিল ও বৌদ্ধপ্রভাব সংকীর্ণ হইয়াছিল। মুসলমান অধিকারে বৈশালী ধ্বংসপ্রাপ্ত হয়। মজঃফরপুর জেলার বসাড়গ্রামই প্রাচীন বৈশালী, ইহা কনিংহাম সাহেব বৌদ্ধ-পরিব্রাজকদের বিবরণ হইতে সিদ্ধান্ত করেন। কেহ কেহ এ বিষয়ে সন্দেহ করিলেও ভি, এ, স্মিথসাহেব ১৯০২ সালের রয়াল এশিয়াটিক সোসাইটির জর্নালে সমুদয় প্রমাণ সংগ্রহ করিয়া ও মানচিত্র দ্বারা বসাড়ের প্রাচীন স্থান সকলের নির্দ্দেশদ্বারা বসাড় ও বৈশালীর অভিন্নতা প্রায় প্রতিপন্ন করিয়াছেন। বুদ্ধদেব যে পথ ধরিয়া পাটলিপুত্র হইতে বৈশালী হইয়া কুশীনগর গিয়াছিলেন, সেই পথ এখনও বর্ত্তমান। সেই পথে বসাড় গ্রাম অবস্থিত। বসাড়ের সিংহস্তম্ভ, তাহার দক্ষিণের পুষ্করিণী ও উত্তরস্থ ইষ্টকস্তূপ চীন-পরিব্রাজক-বর্ণিত স্তম্ভ নিদর্শনের সহিত মিলে। আর কোথায়ও সেইরূপ মিল হয় না।

* উক্ত প্রবন্ধ ১৩১১ সালের মাঘ ও ফাল্গুন মাসের ভারতীতে প্রকাশিত হইয়াছে।

প্রবন্ধপাঠের পর প্রবন্ধলেখক বসাঢ় গ্রামের নিকটে প্রাপ্ত বিবিধ বৌদ্ধনিদর্শনের অনেকগুলি প্রদর্শন করিলেন। ভূগর্ভে আবিষ্কৃত পোড়ামাটীতে অঙ্কিত অনেকগুলি লিপিসম্বলিত মোহরের ফটোগ্রাফ দেখান হইল।

শ্রীযুক্ত পণ্ডিত সতীশচন্দ্র বিদ্যাভূষণ প্রবন্ধপাঠককে ধন্যবাদ দিয়া বৌদ্ধ-ইতিবৃত্ত সংক্ষেপে বর্ণনা করিলেন। বৈশালীতে দ্বিতীয় মহাসঙ্ঘের অধিবেশনে বৌদ্ধগণের মতভেদ ঘটে ও সম্প্রদায়সৃষ্টির সূচনা হয়। মাটীর মোহরগুলির কতক কৃত্রিম হওয়া সম্ভব, এইরূপ সন্দেহ প্রকাশ করিলেন।

শ্রীযুক্ত পঞ্চানন বন্দ্যোপাধ্যায় বলিলেন, বৈশালী বৌদ্ধমতের আবির্ভাবের পূর্ব্ব হইতে প্রসিদ্ধ স্থান। পৌরাণিক বর্ণনা ও হিউয়েংচাংএর বর্ণনা হইতে বৈশালী হরিদ্বারের নিকট বলিয়া অনুমিত হয়। বেণ ও পৃথুরাজার ইতিহাসের সহিত বৈশালী জড়িত আছে। বসাঢ়কে বৈশালী মনে করা সঙ্গত নহে।

শ্রীযুক্ত নগেন্দ্রনাথ বসু বলিলেন, বৈশালীতে হিন্দুর ও জৈনদের প্রচুর প্রতিপত্তি ছিল। বসাঢ়ে আবিষ্কৃত নিদর্শনে হিন্দু ও জৈনপ্রভাবের অভাব দেখিয়া উহা বৈশালী কি না সন্দেহ হইতে পারে।

রাখালবাবু প্রত্যুত্তরে বলিলেন, মোহরগুলির কৃত্রিমতায় সন্দেহের হেতু নাই, উহা ভূপৃষ্ঠের বহু নিম্নে প্রস্তর-নির্ম্মিত অট্টালিকার ভিতরে পাওয়া গিয়াছে। মোহরে অঙ্কিত "বিষ্ণুপদস্বামিনারায়ণঃ" ও "অম্রাতকেশ্বর" এই লিপি হইতে বিষ্ণু ও শিবের উপাসনার চিহ্ন দেখা যাইতেছে। অতএব উহাতে হিন্দুপ্রভাবের অভাব নাই। আর হিউয়েংচাংএর বর্ণনার সহিত বসাঢ়ের অবস্থিতির এত মিল যে সন্দেহের কোন কারণ নাই। কনিংহাম মানচিত্র দেন নাই, কিন্তু সম্প্রতি যে মানচিত্র প্রস্তুত হইয়াছে, তাহাতে আর সন্দেহের কারণ থাকে না। অশোকস্তূপ, অশোকস্তম্ভ, প্রাচীন মর্কট পুষ্করিণী, কুটাগার শালা প্রভৃতির হিউয়েংচাং বর্ণিত বিবরণের সহিত বসাঢ়ের ধ্বংসাবশেষ যেমন মিলে, এরূপ আর কোথায়ও মিলে না। তীরভুক্তি নাম মোহরে দেখা যায়।

সভাপতি মহাশয় বলিলেন, "মহাবস্তু অবদানে" বৈশালীর যে বর্ণনা আছে, তাহা বিশালা বদরীর সহিত মিলে। তীরভুক্তি এই নাম সংস্কৃত সাহিত্যে পাওয়া যায় না।

৫। প্রবন্ধপাঠ। শ্রীযুক্ত গঙ্গাচরণ বেদান্তবিদ্যাসাগর "গৌতমের প্রতিভা" প্রবন্ধ পাঠ করিলেন। এই সুদীর্ঘ প্রবন্ধে লেখক ত্রেতাযুগের শ্রীরামচন্দ্রের সমকালীন গৌতমমুনিকে সংহিতাকর্ত্তা ও ন্যায়দর্শনকর্ত্তা ঋষির সহিত অভিন্ন অনুমান করিলেন। তৎপরে ন্যায়দর্শনের দীর্ঘ ইতিবৃত্ত দিয়া নবদ্বীপে ন্যায়শাস্ত্রচর্চ্চার বিবরণ দিলেন। পরে ন্যায়দর্শনের আলোচ্য বিষয়ের বিবরণ দিয়া দীর্ঘপ্রবন্ধ শেষ করিলেন।*

---

* এই প্রবন্ধ একাদশবর্ষের ৩য় ও ৪র্থ সংখ্যা সাহিত্য-পরিষৎ-পত্রিকায় প্রকাশিত হইয়াছে।

সভাপতি বেদান্তবাগীশ মহাশয় ইতঃপূর্ব্বে সাহিত্য-পরিষদে ন্যায়দর্শন সম্বন্ধে যে প্রবন্ধ পাঠ করিয়াছিলেন, তাহাতে ন্যায়শাস্ত্রের ভাষায় অনাবশ্যক জটিলতার ও দুরূহতার প্রতি কটাক্ষ করিয়াছিলেন। প্রবন্ধপাঠক প্রবন্ধ মধ্যে বেদান্তবাগীশ মহাশয়ের সেই কটাক্ষের উত্তর দিবার চেষ্টা করিয়াছেন।

সভাপতি বেদান্তবাগীশ মহাশয় বলিলেন, অস্মৎকার প্রবন্ধেই প্রতিপন্ন হইল, তাঁহার সেই কটাক্ষপাত সার্থক হইয়াছে। ন্যায়শাস্ত্রের জটিল ভাষা সাধারণকে বুঝাইতে গিয়া প্রবন্ধ-লেখককে সরস ও সরল ভাষার ব্যবহার করিতে হইয়াছে ও তবেই তিনি সফল হইয়াছেন। এক্ষণে নৈয়ায়িকগণ যদি অভিধানাদি প্রণয়ন করিয়া ন্যায়শাস্ত্রের পারিভাষিক শব্দগুলিকে সাধারণের বোধগম্য করিয়া দেন, তাহা হইলে তাঁহার পূর্ব্বপ্রবন্ধপাঠের শ্রম সম্পূর্ণ সফল হইবে। প্রবন্ধলেখকের বর্ণিত ন্যায়শাস্ত্রের ঐতিহাসিক ও ন্যায়শাস্ত্রের প্রতিপাদ্য বিষয়ের আলোচনা সুন্দর হইয়াছে।

৬। পরে সম্পাদককর্ত্তৃক গ্রন্থোপহারকর্ত্তাদিগের ধন্যবাদের প্রস্তাবান্তে সভাভঙ্গ হইল।

শ্রীরামেন্দ্রসুন্দর ত্রিবেদী
সম্পাদক

শ্রীসত্যেন্দ্রনাথ ঠাকুর
সভাপতি

ষষ্ঠ মাসিক অধিবেশন।

২৫শে অগ্রহায়ণ, ১০ই ডিসেম্বর, শনিবার, অপরাহ্ণ ৫৷০ টা

উপস্থিত ব্যক্তিগণ।

শ্রীযুক্ত সত্যেন্দ্রনাথ ঠাকুর (সভাপতি)
মাননীয় বিচারপতি শ্রীযুক্ত সারদাচরণ মিত্র এম্, এ; বি, এল (সহকারী সভাপতি)
পণ্ডিত শ্রীযুক্ত শিবনাথ শাস্ত্রী এম্, এ (সহকারী সভাপতি)

শ্রীযুক্ত শিবাপ্রসন্ন ভট্টাচার্য্য বি, এল্
" নরেন্দ্রনাথ দত্ত
" সতীশচন্দ্র বিদ্যাভূষণ এম, এ
" নিখিলনাথ রায় বি, এল্
" সত্যভূষণ বন্দ্যোপাধ্যায়
" অমৃতকৃষ্ণ মল্লিক বি, এল্
" নগেন্দ্রনাথ বসু
" রমেশচন্দ্র বসু
" শরচ্চন্দ্র শাস্ত্রী

শ্রীযুক্ত যাদবচন্দ্র মিত্র
" নগেন্দ্রনাথ গুপ্ত
" মুনীন্দ্রনাথ সাংখ্যরত্ন
" কালিরঞ্জন লাহিড়ী
" অমূল্যচরণ ভট্টাচার্য্য
" তারকনাথ বিশ্বাস
" যোগেন্দ্রচন্দ্র বসু বি,এ
" যোগেশচন্দ্র ঘোষ
" হেমেন্দ্রপ্রসাদ ঘোষ বি,এ

শ্রীযুক্ত রায় যতীন্দ্রনাথ চৌধুরী এম, এ; বি, এল	শ্রীযুক্ত আনন্দনাথ রায়
" হীরেন্দ্রনাথ দত্ত এম, এ; বি, এল	" তারাপদ চট্টোপাধ্যায়
" ললিতকুমার বন্দ্যোপাধ্যায় এম, এ	" যোগীন্দ্রনাথ চট্টোপাধ্যায়
" দীনেশচন্দ্র সেন বি, এ	" মনোমোহন চক্রবর্ত্তী
" অমূল্যচরণ বিদ্যাভূষণ	" দুর্গানারায়ণ সেন শাস্ত্রী
" বাণীনাথ নন্দী	" হরিপদ চট্টোপাধ্যায়
" সুরেশচন্দ্র সমাজপতি	" ক্ষিতীশচন্দ্র চক্রবর্ত্তী
" বিপিনবিহারী নিয়োগী এম, এ	" চারুচন্দ্র বসু
" সিদ্ধেশ্বর দাস	" নগেন্দ্রনাথ ঘোষ
" নগেন্দ্রকৃষ্ণ মল্লিক	" রাজকৃষ্ণ দত্ত
" শচীন্দ্রনাথ মুখোপাধ্যায় বি, এ	" ফণীন্দ্রনাথ রায়
" জ্ঞানেন্দ্রনাথ ঘোষ	" যতীন্দ্রনাথ বাগচী বি, এ
" দ্বিজেন্দ্রনাথ বাগচী এম, এ	" নগেন্দ্রনাথ বন্দ্যোপাধ্যায়
	" রামেন্দ্রসুন্দর ত্রিবেদী এম, এ সম্পাদক।

শ্রীযুক্ত মন্মথমোহন বসু বি এ }
" ব্যোমকেশ মুস্তফী } (সহকারী সম্পাদকদ্বয়)

১। গত অধিবেশনের কার্য্যবিবরণ পঠিত ও অনুমোদিত হইল।

২। নিম্নলিখিত সভ্যগণ নির্ব্বাচিত হইলেন,—

প্রস্তাবক	সমর্থক	সভ্য
শ্রীসুরেশচন্দ্র সমাজপতি	শ্রীরামেন্দ্রসুন্দর ত্রিবেদী	১ কবিরাজ শ্রীঅপূর্ব্বকৃষ্ণ গুপ্ত, শান্তিরাম ঘোষের লেন
শ্রীমধুসূদন সরকার	শ্রীব্যোমকেশ মুস্তফী	২ শ্রীহরিদাস দাস, এফ্, আর্, জি, এস্ রঘুনাথগঞ্জ
শ্রীক্ষীরোদপ্রসাদ বিদ্যাবিনোদ	শ্রীমন্মথমোহন বসু	৩ শ্রীক্ষিতীশচন্দ্র চক্রবর্ত্তী, ৮ বালাখানা ষ্ট্রীট্
শ্রীঅমূল্যচরণ ঘোষ বিদ্যাভূষণ	শ্রীব্যোমকেশ মুস্তফী	৪ শ্রীঅতুলচন্দ্র মিত্র, ৫২।২ বিডন্ ষ্ট্রীট্
		৫ শ্রীতারাপদ চট্টোপাধ্যায় ৩ সিমলা ষ্ট্রীট্
শ্রীসত্যভূষণ বন্দ্যোপাধ্যায়		৬ শ্রীচারুচন্দ্র দে, এম্, এ, বি, এল্, উকীল, হাইকোর্ট

৩। শ্রীযুক্ত নগেন্দ্রনাথ গুপ্ত মহাশয় গত পূজার সময় মিথিলা ভ্রমণকালে একখানি পুরাতন পুঁথি দেখিয়া আসিয়াছেন তাহার উল্লেখ করিলেন। ঐ পুঁথিখানি ভাগবতগ্রন্থ ও [illegible] বিদ্যাপতির স্বহস্ত লিখিত। "শ্রীবিদ্যাপতের্লিপিরিয়"মিতি উহার শেষপত্রে লিখিত আছে। ৩০৯ ল সং স্পষ্ট লেখা আছে। ৺রাজকৃষ্ণ মুখোপাধ্যায় ৩৪৯ ল সং লিখিয়াছিলেন তাহা ভ্রম। ঐ লিপির ও পুঁথির অন্যান্য কয়েক স্থানের যে সকল প্রতিলিপি তিনি পাতলা কাগজের [illegible] তুলিয়া আনিয়াছেন তাহা সভাস্থলে দেখান হইল। ঐ পুঁথি হইতে বিদ্যাপতির কাল-নির্ণয় সম্বন্ধে কিরূপ সাহায্য হইতে পারে তাহাও নগেন্দ্রবাবু বলিলেন।

মৈথিল অক্ষরের কতকগুলি আদর্শও নগেন্দ্রবাবুকর্ত্তৃক সভাস্থলে প্রদর্শিত হইল।

তৎপরে শ্রীযুক্ত মনোমোহন চক্রবর্ত্তী বিদ্যাপতির সময় সম্বন্ধে কিছু আলোচনা করিলেন। Indian Antiquary XIX, January সংখ্যায় খৃষ্টীয় ১১১৯-২০ অব্দকে ল সং ১ ধরিয়া প্রমাণের চেষ্টা হইয়াছে। সেই হিসাবে নগেন্দ্রবাবুর অনুমিত কালের সহিত বিদ্যাপতির কালের কয়েক বৎসরের তফাৎ হয়। গ্রীয়ার্সন সাহেব বিদ্যাপতির হস্তলিখিত গ্রন্থে ৩৪৯ ল সং লেখা আছে এইরূপ বলিয়াছেন। বিদ্যাপতির সময় নিঃসংশয়ে এখনও নিরূপিত হয় নাই।

মাননীয় বিচারপতি সারদাচরণ মিত্র মহাশয় সংবাদ দিলেন, দ্বারবঙ্গের মহারাজের নিকট হইতে আরও অনেকগুলি বিদ্যাপতির নূতন পদ তিনি শীঘ্র পাইবার আশা করেন।

তৎপরে শ্রীযুক্ত হীরেন্দ্রনাথ দত্ত মহাশয় "বেদান্তদর্শন" সম্বন্ধে প্রবন্ধ পাঠ করিলেন। এই সুদীর্ঘ প্রবন্ধ ধারাবাহিকরূপে সাহিত্য-পত্রিকায় প্রকাশিত হইবে। সমস্ত প্রবন্ধ পাঠের সম্ভাবনা না থাকায় প্রবন্ধের প্রথমাংশ হইতে কিছু কিছু পাঠ করা হইল। প্রবন্ধের উপক্রমণিকায় বেদান্তদর্শন সম্বন্ধে যে সকল ভাষ্য, টীকা, প্রকরণাদি পাওয়া যায়, তাহার যথাসম্ভব সম্পূর্ণ তালিকা দেওয়া হইয়াছে। প্রবন্ধের প্রথমাংশে অদ্বৈতবাদের তাৎপর্য্য সবিস্তারে দেওয়া হইয়াছে। প্রবন্ধের দ্বিতীয়াংশে রামানুজপ্রবর্ত্তিত বিশিষ্টাদ্বৈতবাদের তাৎপর্য্য বিবৃত হইয়াছিল। ঐ অংশ পরবর্ত্তী অধিবেশনে পঠিত হইবে স্থির হইল।

প্রবন্ধ পাঠের পর শ্রীযুক্ত শিবনাথ শাস্ত্রী মহাশয় অদ্বৈতবাদের এই সুন্দর ও প্রাঞ্জল বিবরণের জন্য প্রবন্ধপাঠককে ধন্যবাদ দিলেন।

তৎপরে শ্রীযুক্ত সতীশচন্দ্র বিদ্যাভূষণ মহাশয় হীরেন্দ্রবাবুর প্রবন্ধে প্রসঙ্গক্রমে উত্থাপিত কয়েকটী বিষয়ের আলোচনা করিলেন। হীরেন্দ্রবাবু বাচস্পতি মিশ্রের মত অবলম্বন করিয়া পাণিনির উল্লিখিত "পারাশর্য্যভিক্ষুসূত্র" ব্যাসপ্রণীত "ব্রহ্মসূত্র" হইতে অভিন্ন এইরূপ অনুমান করিয়াছিলেন। সতীশবাবুর মতে উহা বৌদ্ধভিক্ষুগণের উদ্দেশে রচিত কোন সূত্র হইতেও পারে। "পারাশর্য্য" শব্দে পরাশরসূত্র না হইতেও পারে। ভিক্ষুসূত্রের প্রতিপাদ্য বিষয় কি ছিল না জানিলে উহার মীমাংসা অসম্ভব।

অদ্বৈতবাদ শঙ্করাচার্য্যের পূর্ব্বে কি আকারে ছিল, তাহাও বিচার্য্য। নিঃসংশয়ে কোন কথা বলা যায় না।

বেদের সংহিতা ও ব্রাহ্মণে দুঃখবাদ নাই। ঐ সময়ে মনুষ্য ইহকালে ও পরকালে সুখের অন্বেষণেই ব্যস্ত। আরণ্যকে ও উপনিষদে অকস্মাৎ দুঃখবাদ দেখা দেয়। এইরূপ আকস্মিক পরিবর্ত্তনের কারণ অনুসন্ধেয়। সতীশবাবুর অনুমানে বুদ্ধদেবই এই দুঃখবাদের প্রবর্ত্তক হইতে পারেন। যে সকল উপনিষদে দুঃখবাদ ও দুঃখ হইতে মুক্তির উপায় অন্বেষণ আছে, তাহা বুদ্ধের পরবর্ত্তী কি না বিচার্য্য।

শ্রীযুক্ত নিখিলনাথ রায় শঙ্করাচার্য্যের আবির্ভাব কালসম্বন্ধে আলোচনা করিলেন। দ্বারকামঠে ও অন্যত্র শঙ্করাচার্য্যগণের মধ্যে যত্নরক্ষিত যে গুরুপরম্পরা আছে, তাহাতে

ভাষ্যকার শঙ্করকে খৃষ্টের পাঁচশত বৎসর পূর্ব্বের লোক বলিয়াই সপ্রমাণ করা যাইতে পারে। ঐ সকল তালিকায় সন্দেহ করিবার সম্যক্ কারণ নাই। ইউরোপীয় মতে ভাষ্যকার খৃষ্টের পরে অষ্টম শতাব্দীর, তেলাঙের মতে ষষ্ঠ শতাব্দীর। ঐ সকল মত অমূলক।

পণ্ডিত সতীশচন্দ্র তদুত্তরে বলিলেন, সুরেশ্বর ভাষ্যকারের সমসাময়িক; সুরেশ্বর ধর্ম্মকীর্ত্তির উল্লেখ করিয়াছেন। ধর্ম্মকীর্ত্তি খৃষ্টীয় ৬২০ অব্দে বর্ত্তমান ছিলেন। অতএব ভাষ্যকার শঙ্কর ৭৮৮-৮১৫ খৃঃ অব্দে বর্ত্তমান ছিলেন, উহা অমূলক নহে।

হীরেন্দ্রবাবু বলিলেন, শৃঙ্গেরীমঠের শঙ্করাচার্য্যের সহিত তাঁহার সাক্ষাৎ হইয়াছিল। তাঁহার মতে ভাষ্যকার ২০০০ বৎসর পূর্ব্বে বর্ত্তমান ছিলেন, এইরূপ গুরুপরম্পরা তাঁহার মঠে বর্ত্তমান। কিন্তু সেই পরম্পরায় একা সুরেশ্বর আচার্য্যকে ১০০০ বৎসর মঠের অধিকারী বলা হইয়াছে। এই অত্যুক্তিটুকু বাদ দিলে ভাষ্যকার সহস্রবৎসর পূর্ব্বের লোক ছিলেন, অর্থাৎ খৃষ্টীয় অষ্টম শতাব্দীর লোকই ঠিক হইল।

ভিক্ষুসূত্র ও ব্রহ্মসূত্রের অভিন্নতা তিনি বাচস্পতি মিশ্রের মতানুযায়ী বলিয়াই উল্লেখ করিয়াছেন। ঐ মত অগ্রাহ্য নহে। সূত্রসাহিত্য বুদ্ধের পূর্ব্বেও ছিল, কেন না বৃহদারণ্যকে সূত্রের উল্লেখ আছে। সাহেবেরা যেরূপ প্রাচীন বৈদিক সাহিত্যের ইতিহাস Water tight Compartment এ ভাগ করেন তাহা সমীচীন নহে।

সভাপতি মহাশয় শঙ্করাচার্য্যকে অষ্টম শতাব্দীর অনুমানই সঙ্গত বোধ করিলেন। অদ্বৈতবাদ মতটা সমীচীন নহে। বিষয়স্বরূপ জগতের অস্তিত্ব অস্বীকার করিলে মনুষ্যের কর্ত্তব্য কিছুই থাকে না। আত্মাকে ঈশ্বর মনে করিলে ভক্তির আস্পদ কিছুই থাকে না। ধর্ম্মের ভিত্তি উৎপাটিত হয়। শঙ্কর কিরূপে অদ্বয়বাদের সহিত কর্ম্মকাণ্ডের সমন্বয় করিয়াছিলেন, হীরেন্দ্রবাবু প্রবন্ধান্তরে তাহা দেখাইলে ভাল হয়।

৫। সময়াভাবে শ্রীযুক্ত নগেন্দ্রনাথ গুপ্তের "বিদ্যাপতি প্রসঙ্গ" ও শ্রীযুক্ত নগেন্দ্রনাথ বসুর "কনৌজের আয়ুধ রাজবংশ" এই দুই প্রবন্ধের পাঠ স্থগিত থাকিল।

৬। গ্রন্থোপহারকর্ত্তাদিগকে ও রবীন্দ্রবাবুর মৃন্ময় প্রতিমূর্ত্তির প্রদাতাকে ধন্যবাদ দেওয়া হইল।

পরে সভাপতিকে ধন্যবাদান্তে সভাভঙ্গ হইল।

শ্রীরামেন্দ্রসুন্দর ত্রিবেদী
সম্পাদক

শ্রীচন্দ্রকান্ত শর্ম্মা
সভাপতি

সপ্তম মাসিক অধিবেশন।

৩ রা পৌষ, ১৮ ই ডিসেম্বর, শনিবার, অপরাহ্ণ ৫ টা।

উপস্থিত ব্যক্তিগণ

শ্রীযুক্ত সত্যেন্দ্রনাথ ঠাকুর (সভাপতি)

মহামহোপাধ্যায় শ্রীযুক্ত চন্দ্রকান্ত তর্কালঙ্কার (সহকারী সভাপতি)

শ্রীযুক্ত নগেন্দ্রনাথ গুপ্ত
" রায় যতীন্দ্রনাথ চৌধুরী, এম্, এ ; বি, এল্
" হীরেন্দ্রনাথ দত্ত, এম্, এ ; বি, এল
" দীনেশচন্দ্র সেন, বি, এ
" ক্ষীরোদপ্রসাদ বিদ্যাবিনোদ, এম্, এ
" হেমেন্দ্রপ্রসাদ ঘোষ, বি, এ
" অমূল্যচরণ ঘোষ বিদ্যাভূষণ
" দুর্গানারায়ণ সেন শাস্ত্রী
" মুনীন্দ্রনাথ সাংখ্যরত্ন
" কিরণচন্দ্র দত্ত
" মন্মথনাথ মিত্র
" খগেন্দ্রভূষণ সেন গুপ্ত
" ক্ষিতীশচন্দ্র চক্রবর্ত্তী
" নগেন্দ্রকৃষ্ণ মল্লিক
" যোগীন্দ্রচন্দ্র বসু, বি, এ
" পূর্ণচন্দ্র গুপ্ত

শ্রীযুক্ত যোগীন্দ্রনাথ ঘটক
" নগেন্দ্রনাথ গঙ্গোপাধ্যায়
" গিরীশচন্দ্র দাস
" নগেন্দ্রনাথ বিশ্বাস
" সিদ্ধেশ্বর দাস
" বিপিনবিহারী নিয়োগী, এম্, এ
" নিখিলনাথ রায়, বি, এল্
" অমৃতকৃষ্ণ মল্লিক, বি, এল্
" রমেশচন্দ্র বসু
" বামাচরণ চট্টোপাধ্যায়
" উপেন্দ্রনাথ বন্দ্যোপাধ্যায়
" প্রমথনাথ বন্দ্যোপাধ্যায়, এম্, এ
" মনোরঞ্জন গুহ
" সুরেশচন্দ্র সমাজপতি
" যোগীন্দ্রনাথ সেন, এম্, এ
" রামেন্দ্রসুন্দর ত্রিবেদী, এম্, এ(সম্পাদক)
" মন্মথমোহন বসু, বি, এ (সহঃ সম্পাদক)
" ব্যোমকেশ মুস্তফী (সহঃ সম্পাদক)

সভাপতি মহাশয়ের উপস্থিতিতে বিলম্ব ঘটায় সহকারী সভাপতি মহামহোপাধ্যায় শ্রীচন্দ্রকান্ত তর্কালঙ্কার মহাশয় সভাপতির আসন গ্রহণ করিলেন।

১। গত অধিবেশনের কার্য্যবিবরণ পঠিত ও অনুমোদিত হইল।

২। নিম্নোক্ত সভ্যগণ যথারীতি নির্ব্বাচিত হইলেন :—

প্রস্তাবক	সমর্থক	সভ্য
শ্রীব্যোমকেশ মুস্তফী	শ্রীরামেন্দ্রসুন্দর ত্রিবেদী	১ শ্রীজয়গোপাল ঘোষ, উকীল, হাইকোর্ট
		২ শ্রীক্ষেত্রমোহন সেন, উকীল, হাইকোর্ট

প্রস্তাবক	সমর্থক	সভ্য
শ্রীব্যোমকেশ মুস্তফী	শ্রীরামেন্দ্রসুন্দর ত্রিবেদী	৩ শ্রীব্রজেন্দ্রলাল মিত্র, ব্যারিষ্টার, বীডন রো
শ্রীতারকেশ্বর ভট্টাচার্য্য	শ্রীব্যোমকেশ মুস্তফী	৪ শ্রীকালীরঞ্জন লাহিড়ী, বৈঠকখানা রোড
শ্রীরামেন্দ্রসুন্দর ত্রিবেদী	"	৫ শ্রীরজনীকান্ত ত্রিবেদী, বহড়া, কান্দী

৩। উপহারস্বরূপে প্রাপ্ত গ্রন্থগুলি প্রদর্শিত ও উপহারকর্ত্তাদিগকে ধন্যবাদ প্রদত্ত হইল।

৪। শ্রীযুক্ত নগেন্দ্রনাথ গুপ্ত "বিদ্যাপতিপ্রসঙ্গ" নামক প্রবন্ধ পাঠ করিলেন। বিদ্যাপতির বংশ-পরিচয় সম্বন্ধে প্রবন্ধপাঠক কহিলেন বিদ্যাপতির বংশাবলী প্রকাশিত হইয়াছে বটে কিন্তু পরিচয় ইতিপূর্ব্বে প্রদত্ত হয় নাই। উক্ত বংশে কয়েকজন প্রধান মন্ত্রী, সান্ধিবিগ্রহিক ও মহামহোপাধ্যায় ছিলেন, এবং কাহারও কাহারও কীর্ত্তিশিলা বিদ্যমান আছে। সপ্তরত্নাকর ও কৃত্যচিন্তামণিকর্ত্তা প্রসিদ্ধ চণ্ডেশ্বর ঠাকুর বিদ্যাপতির পিতামহের ভ্রাতা এবং ঐ বংশে অপর অনেকে নানাগ্রন্থ রচনা করিয়া গিয়াছেন। তাঁহার পিতা রাজসভা-পণ্ডিত ছিলেন। এদেশে বিদ্যাপতি বৈষ্ণবকবি বলিয়া পরিচিত কিন্তু মিথিলায় তাঁহার রচিত শিবগীতই সর্ব্বদা গীত হয়। বিদ্যাপতি শৈব ছিলেন, তাঁহারা পুরুষানুক্রমে শৈব। তাঁহার শ্মশানভূমির উপর প্রতিষ্ঠিত শিবমন্দিরের ও কুলদেবী বিশ্বেশ্বরীর চিহ্ন অদ্যাপি বিদ্যমান আছে। রচনাসমূহের কালনির্ণয় নিঃসন্দেহরূপে করা যায় না। পদাবলীর অধিক সংখ্যক প্রথম অবস্থায় ও তরুণ বয়সে লিখিত। বৃদ্ধ বয়সের গঙ্গাগীতপ্রভৃতি আছে। রাজারাণীদের নাম থাকাতে সংস্কৃত গ্রন্থাবলীর কাল কতক নির্ণয় করিতে পারা যায়। কীর্ত্তিলতা, কীর্ত্তিপতাকা, পুরুষপরীক্ষা, লিখনাবলী, শৈবসর্ব্বস্বসার, দুর্গাভক্তিতরঙ্গিণী ও দানবাক্যাবলী যথাক্রমে লিখিত। ভিন্ন ভিন্ন দেবতার নামে মঙ্গলাচরণ। আদ্যাশক্তি, গণেশ, দুর্গা, বিষ্ণু এবং শিবের নামে নান্দী দেখিতে পাওয়া যায়। মিথিলায় বিদ্যাপতির এই কয়টি উপাধি পাওয়া গিয়াছে :—কবিশেখর, কবি-কণ্ঠহার, অভিনবজয়দেব ও দশাবধান। বঙ্গদেশে কবিরঞ্জন উপাধি আছে, মিথিলায় কোন পদে এ পর্য্যন্ত দেখিতে পাওয়া যায় নাই। বিদ্যাপতিকে কেহ কেহ বিদ্বেষ করিয়া নর্ত্তক কহিত। শিবমন্দিরে সময়ে সময়ে ভাবাবেশে তিনি নৃত্য করিতেন। দ্বৈতপরিশিষ্ট গ্রন্থকর্ত্তা কেশব মিশ্র বিদ্যাপতিকে অতিলুব্ধ নগরযাজক বলিয়াছিলেন, তাহার কারণ বিদ্যাপতি বিসফী গ্রাম দানগ্রহণ করিয়াছিলেন। কেশব মিশ্রের কাল ৪৭৩ ল সং, অর্থাৎ বিদ্যাপতির শতাধিক বর্ষ পরে। বঙ্গদেশে প্রবাদ আছে বিদ্যাপতি রাণী লখিমার প্রতি আসক্ত ছিলেন। বৈষ্ণব কবিগণ এই প্রবাদকে প্রশ্রয় দেন। উহা সর্ব্বৈব অমূলক ও মিথ্যা। পতিপত্নীর নাম একত্র লিখিবার প্রথা আছে। ভূরি ভূরি পদে বিদ্যাপতি সপত্নীক অপর ব্যক্তিদিগের নাম লিখিয়াছেন। শিবসিংহের রাজ্যাবসান হইলে লখিমা অনেককাল জীবিতা ছিলেন, কিন্তু বিদ্যাপতি আর তাঁহার নাম কোন পদে উল্লেখ করেন নাই। লখিমা ব্যতীত শিবসিংহের আরও তিন রাণীর নাম কবির পদে পাওয়া যায়। মিথিলায় বিদ্যাপতির সম্বন্ধে অনেক প্রবাদ আছে। পক্ষধর মিশ্র এবং কবির সম্বন্ধেও প্রবাদ আছে। প্রকাশিত ও পরিচিত পদাবলী ব্যতীত

বিদ্যাপতি বিরচিত লোকাচারের কতকগুলি পদ আছে। পুরস্ত্রীগণ সেগুলি গান করিয়া থাকে। অনেক চেষ্টায় কতকগুলি পদ সংগৃহীত হইয়াছে। "উচিতী" ও "জোগ" নামে এই গীতগুলি প্রসিদ্ধ। "উচিতী" অর্থে উচ্চতা, জামাতাভোজন করিলে তাঁহার সম্মানের জন্য রমণীগণ এই সকল গান করে। "জোগ" অর্থে বশীকরণ, হিন্দীতে যাহাকে জাদু বলে। জামাতাকে বধূর বশীভূত করিবার জন্য এই সকল পদ গীত হইয়া থাকে। প্রবন্ধপাঠক বিদ্যাপতির দুইটি অপ্রকাশিত পদ পাঠ করিয়া প্রবন্ধ সমাপ্ত করিলেন।

প্রবন্ধ পাঠান্তে শ্রীযুক্ত তর্কালঙ্কার মহাশয় শ্রীযুক্ত সত্যেন্দ্রনাথ ঠাকুর মহাশয়কে সভাপতির আসন ছাড়িয়া দিলেন।

৫। শ্রীযুক্ত হীরেন্দ্রনাথ দত্ত তাঁহার "বেদান্তদর্শন" প্রবন্ধের উত্তরাংশ পাঠ করিলেন। এই অংশে রামানুজ মত সবিস্তারে বিবৃত হইল। বিশিষ্টাদ্বৈত মতানুযায়ী ব্রহ্মের স্বরূপ, জীবের ও জগতের স্বরূপ, ব্রহ্মের সহিত জীবের ও জগতের সম্বন্ধ, মুক্তির উপায় ও মুক্তির স্বরূপ প্রভৃতি বর্ণিত হইল। এই সুদীর্ঘ মনোহর প্রবন্ধের সংক্ষেপে সারসংগ্রহ অসম্ভব। উহা সাহিত্য-পত্রিকায় প্রকাশিত হইবে ও লেখক-প্রণীত গীতায়-ঈশ্বরবাদ পুস্তিকার অন্তর্ভুক্ত হইবে।

প্রবন্ধ পাঠান্তে সভাপতি মহাশয়ের অনুরোধে সহকারী সভাপতি শ্রীযুক্ত তর্কালঙ্কার মহাশয় সংক্ষেপে অদ্বৈতবাদ ও বিশিষ্টাদ্বৈতবাদের সম্বন্ধের উল্লেখ করিলেন। রামানুজ-ভাষ্য অতি কঠিন, শাঙ্করভাষ্য তুলনায় অতি সরল। এইরূপে উভয়ের সম্বন্ধ দিবারাত্রির ন্যায়। উভয়ে আবার দিবারাত্রির ন্যায় পরস্পর সংলগ্ন। রামানুজমত প্রথমাধি-কারীর জন্য প্রশস্ত, উহাতে অধিকার জন্মিলে শঙ্করমতে প্রবেশ সুগম হয়। বক্তা স্বয়ং শঙ্করমতের পক্ষপাতী হইলেও বর্ত্তমান স্থলে উভয় মতের সমালোচনা করিতে অনিচ্ছুক প্রবন্ধলেখক স্বয়ং উভয় মতের পরিচয়মাত্র দিয়া নিরস্ত হইয়াছেন, সমালোচনা করেন নাই হীরেন্দ্রবাবুর পাণ্ডিত্য ও রচনাকৌশল ও প্রাঞ্জল ব্যাখ্যাপ্রণালীর জন্য তর্কালঙ্কার মহাশয় তাঁহাকে শতমুখে প্রশংসা করিলেন। হীরেন্দ্রবাবু দীর্ঘজীবী হউন। সমস্ত সভা এই প্রার্থনে যোগদান করিলেন।

৬। পরিষদের সভ্য ৺উমাকান্ত রায়ের মৃত্যুতে শোক প্রকাশ হইল।

পরে সভাপতিকে ধন্যবাদান্তে সভাভঙ্গ হইল।

শ্রীরামেন্দ্রসুন্দর ত্রিবেদী,
সম্পাদক।

শ্রীসত্যেন্দ্রনাথ ঠাকুর,
সভাপতি।

অষ্টম মাসিক অধিবেশন।

২৪শে পৌষ, ৮ই জানুয়ারী, অপরাহ্ন ৫টা।

উপস্থিত ব্যক্তিগণ

শ্রীযুক্ত সত্যেন্দ্রনাথ ঠাকুর, (সভাপতি)

মাননীয় বিচারপতি „ সারদাচরণ মিত্র, (সহকারী সভাপতি)

শ্রীযুক্ত দেবেন্দ্রনাথ সেন	শ্রীযুক্ত রায় যতীন্দ্রনাথ চৌধুরী এম্,এ; বি,এল্
„ দীনেশচন্দ্র সেন বি,এ	„ সতীশচন্দ্র বিদ্যাভূষণ এম,এ
„ নগেন্দ্রনাথ গুপ্ত	„ বীরেশ্বর গোস্বামী
„ মুনীন্দ্রনাথ সাংখ্যরত্ন	„ রামনাথ চক্রবর্ত্তী
„ রামহরি ভড় বি, এল্	„ যোগেন্দ্রনাথ ঘটক
„ সুধীন্দ্রনাথ ঠাকুর বি, এল্	„ নগেন্দ্রনাথ গঙ্গোপাধ্যায়
„ সুরেশচন্দ্র সমাজপতি	„ দেবেন্দ্রনাথ গঙ্গোপাধ্যায়
„ বামাচরণ চট্টোপাধ্যায়	„ বিপিনবিহারী মিত্র
„ চিত্তসুখ সান্যাল	„ মন্মথনাথ মিত্র,
„ ক্ষিতীশচন্দ্র চক্রবর্ত্তী বি,এল্	„ অন্নদাপ্রসাদ নন্দী
„ উমেশচন্দ্র ঘোষ	„ কালীরঞ্জন লাহিড়ী
„ রাজকৃষ্ণ দত্ত	„ খগেন্দ্রনাথ চট্টোপাধ্যায়, বি, এ
„ সুরেন্দ্রকুমার সেন	„ বঙ্কুবিহারী রায় কবিরাজ
„ অনুকূলচন্দ্র সেন	„ পূর্ণচন্দ্র দে, বি, এ
„ শৌরীন্দ্রমোহন গুপ্ত	„ রামেন্দ্রসুন্দর ত্রিবেদী এম্,এ(সম্পাদক)
	„ ব্যোমকেশ মুস্তফী (সহঃ সম্পাদক)

১। গত অধিবেশনের কার্য্য-বিবরণ পঠিত ও অনুমোদিত হইল।

২। নিম্নলিখিত ব্যক্তিগণ যথারীতি নির্ব্বাচিত হইলেন :—

প্রস্তাবক	সমর্থক	সভ্য
...েন্দ্রকুমার বসু	শ্রীব্যোমকেশ মুস্তফী	১ শ্রীচুনিলাল সরকার বি, ই,
„	„	অধ্যাপক, শিবপুর ইঞ্জিনিয়ারিং কলেজ, সোণাই ২য় গলি খিদিরপুর
...থমোহন বসু	„	২ শ্রীশশিশেখর বন্দ্যোপাধ্যায়, ৮জেলেটোলা লেন,
„	„	৩ শ্রীচন্দ্রশেখর বন্দ্যোপাধ্যায়, ঐ
„	শ্রীরামেন্দ্রসুন্দর ত্রিবেদী	৪ শ্রীবরদাপ্রসন্ন সোম, ভূতপূর্ব্ব সবজজ, চুঁচুড়া।
...েন্দ্রমোহন দাস	শ্রীব্যোমকেশ মুস্তফী	৫ শ্রীশ্রীশচন্দ্র বসু, বি, এ,

প্রস্তাবক	সমর্থক	সভ্য
শ্রীজ্ঞানেন্দ্রমোহন দাস	শ্রীব্যোমকেশ মুস্তফী	৬ ডাক্তার বি, ডি, বসু, আই, এম, এস্, মেজর
,,	,,	৭ কবিরাজ শ্রীনীলমাধব সেনগুপ্ত, এলাহাবাদ,
শ্রীরামেন্দ্রসুন্দর ত্রিবেদী,	,,	৮ শ্রীমধুসূদন ভট্টাচার্য্য, রঘুনাথগঞ্জ
শ্রীসত্যকৃষ্ণ রায়	,,	৯ শ্রীপ্রবোধচন্দ্র ঘোষ, ২৩।১ নয়ানচাঁদ দত্তের ষ্ট্রীট,
শ্রীসুধীন্দ্রনাথ ঠাকুর	শ্রীরামেন্দ্রসুন্দর ত্রিবেদী,	১০ শ্রীদেবেন্দ্রনাথ সেন,
শ্রীরামেন্দ্রসুন্দর ত্রিবেদী	শ্রীসুরেশচন্দ্র সমাজপতি,	১১ শ্রীসরোজকৃষ্ণ ঘোষ, পাঁচথুপী।

৩। পুস্তকের উপহারদাতাদিগকে ধন্যবাদ দেওয়া হইল।

৪। শ্রীযুক্ত নগেন্দ্রনাথ গুপ্ত মহাশয় বিদ্যাপতিপদাবলীর প্রাচীনতম পুঁথি প্রদর্শন করিলেন। এই উপলক্ষে তিনি বলিলেন :—এই পুঁথির বৃত্তান্ত তিনি এক বৎসর হইতে অবগত আছেন, কিন্তু দেখিবার কোন আশা ছিল না বলিয়া সে কথার উল্লেখ করেন নাই। বিদ্যাপতির স্বহস্ত লিখিত ভাগবত গ্রন্থ ও এই তালপত্রের পুঁথি একত্র রক্ষিত ছিল। ১৫ বৎসর পূর্ব্বে মিথিলার দুই জন প্রসিদ্ধ পণ্ডিত এই পুঁথিখানি আদ্যোপান্ত নকল করেন। পুঁথি ও নকল সেই সময় অপহৃত হয়। সম্প্রতি উহা শ্রীযুক্ত মোহিনীমোহন দত্ত মুন্সেফ মহাশয়ের হাতে আসে, মাননীয় বিচারপতি শ্রীযুক্ত সারদাচরণ মিত্র মহাশয় তাঁহাকে পত্র লেখায় তিনি পুঁথি ও নকল দিয়া গিয়াছেন। বিদ্যাপতির পদাবলীর ইহা অপেক্ষা প্রাচীন পুঁথি নাই। প্রবাদ আছে উহা বিদ্যাপতির প্রপৌত্রের লিখিত। এই পুঁথি অবলম্বন করিয়া অনেকগুলি প্রতিলিপি প্রস্তুত হইয়াছে, কিন্তু সমস্ত পদ কোন পুঁথিতে পাওয়া যায় না। পদসংখ্যা প্রায় ৪০০ হইবে। শিবসিংহের রাজ্যারোহণ সম্বন্ধে পদ—"অনল রন্ধ্র কর লকৃখণ নরবই সক সমুদ্দ কর অসিনি সগী" ইত্যাদি প্রথমে এই পুঁথিতে পাওয়া যায়। ইহাতে বিদ্যাপতির কয়েকটী উপাধিও পাওয়া যায়। অনেক নূতন নাম আছে। পাঠ বিশুদ্ধ। এই গ্রন্থখানি মহামূল্য।

বিদ্যাপতির লিখিত ভাগবত গ্রন্থের সময় ৩০৯ ল সং। এই কাল সম্বন্ধে কোন কোন সভ্য সংশয় করিয়াছিলেন। শ্রীযুক্ত বিনোদবিহারী কাব্যতীর্থ ৩৪৯ ল সং, দেখিয়া আসিয়াছিলেন এরূপ অনুমান হয়। নগেন্দ্রবাবু মহামহোপাধ্যায় শ্রীযুক্ত হরপ্রসাদ শাস্ত্রী মহাশয়কর্ত্তৃক লিখিত এসিয়াটিক সোসাইটীর বিবরণী হইতে পাঠ করিয়া দেখাইলেন যে কাব্যতীর্থ মহাশয়ও ৩০৯ ল সং দেখিয়া আসিয়াছিলেন। ১২৯৫ সালে প্রকাশিত কবীশ্বর শ্রীযুক্ত চণ্ডা ঝা কর্ত্তৃক সম্পাদিত পুরুষপরীক্ষা গ্রন্থেও ভাগবতের কাল ৩০৯ ল সং নির্দ্দেশ করা আছে। ৩৪৯ হইলে কবির সম্বন্ধে যাহা জানিতে পারা গিয়াছে তাহাতে তাঁহার আয়ুকাল ১২৫ কিম্বা ১৫০ বৎসর হইয়া পড়ে।

সম্প্রতি এসিয়াটিক সোসাইটীতে একখানি পুস্তক আসিয়াছে সেখানি ২৯১ লক্ষ্মণ সেন সম্বতে লেখা। শ্রীধর বিরচিত কাব্যপ্রকাশ গ্রন্থের কাব্যবিকাশবিবেক নামক একখানি ভাষ্য। বিদ্যাপতির আদেশে দেবশর্ম্মা ও প্রভাকর নামক দুই ব্যক্তিকর্ত্তৃক গজরথপুর নগরে (শিব-সিংহের রাজধানী) লিখিত। ইহা হইতেও বিদ্যাপতির কালনির্ণয় অনেক আনুকূল্য হয়।

৫। তৎপরে শ্রীযুক্ত নগেন্দ্রনাথ গুপ্ত মহাশয় "গোবিন্দদাস" নামক প্রবন্ধ পাঠ করিলেন।* প্রবন্ধের সারমর্ম এই :—গোবিন্দ দাস নামক যে কয়জন পদকর্ত্তা আছেন তাঁহাদের পদ স্বতন্ত্র করিয়া নির্দ্দেশ করা যায় না এইরূপ বিশ্বাস প্রচলিত আছে। গোবিন্দচন্দ্র সেন অর্থাৎ গোবিন্দ দাস কবিরাজ এ দেশের প্রধান কবি। "অষ্টকালীয় একান্নপদ" প্রভৃতি তাঁহার রচিত বলিয়া পুস্তকাদিতে উল্লিখিত হইয়াছে। অপর পদকর্ত্তাদিগের মধ্যে কতকগুলি বাঙ্গালা পদ পদামৃতসমুদ্র গ্রন্থে গোবিন্দ চক্রবর্ত্তীর রচিত বলিয়া নির্দ্দিষ্ট হইয়াছে। গোবিন্দ দাস ভণিতা-যুক্ত পদাবলীর ভাষা তিন প্রকারের—প্রথম খাঁটি বাঙ্গালা ভাষা; দ্বিতীয়ত বাঙ্গালা মিথিলা মিশ্রিত ভাষা; তৃতীয় বিশুদ্ধ মিথিলা ভাষা। এই তৃতীয় শ্রেণীর পদ গোবিন্দ দাস ঝার রচনা। মিথিলায় প্রচলিত পদাবলী সংগৃহীত হইয়াছে। কতকগুলি অপ্রকাশিত পদও পাওয়া গিয়াছে।

মাননীয় বিচারপতি সারদাচরণ মিত্র বলিলেন, "আমি যখন প্রাচীন কাব্যসংগ্রহ প্রকাশ আরম্ভ করি, তখন বিদ্যাপতিকে বাঙ্গালী জানিতাম। তৎপরে বিদ্যাপতি মিথিলাবাসী স্থির হইয়াছেন। কিছুদিন পূর্ব্বে চণ্ডা ঝা ও নগেন্দ্রবাবুর সমক্ষে দ্বারবঙ্গের মহারাজ আমাকে গোবিন্দদাসের কথা বলেন, তিনি মহারাজের মাতৃকুলের পূর্ব্বপুরুষ। পূজার পর মিথিলায় গিয়া মিথিলার এই গোবিন্দ দাস কবির কথা আরও শুনিতে পাই। মিথিলা হইতে কতক পদ সংগৃহীত হইয়াছে ও আরও পাওয়া যাইবে। সেগুলি দেখিলে স্থির হইবে মিথিলার কবির পদ বাঙ্গালীর নামে এ দেশে চলিয়াছে কি না? পূর্ব্বে মিথিলার সহিত বাঙ্গালার অতি নিকট সম্পর্ক ছিল; উভয় প্রদেশের লিপি সাদৃশ্যে এখনও তাহার পরিচয় আছে। মিথিলার গোবিন্দ দাসের পদ এ দেশে আসা অসম্ভব নহে।"

শ্রীযুক্ত দীনেশচন্দ্র সেন প্রবন্ধ-পাঠক ও মাননীয় বিচারপতি মহাশয়কে তাঁহাদের আবিষ্ক্রিয়ার ও পরিশ্রমের জন্য ধন্যবাদ দিয়া বলিলেন, কেবল ভাষা দেখিয়া পদগুলি কোন্ গোবিন্দদাসের তাহা নির্ণয় করা কঠিন। এখানকার বাঙ্গালীকর্ত্তৃক অশুদ্ধ মৈথিলীতে লিখিত পদ মিথিলায় গিয়া বিশুদ্ধ আকার ধারণ করিয়া সেখানকার গোবিন্দ দাসে আরোপিত হওয়াও অসম্ভব নহে। গোবিন্দ দাস কবিরাজ বিখ্যাত কবিবংশে জন্মিয়াও কবিরাজ বলিয়া বর্ণিত হইয়াছেন। তাঁহার সমসাময়িক জ্ঞানদাসাদি প্রসিদ্ধ কবিগণের অপেক্ষাও তাঁহার কবিকীর্ত্তি বৈষ্ণবসাহিত্যে প্রশংসার সহিত ঘোষিত হইয়াছে। মিথিলার গোবিন্দদাসের সম্বন্ধে এরূপ ঐতিহাসিক সাক্ষ্য এখনও পাওয়া যায় নাই। বাঙ্গালী গোবিন্দদাস কবিরাজের নামে পরিচিত ভাল পদগুলি এখনও আমরা মৈথিলী কবিকে দিতে সাহসী হইতেছি না।

সভাপতি মহাশয় প্রবন্ধ-লেখককে ধন্যবাদান্তে বলিলেন, কোন্ পদটি কোন্ গোবিন্দদাসের তাহা এখনও নিঃসন্দেহে বলিবার সময় হয় নাই। এ সম্বন্ধে আরও সংগ্রহ আবশ্যক। ভাষা-গত প্রমাণ ব্যতীত ঐতিহাসিক প্রমাণ পাওয়া গেলে সিদ্ধান্তপক্ষে আরও সুবিধা হইবে। আশা

* এই প্রবন্ধ বঙ্গভাষা ফাল্গুন সংখ্যায় প্রকাশিত হইয়াছে।

করা যায় নগেন্দ্রবাবু অনুসন্ধান দ্বারা ও নূতন পদ সংগ্রহ দ্বারা এ বিষয়ে তথ্যনির্ণয়ে সমর্থ হইবেন।

৬। শ্রীযুক্ত নগেন্দ্রনাথ বসু অনুপস্থিত থাকায় তাঁহার "আয়ুধরাজবংশ" প্রবন্ধের পাঠ স্থগিত রহিল।

৭। শ্রীযুক্ত দক্ষিণারঞ্জন মিত্র মজুমদার প্রেরিত "একাদশকবির মনসার ভাসান" ও শ্রীযুক্ত মোক্ষদাচরণ ভট্টাচার্য্য প্রেরিত "নিরক্ষর কবি ও গ্রাম্য কবিতা" নামক সুদীর্ঘ প্রবন্ধ দুইটি সময়াভাবে পঠিত স্বরূপে গ্রহণ করা হইল। উহা পরিষৎ-পত্রিকায় প্রকাশিত হইবে।

৮। তৎপরে সভাপতি মহাশয় কতিপয় সংস্কৃত উদ্ভট কবিতার ও পারসী কবিতার বাঙ্গালা পদ্যে স্বকৃত অনুবাদ পাঠ করিয়া উপস্থিত সভ্যগণের আনন্দবর্দ্ধন করিলেন।

তৎপরে সভাপতি মহাশয়কে ধন্যবাদান্তে সভাভঙ্গ হইল।

শ্রীরামেন্দ্রসুন্দর ত্রিবেদী	শ্রীশরৎকুমার রায়
সম্পাদক	সভাপতি

বিশেষ অধিবেশন।

২২এ মাঘ, ৪ঠা ফেব্রুয়ারী, শনিবার, অপরাহ্ণ ৫টা।

মাননীয় বিচারপতি শ্রীযুক্ত সারদাচরণ মিত্র প্রভৃতি দ্বাদশ জন সভ্যের অনুরোধ পত্রের অনুসারে ৺মহর্ষি দেবেন্দ্রনাথ ঠাকুরের স্মরণার্থ সাহিত্য-পরিষদের এই বিশেষ অধিবেশন জেনারল এসেম্ব্লিজ ইনষ্টিটিউসন হলে আহূত হইয়াছিল। সভাস্থলে প্রায় দুইশত গণ্যমান্য লোক উপস্থিত ছিলেন। তন্মধ্যে কতিপয়ের নাম নিম্নে দেওয়া হইল:—

মহামহোপাধ্যায় শ্রীচন্দ্রকান্ত তর্কালঙ্কার (সহকারী সভাপতি)

শ্রীরবীন্দ্রনাথ ঠাকুর	শ্রীশিবনাথ শাস্ত্রী
শ্রীমোহিতচন্দ্র সেন	শ্রীহীরেন্দ্রনাথ দত্ত
শ্রীরায় যতীন্দ্রনাথ চৌধুরী	শ্রীশিবাপ্রসন্ন ভট্টাচার্য্য
শ্রীরায় ডাক্তার চুনিলাল বসু বাহাদুর	শ্রীসুরেশচন্দ্র সমাজপতি
শ্রীযতীশচন্দ্র সমাজপতি	শ্রীবিহারিলাল সরকার
শ্রীনিখিলনাথ রায়	শ্রীদীনেশচন্দ্র সেন
শ্রীঅমূল্যচরণ ঘোষ বিদ্যাভূষণ	শ্রীকালীপ্রসন্ন বন্দ্যোপাধ্যায়
শ্রীনগেন্দ্রনাথ বসু	শ্রীসত্যভূষণ বন্দ্যোপাধ্যায়

শ্রীরায় বৈকুণ্ঠনাথ বসু বাহাদুর	শ্রীসতীশচন্দ্র বিদ্যাভূষণ
শ্রীপাঁচকড়ি বন্দ্যোপাধ্যায়	শ্রীপূর্ণচন্দ্র গোস্বামী
শ্রীবীরেশ্বর পাঁড়ে	শ্রীযোগীন্দ্রনাথ বসু
শ্রীপ্রফুল্লনাথ ঠাকুর	শ্রীঅরুণেন্দ্রনাথ ঠাকুর
শ্রীগুরুদাস চট্টোপাধ্যায়	শ্রীনিখিলমোহন মুখোপাধ্যায়
শ্রীশিবধন বিদ্যার্ণব	শ্রীবলাইচাঁদ গোস্বামী
শ্রীচণ্ডীচরণ বন্দ্যোপাধ্যায়	শ্রীমন্মথনাথ সেন
শ্রীবীরেশ্বর গোস্বামী,	শ্রীযোগেশচন্দ্র ঘোষ,
শ্রীরমেশচন্দ্র বসু,	শ্রীসুরেন্দ্রনাথ অধিকারী,
শ্রীনন্দমোহন চট্টোপাধ্যায়,	শ্রীদ্বিজেন্দ্রনাথ বাগচি,
শ্রীদেবেন্দ্রনাথ ঘোষ,	শ্রীরামেন্দ্রসুন্দর ত্রিবেদী (সম্পাদক)
শ্রীপ্রিয়নাথ মুখোপাধ্যায়,	শ্রীমন্মথমোহন বসু, (সহকারী সম্পাদক)
	শ্রীব্যোমকেশ মুস্তফী, ঐ

১। পরিষদের সহকারী সভাপতি মহামহোপাধ্যায় শ্রীযুক্ত চন্দ্রকান্ত তর্কালঙ্কার মহোদয় সভাপতির আসন গ্রহণ করিয়া সভার উদ্দেশ্য বুঝাইয়া দিলেন।

২। তৎপরে শ্রীযুক্ত পণ্ডিত শিবনাথ শাস্ত্রী এম্, এ, মহাশয় এই প্রথম প্রস্তাব উপস্থিত করিলেন;—"তত্ত্ববোধিনী সভার ও তত্ত্ববোধিনী পত্রিকার প্রতিষ্ঠাতা, বঙ্গসাহিত্যের শ্রেষ্ঠ লেখকগণের পরম সহায়, বঙ্গসাহিত্যের আধুনিক অভ্যুদয়ে অন্যতম অধিনেতা ৺মহর্ষি দেবেন্দ্রনাথ ঠাকুর তাঁহার পুণ্যজীবনের আদর্শ প্রতিষ্ঠায় বঙ্গদেশকে, বঙ্গসমাজকে, গৌরবযুক্ত ও সমুন্নত করিয়া, বঙ্গসাহিত্যে তাঁহার জীবনের প্রভাব গভীরভাবে অঙ্কিত রাখিয়া, বৈজ্ঞানিক, দার্শনিক ও ধর্ম্মসাহিত্যের বিবিধ শাখায় নূতনভাবের স্রোত প্রবাহিত করাইয়া, তাঁহার কর্ম্মবহুল দীর্ঘজীবনের অবসানে শান্তিধামে বিশ্রামলাভ করিয়াছেন, এই উপলক্ষে বঙ্গসাহিত্যের প্রতিনিধিস্বরূপ বঙ্গীয় সাহিত্য-পরিষৎ গভীর মর্ম্মবেদনা ব্যক্ত করিতেছেন এবং তাঁহার জীবনের পুণ্যস্মৃতি বর্ত্তমান ও ভবিষ্যৎ সাহিত্যসেবকগণকে নিষ্ঠার সহিত ও শ্রদ্ধার সহিত কর্ত্তব্যপথে প্রেরিত করিবে, ইহাই প্রার্থনা করিতেছেন।"

শাস্ত্রী মহাশয় বাঙ্গালা গদ্য সাহিত্যে তত্ত্ববোধিনী পত্রিকার প্রভাব উল্লেখ করিয়া মহর্ষির স্বদেশীয় সাহিত্যে অনুরাগের নানা উদাহরণ দিলেন। যে সময়ে লোকে বাঙ্গালা লিখিতে ও পড়িতে ঘৃণা করিত, তিনি তখন বাঙ্গালায় ধর্ম্মব্যাখ্যা করিতেন, বাঙ্গালায় ধর্ম্মগ্রন্থ লিখিতেন। সর্ব্ববিষয়ে তিনি যেমন সুন্দর শোভনের পক্ষপাতী ছিলেন, সাহিত্যেও তেমনই সুন্দর শোভনে তাঁহার পক্ষপাত ছিল। আধুনিক বাঙ্গালা সাহিত্যেও তাঁহার অতিশয় শ্রদ্ধা ছিল। তাঁহার প্রভাব তাঁহার পুত্রগণে সংক্রান্ত হইয়া বাঙ্গালা সাহিত্যে নূতন যুগ উপস্থিত করিয়াছে।

মাইকেলের জীবনচরিতরচয়িতা শ্রীযুক্ত যোগীন্দ্রনাথ বসু বি, এ এবং অধ্যাপক শ্রীযুক্ত

মোহিতচন্দ্র সেন এম,এ, মহাশয়, মহর্ষি বাঙ্গালা সাহিত্যে উপনিষদের অনুবাদাদি দ্বারা যে মহৎ কার্য্য সম্পাদন করিয়াছেন, তাহার বিশেষ উল্লেখ করিয়া প্রথম প্রস্তাবের সমর্থন করিলেন।

তৎপরে সভাস্থ ব্যক্তিগণ নীরবে দণ্ডায়মান হইয়া প্রথম প্রস্তাব অনুমোদন করিলেন।

৩। দ্বিতীয় প্রস্তাব :—'বঙ্গীয় সাহিত্য-পরিষদের ভূতপূর্ব্ব সভাপতি শ্রীযুক্ত দ্বিজেন্দ্রনাথ ঠাকুর, বর্ত্তমান সভাপতি শ্রীযুক্ত সত্যেন্দ্রনাথ ঠাকুর, ভূতপূর্ব্ব সহকারী সভাপতি শ্রীযুক্ত জ্যোতিরিন্দ্রনাথ ঠাকুর মহোদয়গণ ও তাঁহাদের স্বজনবর্গ বঙ্গসাহিত্যের উপাসনা তাঁহাদের জীবনের মহাব্রত স্বরূপ গ্রহণ করিয়া আত্মোৎসর্গ করিয়াছেন এবং তাঁহাদের পিতৃদেব হইতে লব্ধ প্রাণদ্বারা বঙ্গের সাহিত্যতরুতে নূতন প্রাণ সঞ্চারিত করিয়া উহাকে পত্রপল্লবে ও ফলপুষ্পে মণ্ডিত ও শোভিত করিয়াছেন; তাঁহাদের পরমস্নেহের আস্পদ এই বঙ্গীয় সাহিত্য-পরিষৎ তাঁহাদের পিতৃবিয়োগে আন্তরিক সমবেদনা প্রকাশ করিতেছেন এবং তাঁহারা দীর্ঘজীবন লাভ করিয়া তাঁহাদের ব্রত উদযাপনে সমর্থ হউন, বিধাতৃসমীপে এই কামনা জানাইতেছেন।"

শ্রীযুক্ত দীনেশচন্দ্র সেন বি,এ এক সুদীর্ঘ প্রবন্ধে* মহর্ষির জীবনচরিত সম্যকরূপে আলোচনা করিয়া এই প্রস্তাব উপস্থিত করিলেন ও শ্রীযুক্ত হীরেন্দ্রনাথ দত্ত এম,এ, বি,এল, ও শ্রীযুক্ত চণ্ডীচরণ বন্দ্যোপাধ্যায় মহাশয়দ্বয় মহর্ষির চারিত্রবল, ভাগ্যবিপর্য্যয়ে অভাবের মধ্যে মহত্ত্বরক্ষা ও তৎকর্ত্তৃক বঙ্গসাহিত্যে উপনিষৎ চর্চ্চার আরম্ভ প্রভৃতির উল্লেখ করিয়া ঐ প্রস্তাব সমর্থন করিলে উহা সভাকর্ত্তৃক অনুমোদিত হইল।

৪। তৎপরে শ্রীযুক্ত রায় যতীন্দ্রনাথ চৌধুরী এম,এ, বি,এল, মহাশয় মহর্ষির স্মৃতিরক্ষার আবশ্যকতা বুঝাইয়া এই তৃতীয় প্রস্তাব উপস্থিত করিলেন :—"বঙ্গীয় সাহিত্য-পরিষৎ তাহার সঙ্কল্পিত মন্দিরে ৺মহর্ষি দেবেন্দ্রনাথ ঠাকুরের কোনরূপ স্মৃতিচিহ্ন ধারণের ব্যবস্থা করিবেন এবং তাঁহার স্মৃতি রক্ষার্থ সাধারণ হইতে যে কোন সংকল্প হইবে তাহার সিদ্ধির জন্য আনন্দের সহিত যোগ দিবেন।" শ্রীযুক্ত পণ্ডিত সতীশচন্দ্র বিদ্যাভূষণ এম, এ, মহাশয় মহর্ষির প্রচারিত বেদান্তবাদের সহিত পূর্ব্বাচার্য্যগণের প্রচারিত বেদান্তবাদের সম্বন্ধ নির্ণয় করিয়া ঐ প্রস্তাবের সমর্থন করিলে উহা অনুমোদিত হইল।

তৎপরে সম্পাদক শ্রীযুক্ত রামেন্দ্রসুন্দর ত্রিবেদী মহর্ষির সাহিত্যে প্রভাবের উল্লেখ করিয়া একটি ক্ষুদ্র প্রবন্ধ† পাঠ করিলে সভাপতি মহাশয় সংক্ষেপে মহর্ষির গুণ কীর্ত্তন করিলেন।

শ্রীযুক্ত পাঁচকড়ি বন্দ্যোপাধ্যায় সভাপতিকে ও শ্রীযুক্ত মন্মথমোহন বসু বি,এ, (সহকারী সম্পাদক) জেনারালএসেম্‌ব্লিজ কলেজের অধ্যক্ষদিগকে ধন্যবাদ জ্ঞাপন করিলে রাত্রি ৭।০ টার সময় সভাভঙ্গ হইল।

শ্রীরামেন্দ্রসুন্দর ত্রিবেদী
সম্পাদক

শ্রীশরৎকুমার রায়
সভাপতি

---

* এই প্রবন্ধ চৈত্র মাসের ভারতী পত্রিকায় প্রকাশিত হইয়াছে।

† ঐ প্রবন্ধ ফাল্গুন মাসের বঙ্গদর্শনে প্রকাশিত হইয়াছে।

নবম মাসিক অধিবেশন।

৭ই ফাল্গুন, ১৯ ফেব্রুয়ারী, রবিবার অপরাহ্ন ৫ টা।

উপস্থিত ব্যক্তিগণ।

শ্রীযুক্ত কুমার শরৎকুমার রায় এম,এ (সভাপতি)

শ্রীযুক্ত হীরেন্দ্রনাথ দত্ত এম্, এ; বি, এল্	শ্রীযুক্ত ক্ষীরোদপ্রসাদ বিদ্যাবিনোদ এম, এ
„ নগেন্দ্রনাথ বসু	„ রমেশচন্দ্র বসু
„ নগেন্দ্রনাথ গুপ্ত	„ দীনেশচন্দ্র সেন বি, এ
„ সুরেশচন্দ্র সমাজপতি	„ প্রমথনাথ বন্দ্যোপাধ্যায়
„ শিবাপ্রসন্ন ভট্টাচার্য্য	„ মুনীন্দ্রনাথ সাংখ্যরত্ন
„ সতীশচন্দ্র বিদ্যাভূষণ এম,এ	„ যোগেশচন্দ্র ঘোষ
„ পূর্ণচন্দ্র গোস্বামী এম, এ	„ সত্যকৃষ্ণ রায়
„ চারুচন্দ্র দে	„ কামিনীনাথ রায়
„ সত্যভূষণ বন্দ্যোপাধ্যায়	„ প্রবোধচন্দ্র বিদ্যানিধি
„ অমৃতকৃষ্ণ মল্লিক	„ রামেন্দ্রসুন্দর ত্রিবেদী এম্, এ (সম্পাদক)
„ ত্রৈলোক্যনাথ চট্টোপাধ্যায়	„ মন্মথমোহন বসু বি,এ (সহকারী সম্পাদক)
	„ ব্যোমকেশ মুস্তফী (সহকারী সম্পাদক)

১। সভাপতি ও সহকারী সভাপতিগণের অনুপস্থিতিতে শ্রীযুক্ত শরৎকুমার রায় সর্ব্বসম্মতিক্রমে সভাপতির আসন গ্রহণ করিলেন।

২। অষ্টম মাসিক অধিবেশনের ও বিশেষ অধিবেশনের কার্য্যবিবরণ পঠিত ও গৃহীত হইল।

৩। নিম্নলিখিত ব্যক্তিগণ যথারীতি সভ্যরূপে নির্ব্বাচিত হইলেন।

প্রস্তাবক	সমর্থক	সভ্য
শ্রীনগেন্দ্রনাথ বসু	শ্রীরামেন্দ্রসুন্দর ত্রিবেদী	শ্রীমহেন্দ্রকুমার সাহা চৌধুরী, দীঘাপতিয়া রাজবাটী, রাজসাহী
শ্রীকিরণচন্দ্র দে		" ললিতমোহন বন্দ্যোপাধ্যায়, ঠাকুরগাঁও, দিনাজপুর
শ্রীব্যোমকেশ মুস্তফী		" ভুবনমোহন সাহা, ৮০ কলুটোলা ষ্ট্রীট
		" ইন্দ্রভূষণ মুখোপাধ্যায়, ৪ নিয়োগীপুকুর ওয়েষ্ট লেন
		" নরেন্দ্রনাথ গঙ্গোপাধ্যায়, ৪ নিয়োগীপুকুর ওয়েষ্ট লেন
		" নরেন্দ্রনাথ রায়, ২৩ গ্রীক রোড
		" সিদ্ধেশ্বর মুখোপাধ্যায়, ১৫ লালমাধব মুখুর্য্যের লেন
		" সুরেন্দ্রনাথ ঘোষ, ২৬ নয়ানচাঁদ দত্তের ষ্ট্রীট

প্রস্তাবক	সমর্থক	সভ্য
শ্রীনগেন্দ্রনাথ গুপ্ত	শ্রীহীরেন্দ্রনাথ দত্ত	শ্রীশশিভূষণ চৌধুরী, এসিষ্টাণ্টসেসনস্ জজ রঙ্গপুর
শ্রীদুর্গানারায়ণ সেন শাস্ত্রী	শ্রীব্যোমকেশ মুস্তফী	শ্রীসুরেন্দ্রনাথ গুপ্ত, ২৯ রামকান্ত মিস্ত্রীর লেন
		শ্রীপ্রবোধচন্দ্র রায়, ১২৮ হ্যারিসন রোড্
শ্রীরামহরি ভড়	শ্রীব্যোমকেশ মুস্তফী	শ্রীনগেন্দ্রনাথ স্বর্ণকার, অধ্যাপক, আগরা কলেজ
শ্রীশরচ্চন্দ্র ঘোষ মৌলিক	শ্রীরামেন্দ্রসুন্দর ত্রিবেদী	শ্রীবীরেন্দ্র দেবরায়, ৩৮।১ শিবনারায়ণ দাসের লেন
		শ্রীক্ষিতীন্দ্র দেবরায়, ২৪ সিমলা ষ্ট্রীট
শ্রীদীনেশচন্দ্র সেন	শ্রীব্যোমকেশ মুস্তফী	এইচ, এন্, সেন, স্কোয়ার ইণ্ডিয়াক্লাব, ১১ ষ্ট্রাণ্ড রোড
শ্রীসুরেশচন্দ্র সমাজপতি	শ্রীরামেন্দ্রসুন্দর ত্রিবেদী	শ্রীললিতমোহন বন্দ্যোপাধ্যায়, রাজডাক্তার, মহিষাদল
		কুমার জ্ঞানেন্দ্রচন্দ্র পাঁড়ে, "আলয়" পাকুড় ই,আই,আর লুপ
শ্রীব্যোমকেশ মুস্তফী	শ্রীরামেন্দ্রসুন্দর ত্রিবেদী	শ্রীচণ্ডীচরণ চক্রবর্ত্তী, ২৩ ক্রীক রো
শ্রীকেদারনাথ ঘোষ	শ্রীব্যোমকেশ মুস্তফী	শ্রীচারুচন্দ্র ঘোষ, ৫৪ কাঁসারীপাড়া রোড, ভবানীপুর

৪। গ্রন্থের উপহারদাতাদিগকে ধন্যবাদ দেওয়া হইল।

৫। সম্পাদক লালগোলার রাজা শ্রীযুক্ত যোগেন্দ্রনারায়ণ রায় বাহাদুরের প্রেরিত দ্বিতীয় বর্ষের দান ৩০০৲ টাকার বিষয় সভাকে বিজ্ঞাপিত করিলে সভাপতির স্বাক্ষরযুক্ত পত্রদ্বারা দাতার প্রতি পরিষদের কৃতজ্ঞতা প্রকাশের প্রস্তাব গৃহীত হইল।

৬। সম্পাদক দিনাজপুর, ঠাকুরগাঁও থানার পুলিশ ইনস্পেক্টর শ্রীযুক্ত ললিতমোহন বন্দ্যোপাধ্যায় কর্ত্তৃক পরিষৎকে ১০০৲ টাকা দানের বিষয় সভাকে জানাইলেন ও তদ্বিষয়ে দিনাজপুরের ম্যাজিষ্ট্রেট শ্রীযুক্ত কিরণচন্দ্র দে মহাশয়ের পত্র পাঠ করিলেন। ললিতবাবুকে ও ম্যাজিষ্ট্রেট বাহাদুরকে পরিষদের কৃতজ্ঞতা প্রকাশের প্রস্তাব গৃহীত হইল।

৭। বাঙ্গালা গবর্ণমেণ্ট নিম্ন-প্রাথমিক বিদ্যালয়সমূহে কৃষিশিক্ষার প্রচলন জন্য সম্প্রতি যে Resolution প্রচার করিয়াছেন, উহাতে চতুর্ব্বিধ প্রাদেশিক বাঙ্গালায় পাঠ্যগ্রন্থ রচনার প্রস্তাব হইয়াছে। ঐ Resolution বিবেচনা করিয়া তৎসম্বন্ধে পরিষদের মন্তব্য গবর্ণমেণ্টে ১৫ই মার্চ্চের পূর্ব্বে জানান আবশ্যক, এই মর্ম্মে শ্রীযুক্ত হীরেন্দ্রনাথ দত্তের প্রস্তাবক্রমে পরিষৎ নিম্নোক্ত ব্যক্তিগণকে লইয়া শাখা-সমিতির গঠন অনুমোদন করিলেন।

শাখা-সমিতির সভ্যগণ :—

মাননীয় বিচারপতি শ্রীযুক্ত সারদাচরণ মিত্র এম্, এ; বি, এল্

শ্রীযুক্ত সার গুরুদাস বন্দ্যোপাধ্যায় এম্, এ; ডি, এল্ শ্রীযুক্ত সত্যেন্দ্রনাথ ঠাকুর

" রায় যতীন্দ্রনাথ চৌধুরী এম্, এ; বি, এল্ " হীরেন্দ্রনাথ দত্ত এম্, এ; বি, এল্

" দীনেশচন্দ্র সেন, বি,এ " রামেন্দ্রসুন্দর ত্রিবেদী এম্, এ

শ্রীযুক্ত মন্মথমোহন বসুর প্রস্তাবে স্থির হইল, উক্ত শাখা-সমিতি আবশ্যকমত অপর ব্যক্তিকেও সভ্যরূপে গ্রহণ করিবেন। পরে এই শাখা-সমিতির বিভিন্ন অধিবেশনে নিম্নলিখিত ব্যক্তিগণ এই শাখা-সমিতির সভ্যরূপে গৃহীত হন,—শ্রীযুক্ত অবিনাশচন্দ্র দাস এম, এ; বি, এল,

শ্রীযুক্ত নিখিলনাথ রায় বিএল্, শ্রীযুক্ত চন্দ্রনাথ বসু এম্, এ; বি এল্ ও শ্রীযুক্ত অমূল্যচরণ ঘোষ বিদ্যাভূষণ।

৮। শ্রীযুক্ত নগেন্দ্রনাথ গুপ্ত কার্য্য-নির্ব্বাহকসমিতির গঠন সম্বন্ধে তাঁহার নিম্নোক্ত স্থগিত প্রস্তাব উপস্থিত করিলেন :—"পরিষদের গত বার্ষিক অধিবেশনে কোন কোন সভ্য উল্লেখ করেন যে কার্য্য নির্ব্বাহক-সমিতির কয়েকজন সভ্য দীর্ঘকাল পর্য্যন্ত চাঁদা দেন নাই। অনুসন্ধান করিয়া আমি জানিতে পারি যে, এই অভিযোগ সত্য। পরিষদের নিয়মাবলীর মধ্যে একটি নিয়ম আছে যে, কোন সভ্যের নিকট ছয়মাসের অধিক চাঁদা পাওনা হইলে, কার্য্য-নির্ব্বাহক-সমিতি সঙ্গত বিবেচনা করিলে সভ্যতালিকা হইতে ঐ সভ্যের নাম উঠাইয়া দিতে পারিবেন। প্রকৃতপক্ষে পরিষদের সকল কার্য্যের ভার কার্য্য-নির্ব্বাহক-সমিতির প্রতি ন্যস্ত। যদি সমিতির কোন সভ্য পরিষদের কোন নিয়ম লঙ্ঘন করেন, তাহা হইলে অপরের কৃত উক্তরূপ অপরাধের বিচার করিতে তিনি অক্ষম। যে সকল সভ্য কার্য্য-নির্ব্বাহক-সমিতির সভ্য নির্ব্বাচিত বা মনোনীত হইবেন, তাঁহারা পরিষদের কোন নিয়ম লঙ্ঘন করিলে পরিষদের কার্য্যে শৈথিল্য হইবার সম্ভাবনা। এই কারণে আমি কয়েক মাস পূর্ব্বে প্রস্তাব করি যে, যে কোন সভ্যের নিকট ছয়মাসের অধিক চাঁদা পাওনা থাকিবে, তিনি কার্য্য-নির্ব্বাহক-সমিতির সভ্যরূপে নির্ব্বাচিত বা মনোনীত হইতে পারিবেন না। এরূপ নিয়ম বৎসরের মাঝামাঝি প্রবর্ত্তিত না হইয়া বৎসরের আরম্ভে প্রবর্ত্তিত করা উচিত বিবেচনা করিয়া আমি উক্ত প্রস্তাব স্থগিত রাখি। এখন বৎসর শেষ হইয়া আসিল, নববর্ষ আগতপ্রায়। যে প্রস্তাব আমি পরিষদের সাক্ষাতে উপস্থিত করিয়াছিলাম, তাহা কার্য্যে পরিণত করিবার সময় আসিয়াছে। আমি প্রস্তাব করিতেছি যে, যে সভ্যের নিকট ছয়মাস বা তদূর্দ্ধকালের চাঁদা বাকি আছে, আগামী বর্ষ হইতে তিনি কার্য্য-নির্ব্বাহক-সমিতির সভ্য নির্ব্বাচিত বা মনোনীত হইতে পারিবেন না। নির্ব্বাচিত বা মনোনীত হইয়া যদি কোন সভ্য ছয় মাস পর্য্যন্ত চাঁদা না দেন, তাহা হইলে তাঁহার স্থানে কার্য্য-নির্ব্বাহক-সমিতি অপর একজন সভ্য মনোনীত করিবেন।"

শ্রীযুক্ত সত্যভূষণ বন্দ্যোপাধ্যায় ঐ প্রস্তাবের সমর্থন করিলেন।

সম্পাদক শ্রীযুক্ত রামেন্দ্রসুন্দর ত্রিবেদী নিম্নোক্ত কারণে ঐ প্রস্তাব পরিবর্ত্তনের জন্য নগেন্দ্র বাবুকে অনুরোধ করিলেন। যে সকল সভ্যের বহুদিনের চাঁদা বাকি আছে, কার্য্য-নির্ব্বাহক-সমিতি তাঁহাদের বাকি টাকা যথেচ্ছ পরিমাণে ছাড়িয়া দিয়া চলিত বৎসর হইতে আদায়ের জন্য আদেশ দিয়াছিলেন। তদনুসারে কোন কোন সভ্য সমস্ত বকেয়া হইতে মুক্তি লাভ করিয়া নূতন বৎসর হইতে চাঁদা দিতেছেন ও তাহার রসিদ লইতেছেন; কেহ বা বকেয়ার দায় হইতে মুক্তিগ্রহণে অনিচ্ছুক হইয়া পুরাতন রসিদ লইয়াই চাঁদা দিয়া আসিতেছেন। উভয় শ্রেণীর সভ্যেরাই এখন কিছুদিন হইতে চাঁদা দিতেছেন; তবে প্রথম শ্রেণীর সভ্যদিগের নিকট বকেয়া সমস্ত ছাড়িতে হইয়াছে; দ্বিতীয় শ্রেণীর নিকট তাহা পাইবার আশা আছে। নগেন্দ্র বাবুর প্রস্তাবে দ্বিতীয় শ্রেণীর সভ্যদের প্রতি তুলনায় অবিচারের সম্ভাবনা। কেননা তাঁহারা

বকেয়া শোধে ইচ্ছুক থাকিয়াও কার্য্য-নির্ব্বাহক-সমিতিতে স্থান পাইবেন না। আর প্রথম শ্রেণীর লোকে বকেয়া হইতে মুক্তি পাইয়া কার্য্য-নির্ব্বাহক-সমিতিতে স্থান পাইবেন।

প্রস্তাবক নগেন্দ্রবাবু তাঁহার প্রস্তাব পরিবর্ত্তনে অসম্মত হওয়ায় সম্পাদক এই সংশোধিত প্রস্তাব (Amendment) উপস্থিত করিলেন :—"নির্ব্বাচনের পূর্ব্বে একবৎসরের মধ্যে যাঁহারা একবর্ষের দেয় চাঁদা প্রদান করেন নাই, তাঁহারা কার্য্য-নির্ব্বাহক-সমিতির সভ্য হইবেন না। সভাপতি এই প্রস্তাবের সমর্থন করিলেন।

উপস্থিত সভ্যগণের ভোটগ্রহণে সম্পাদকের পক্ষে পাঁচটি মাত্র ও বিপক্ষে অধিক ভোট হওয়ায় উহা পরিত্যক্ত হইল।

তৎপরে নগেন্দ্রবাবুর মূল প্রস্তাব অধিকাংশ সভ্যের সম্মতিক্রমে গৃহীত হইল।

৯। শ্রীযুক্ত নগেন্দ্রনাথ বসু "কনোজের আয়ুধরাজবংশ" নামক প্রবন্ধ পাঠ করিলেন।

প্রবন্ধ-পাঠান্তে কাশ্মীররাজ জয়াদিত্য, গৌড়াধিপ আদিশূর ও ধর্ম্মপাল এবং কনোজাধিপতি যশোবর্ম্মদেবের সমসাময়িকতা লইয়া শ্রীযুক্ত সতীশচন্দ্র বিদ্যাভূষণ ও প্রবন্ধলেখক এই উভয়ের মধ্যে অল্প বাদানুবাদ হইল। নগেন্দ্রবাবুর মতে কুলজীগ্রন্থের প্রমাণানুসারে বেদবাণাঙ্গ শকে অর্থাৎ ৬৫৪ শকে বা ৭৩২ খৃঃ অব্দে আদিশূর বর্ত্তমান ছিলেন। কাশ্মীররাজ জয়াদিত্য তাঁহার জামাতা ও কনোজরাজ যশোবর্ম্মদেব সমসাময়িক। পণ্ডিত সতীশচন্দ্র বিদ্যাভূষণ আদিশূরের সময় সম্বন্ধে সংশয় প্রকাশ করিলেন।

১০। শ্রীযুক্ত ব্রজসুন্দর সান্যাল প্রেরিত "মাণিকগাঙ্গুলীর ধর্ম্মমঙ্গল" প্রবন্ধ সহকারী সম্পাদক শ্রীযুক্ত ব্যোমকেশ মুস্তফী পাঠ করিলেন। শ্রীযুক্ত দীনেশচন্দ্র সেন ধর্ম্মমঙ্গল পুস্তক বাঙ্গালার ঐতিহাসিক তত্ত্বনির্ণয়ে কিরূপ সাহায্য করে, তৎসম্বন্ধে অভিপ্রায় ব্যক্ত করিলেন।

১১। শ্রীযুক্ত রমেশচন্দ্র বসুর "বাঙ্গালা পয়ারের উৎপত্তি" নামক প্রবন্ধের পাঠ স্থগিত থাকিল।

তৎপরে সভাপতিকে ধন্যবাদ দিয়া সভাভঙ্গ হইল।

শ্রীরামেন্দ্রসুন্দর ত্রিবেদী — সম্পাদক

শ্রীসত্যেন্দ্রনাথ ঠাকুর — সভাপতি